এক 'অস্পৃশ্য' গণহত্যা - রস মল্লিক

অনুবাদক: সায়ন্তন ব্যানার্জি, সৌরভ চক্রবর্তী

স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সরকার পরিচালিত বৃহত্তম গণহত্যা ছিল মরিচঝাঁপি, কিন্তু প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এর ইতিহাস ভুলিয়ে রাখা হয়েছে। তৎকালীন ভারতের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদ, প্রধানমন্ত্রী দেশাই এবং পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নাম এটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। আজ চার দশক পরে, এই গণহত্যার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা গেছে কিন্তু হত্যাকাণ্ডের ব্যাপ্তি এবং এর উদ্দেশ্য রয়ে গেছে পর্দার আড়ালে, যা বুঝিয়ে দেয়, সমস্ত শাসক দলই এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অথবা আসল ঘটনার তদন্ত করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনার দরকার হয়েছে এই ঘটনা উদ্ঘাটনের জন্য। ভারতে মানবাধিকার সুরক্ষা করার পথ যে কতটা কঠিন, এটি থেকে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা মরিচঝাঁপি হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করেনি এবং এর সরকারি বা বেসরকারি তথ্যপ্রমাণ কোনো কিছুই নেই। আমরা আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে যা জানতে পেরেছি তা আসলে নামমাত্র কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টার ফল। ১৯৭৯ এর গণহত্যার পর থেকে খুব কম কিছুই পরিবর্তন হয়েছে, আনুমানিক মৃতের সংখ্যা রয়ে গেছে চার থেকে পাঁচ অংকের মধ্যে, বেশিদূর এগোয়নি মৃত মানুষদের শনাক্তকরণের কাজ, এই বিশাল সংখ্যাকে নির্দিষ্টও করা যায়নি। আজও রহস্যে রয়ে গেছে এর কারণ; যদিও এর পিছনে তুলে ধরা হয়েছে নানা রকম মতামত, কিন্তু কিছু সাধারণ ঘটনার সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই। ভারতে মুঘল আগ্রাসনের অন্যতম ফলাফল ছিল বহু অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্গের মানুষের ইসলামে ধর্মান্তরকরণ। অন্যদিকে ভারতের স্বাধীনতা যতই এগিয়ে আসতে থাকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে ধর্ম, যা পরিণতি পায় ভারতের দেশভাগ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাধ্যমে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা পালিয়ে আসেন পশ্চিমে অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা চলে যান পূর্বে। মুসলিমরা এবং নিম্নবর্ণেরর মানুষেরা যেহেতু একটি রাজনৈতিক জোটে ছিলেন, ভারতে দলিতরা আসেন পরে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মুখোমুখি হওয়ার পর। তাদের কাছে মধ্যবিত্ত বাঙালি বা জমিদারদের মতো, যারা আগেই পালিয়ে এসেছিলেন তাদের মতো জমি সম্পত্তি কিছুই ছিল না, ফলে তারা বেঁচে থাকার জন্য সরকারি সাহায্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন।

মধ্য ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলির অবস্থা ছিল অতীব শোচনীয়, সংবাদমাধ্যম ও সরকারের নিজেদের বিবরণে দুটিতেই তা মেনে নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের তখনকার বিরোধী পক্ষ কমিউনিস্টরা শরণার্থীদের এই দুর্গতির সুযোগ নিয়ে শাসক দল কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করতে থাকে এবং শিবিরে থাকা মানুষদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে

আসার দাবি জানায়, পুনর্বাসন স্থান হিসেবে তুলে ধরা হয় সুন্দরবনের অনুন্নত গাঙ্গেয় বদ্বীপগুলোকে।[1] কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসা অবধি এ বিষয়ে কোনো সমস্যাই ছিলোনা এবং বহু শরণার্থী মানুষ তাদের আশ্বাস মেনে নিয়ে, ফিরতে থাকেন বাংলাতে, যেখানে তারা বসতি গড়ে তোলেন মরিচঝাঁপি বদ্বীপের একটি পরিত্যক্ত সরকারি আবাদি জমিতে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীরা যারা মধ্য ভারতের দণ্ডকারণ্য শরণার্থী শিবিরগুলি দেখেছিলেন, তারাও উৎসাহ দেন এই ব্যাপারে। শরনার্থীরা সেখানে সশস্ত্র স্থানীয় উপজাতিদের প্রতিকূল আচরণের শিকার হচ্ছিলেন, যারা তাদের জমির উপর অনধিকার প্রবেশের আশঙ্কা করছিলেন এবং শিবিরের কর্মকর্তারাও তাদের উপর নানান জুলুম করতেন, সরকারি ত্রাণ নিয়েও দুর্নীতি হতো। এই পরিস্থিতিতে মরিচঝাঁপিতে চলে আসার সুযোগ তাদের কাছে স্বাভাবিক ভাবেই ছিল আকর্ষণীয়।

সেই শরণার্থীরা কিন্তু জানতেন না, প্রথম দিকে, বামফ্রন্ট সরকারের ছোট শরিক দলগুলো পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন করার কথা প্রচার করে এলেও, সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তাদের প্রথম দিকের অবস্থান থেকে সরে এসে এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে থাকে। মন্ত্রীসভার এই বিভাজন বের করে আনে, বাম দল গুলির একে অপরের প্রতি দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্বের, এখন তারা বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত হয়ে পড়ে সরকারি ক্ষমতার সাহায্যে নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াতে এবং একে অপরকে দুর্বল করতে। শরণার্থীরা যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকটা দূরে দণ্ডকারণ্যে ছিলেন, তারা বুঝতে পারেননি এর কী গভীর প্রভাব তাদের ভাগ্যে পড়তে চলেছে।

বিতর্কিত ব্যাখ্যাগুলি[2]:

এই 'ঘটনার' খুব কম অংশই আছে যা নিয়ে দলগুলি একে অপরের বিরোধিতা করে না। এমনকি রাজ্য সরকার সরাসরি এই গণহত্যার কথা অস্বীকার করে দাবি জানিয়েছিল মাত্র দুজন নিরপরাধী প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন। সমালোচকদের মতামত ছিল, এই দুই মৃত্যুকে এড়ানো যায়নি কারণ ভিনরাজ্যের শরণার্থী নয়, তারা ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা এবং পুলিশের লক্ষ্য এতটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম যেখানে খালি স্থানীয় বাসিন্দারা মারা যাবেন তাও একজন যাকে ঘরের মধ্যে মারা হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতামত পরবর্তীকালে সরকারের এই দাবি গুলোকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবে।

---

[1] অন্বেষা সেনগুপ্ত, "ব্রেকিং আপ বেঙ্গল: পিপল, থিংস, এণ্ড ল্যান্ড ইন টাইমস অফ পার্টিশন", পিএইচডি থিসিস, জওহরলাল নেহেরু উনিভার্সিটি, ২০১৫, পৃ. ২২৮।

[2] এই গণহত্যা নিয়ে আমার প্রকাশনাগুলি হলো ডেভেলপমেন্ট পলিসি অফ এ কমিউনিস্ট গভর্নমেন্ট:ওয়েস্ট বেঙ্গল সিন্স ১৯৭৭, কেমব্রিজ উনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৩,, ইন্ডিয়ান কমিউনিজম: অপোজিশন, কোলাবোরেশন এন্ড ইনস্টিটিউনালইজেশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪, ডেভেলপমেন্ট, এথনিসিটি এন্ড হিউমান রাইটস ইন সাউথ এশিয়া, সেজ, ১৯৯৮ এবং "রিফিউজি রিসেটেলমেন্ট ইন ফরেস্ট রিসার্ভস্: ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিসি রিভার্সাল এন্ড দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার", জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজ, ১৯৯৯। A

উন্নয়নের দিক দিয়ে এই পুনর্বাসন যে খুবই সফল হয়েছিল, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সম্ভাবনাময় মৎস্য শিল্পর সঙ্গে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অনেকটাই স্বনির্ভরতার সুযোগ হয়েছিল সরকারি সাহায্যের থেকে, এটি নিয়ে কোনো ভিন্নমত নেই।[3] এক পর্যবেক্ষকের মতে, "আমরা দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম কিভাবে এরা একটা পরিত্যক্ত বনভূমি কে শুধুমাত্র হাত দিয়ে ছবির মতো একটি বাসভূমিতে পরিণত করেছিল। এদের কোনো ইঞ্জিনিয়ার ছিল না, কোনো স্থপতি ছিল না এবং বস্তুত একটি ইমারত বানাতে যা লাগে তার কিছুই ছিল না, কিন্তু এই সুন্দর গ্রামটিকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত, যে কীভাবে শুধুমাত্র ইচ্ছেশক্তি আর সহজাত নৈপুণ্য দিয়ে একটি গোটা বসতিকে তৈরী করা যায়! এত অল্প সময়ের মধ্যে তারা একটি স্কুল ও একটি লাইব্রেরিও প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলো। মাটি দিয়ে তৈরী হয়েছিল গ্রামের রাস্তা গুলো, কিন্তু সেখানে কোনো ধুলো বা নোংরা পাওয়া যেত না। প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিজেদের থাকার জায়গা ছিল, একটি বা দুটি করে মাটি দিয়ে বানানো ঘর।"[4] একটি পডকাস্ট থেকে জানা যায়, "স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে অনেক ঘনিষ্টতা ছিল কারণ এই গোষ্ঠীগুলি একই অঞ্চল থেকে এসেছিলো এবং এদের জাতিগত ও অর্থনৈতিক অবস্থানও ছিল সমতুল্য, কেউ কেউ ছিলো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও। সুন্দরবনের অনেক স্থানীয়ই মরিচঝাঁপিতে এদের সাথে থাকতে শুরু করেছিলেন এবং তারা অবাক হয়ে গেছিলেন এখানকার উন্নয়নের গতিতে। তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন এই অঞ্চলের সবচেয়ে উন্নত দ্বীপগুলির একটি।"[5] সরকারের কাছে এই সব কিছুই ছিল গুরুত্বহীন এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, কোনো এক কারণে (যা কখনোই প্রকাশিত হয়নি) এই জনবসতি উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়।

কোনো কোনো তত্ত্বের সমর্থনে কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্টারনেটে একটি মন্তব্যে দাবি করা হয়েছে, এই গণহত্যার উৎস ছিল বামফ্রন্ট সরকারের শরিকি বিবাদ। শরণার্থীদের সাহায্য করছিল বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আরএসপি), যা প্রধান শরিক দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিএম) কে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। আরএসপি কে মনে করা হতো ট্রটস্কির অনুগামী; অন্যদিকে সি পি এম ছিল স্তালিনপন্থী। এই পুরোনো আদর্শগত দ্বন্দ্বও বেরিয়ে আসতে থাকে সরকারের

---

[3] সাংসদ প্রসন্নভাই মেহতা, সাংসদ লক্ষ্মী নারায়ণন পান্ডে, সাংসদ মঙ্গলদেব বিশারট, "রিপোর্ট অন মরিচঝাঁপি এফেয়ার্স", ১৮ই এপ্রিল, ১৯৭৯, প্রতিলিপি। সিপিএম সাংসদরা বাধা দেন সংসদে এই রিপোর্ট পেশ করাতে, যদিও তা ছিল নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কারণ এটা হয়েছিল গণহত্যার আগে। এই সময় প্রধানমন্ত্রী দেশাইর জনতা পার্টি জাতীয় স্তরে সিপিএমের সাথে জোটে ছিল কিন্তু জনতা পার্টির রাজ্য শাখা বামফ্রন্টের বিরোধিতা করতো এবং তারাই প্রধানমন্ত্রীকে রাজি করিয়েছিলো একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠাতে। এর ফলে হয়তো সিপিএম উদ্বিগ্ন হয়ে পরে যে মরিচঝাঁপির ব্যাপারে তারা হয়তো কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থন হারাবে এবং তারা রিফিউজিদের না খাইয়ে আটকে উচ্ছেদ করার 'ধীরে চলো' নীতি নেয়। এটা বোঝা যায়, জ্যোতি বসুর সংবাদমাধ্যমে খবর ফাঁস হওয়া নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ দেখে, যা বাধ্য করেছিল উচ্ছেদ পরিকল্পনা পিছিয়ে দিতে।

[4] কমলা বসু, "মরিচঝাঁপি ইন আইসোলেশন", পাল(সম্পাদক), মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ১১।

[5] গানা, পডকাস্ট, খুনী: মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার, দ্য ক্রাইমস অফ ইন্ডিয়া, সিজন ওয়ান, অক্টোবর ১৫, ২০২০, ২৫ মিনিট।

মধ্যে।[6] যদিও আরএসপির সুন্দরবনে সংগঠন ছিল এবং তা রিফিউজিদের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সিপিএমের আরো বড় পার্টি সংগঠন ও সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল এবং এরা শরণার্থীদেরকে হত্যা না করে খুব সহজেই আরএসপিকে হারাতে পারতো। শরণার্থীরা বরাবরই সিপিএম-কে সমর্থন করে এসেছে, কিন্তু তাদের পুনর্বাসন প্রকল্প নিয়ে মতবদলে এই সমর্থনে ভাটা পড়ে, যা আরএসপিকে সুবিধে করে দেয়। আর এই পুরো ব্যাপারটাই সিপিএমের কাছে ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর।

এই যুক্তি অনেকটাই তুচ্ছ কারণ সুযোগ থাকলে সিপিএমকে নিজেদেরই রিফিউজিদের সমর্থন করতে হতো এবং তার জন্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়তো ছোট শরিকরা। তবে আর একটি ব্যাখ্যায় বামফ্রন্টের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী আরএসপির শরণার্থীদের ব্যবহার করে জোটে কম গুরুত্বপূর্ণ শরিক থেকে ক্রমশ প্রধান দল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, যা ছিল সিপিএমের আধিপত্যর জন্য বিপজ্জনক।[7] যদিও প্রশ্নসাপেক্ষ শুধু শরণার্থীদের সমর্থন নিয়ে আরএসপির পক্ষে এতো টা এগিয়ে আশা সম্ভব হতো কিনা।

---

[6] অভীক বর্মন, "হাউ ওয়েস্ট বেঙ্গলস্ লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট কমিটেড জেনোসাইড অন দলিতস্", দ্য ইকোনোমিক টাইমস, জুলাই ২৯, ২০১৬।

[7] দীপ হালদার, সঙ্গম টকস্, ব্লাড আইল্যান্ড, এপ্রিল ১৭, ২০২০, ইউটিউব। দীপ হালদারের একটি বক্তব্যে মরিচঝাঁপি গণহত্যার কারণ হিসেবে তিনি নিজের একটি মতামত দেন, "কেন মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং শিশুদের নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল ? যেগুলো হয়েছিল তা বামপন্থীরা কেন করেছিল ? কি কারণ ছিল এই গণহত্যার? এই বই লেখার পিছনে পাঁচ বছর সময় দেওয়ার পরও আমার কাছে কোনো উত্তর নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন মরিচঝাঁপির এই ঘটনা সর্বসমক্ষে আসেনি তখনও অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাপত্রে আলোচনা হচ্ছে, লেখালেখি হচ্ছে। অণু জ্বালের একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্রে, ওনার ও রস মল্লিকের লেখা, বলা হয়েছে এর কারণ হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ভেতরকার জাতিবৈষম্য, বামপন্থীরা সবসময় একটি শ্রেণীবৈষম্যহীন ও জাতিবৈষম্যহীন সমাজের কথা বলে এসেছে। দুইজনের যুক্তি ছিল যখন বামপন্থীরা এই সব কথা বলছিল, তখন তাদের সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা ছিল উচ্চবর্ণের এবং তারা দেখতে থাকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাদের অগ্রাহ্য করে একটি দ্বীপে জনবসতি গড়ে তুলছে। তাই গবেষকদের বক্তব্য ছিল জাতি বৈষম্য ছিল এর মূল কারণ। বই লেখার পর আমি এ পুরোপুরি মেনে নিতে রাজি নই। আমার মতে আরো কিছু কারণ আছে। আপনারা দেখুন বামফ্রন্ট সরকার যেটি ক্ষমতায় এসেছিলো তা শুধুমাত্র সিপিএম সরকার ছিল না, ছিল বামফ্রন্ট সরকার, আরো অন্য বামপন্থী সংগঠন ও যুক্ত ছিল এর সাথে। এই দল গুলির মধ্যে ছিল আরএসপি, রেভোলিউশনারি সোশালিস্ট পার্টি। এবার সুন্দরবনের এলাকা গুলি ছিল আরএসপির দখলে, তো এটি ছিল কেবল মাত্র বাম দল গুলিকে নিয়ে তৈরী একটি শরিকি সরকার। মরিচঝাঁপি তে যে সমস্ত শরর্ণার্থীরা থাকতে শুরু করেছিলেন তারা জ্যোতি বসু ও সিপিএম কে অপছন্দ করতে শুরু করেন কারণ এরা নিজেদের কথার খেলাপ করে, অন্যদিকে তারা ওই অঞ্চলে কাজ করতে থাকা আরএসপির কোনো এক নেতার ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং শোনা যায় তিনিও ওই রিফিউজিদের মোটামুটি কাছের মানুষ ছিলেন। সিপিএম ভাবতে শুরু করে যে এখানে মাত্র দেড় লক্ষ মতো রিফিউজি আছে। এবং আরো অনেক অনেক শরণার্থী বাইরে আছে তারা যদি দলে দলে এসে সুন্দরবন ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে বসতি গড়ে থাকতে শুরু করে, পরের বার যখন নির্বাচন আসবে এরা সিপিএম কে ছেড়ে আরএসপিকে ভোট দেবে। ফল হবে বামফ্রন্টের মধ্যে ক্ষমতার নতুন সমীকরণ নিয়ে সমস্যা। আরএসপি যা আগে একটি ছোট শরিক ছিল হয়ে উঠবে একটি শক্তিশালী সদস্য"।

সিপিএম ক্ষমতায় এসে এই নীতি বাতিল করেছিল কারণ তারা বুঝেছিলো শরণার্থীদের সমর্থনের মাধ্যমে দণ্ডাকারণ্যের মতো মধ্যভারতের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঞ্চলে ক্ষমতা সম্প্রসারণের সুযোগ তাদের সামনে আছে। দণ্ডকারণ্য থেকে আশেপাশের এলাকার মানুষজনের মধ্যে তারা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে যে ব্যাপক সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ফারাক ছিল, তার ফলে এই স্বপ্ন যে কিছুটা অলীক ছিল তা অস্বীকার করা যায়না, কিন্তু অতীতে এরকম ঘটনার নজির রয়েছে। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত, যখন সমস্ত ক্যাডারদের ডেকে নেওয়া হয়, জরুরি অবস্থার মধ্যে ও আগে এরা অন্য রাজ্যে পার্টির সম্প্রসারণ করতে শুরু করেছিল। মাওবাদী বিদ্রোহীরা দণ্ডকারণ্যে যেভাবে বাঙালি শরণার্থীদের সমর্থন নিয়ে আদিবাসীদের মধ্যে নিজেদের প্রধান ঘাঁটি বানিয়েছিলো তাতে প্রমাণ হয় যুক্তিটা খুব একটা অলীক ছিলো না।[৪] প্রথমদিকে শরণার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ভাবে উপযুক্ত পশ্চিমবঙ্গে বসতি স্থাপনের জন্য উৎসাহ দিয়ে সিপিএমের পক্ষে দণ্ডকারণ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ না করে মরিচঝাঁপিতে থাকা শরণার্থীদের উৎখাত করা সম্ভব ছিল না। এমনকি পরে যখন জানাজানি হয়ে যাবে, পশ্চিমবঙ্গেও তাদের সমস্যা হতো, যেটা পড়ে হয়েওছিল। মরিচঝাঁপি হত্যাকাণ্ডের পড় বেঁচে থাকা মানুষদের ফেরত আসা মানে সিপিএমের দণ্ডকারণ্যের বাঙালিদের সমর্থন পাওয়ার আশার স্বপ্নভঙ্গ অবধারিত। পশ্চিমবঙ্গে কিছু শরণার্থী জনবসতি গড়ে তুলে, দণ্ডকারণ্যে নিজেদের সম্প্রসারণ করলেই দলের অনেক সুবিধে হতো। শরণার্থীদের হত্যা করে তারা দুই জায়গাতেই নিজেদের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করেছিল।

অনেক সিপিএম ক্যাডারই চেয়েছিলেন শরণার্থীদের সমর্থনের মাধ্যমে নিম্নবর্গের মানুষদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করতে এবং একই সাথে মধ্য ভারতের শরণার্থী মানুষদের সাথে যোগসূত্র তৈরী করে বিভিন্ন রাজ্যের অন্যান্য জাতির মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব এই ভাবনা প্রত্যাখ্যান করে এবং শরণার্থীদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে এদের মধ্যে দলের ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়। এই ঘটনা বুঝিয়ে দেয় দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন মানুষদের সম্বন্ধে দলের আসল রূপ কী ছিল। ফিরে তাকালে বোঝা যায়, বামফ্রন্টের ১৯৭৭ এর নির্বাচন ছিল ভারতে কমিউনিজমের সর্বোচ্চ বিন্দু কারণ এরপরে তারা রাজনৈতিক তো দূরের কথা কোনোদিন আর কোনোরকম সামাজিক আন্দোলনেও পথে নামেনি, এবং ধীরে ধীরে পা বাড়িয়েছে নির্বাচন জালিয়াতি, দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের পথে। বিভক্ত বিরোধী পক্ষের ও সরকারি সুবিধের সাহায্যে স্বজনপোষণের সুযোগ নিয়ে দশকের পর দশক ধরে ক্ষমতায় টিকে থেকেছে। অনেকসময়ই এই গণহত্যাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া কমিউনিস্টদের পতনের কারণ হিসেবে। কিন্তু এই হত্যাকান্ড নিম্নবর্ণের জাতির একটা বড় অংশকে আলাদা করে দিয়েছিলো, যাদের সমস্যার কথাকে অগ্রাহ্য করা হলে তারা পড়ে দলের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন।

[৪] তুষার ভট্টাচার্য, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, "আনপাবলিশড মরিচঝাঁপি", খসড়া ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ২৪।

সরকারিভাবে উচ্ছেদের কারণ হিসেবে বারবার যে ব্যাখ্যাটি উঠে আসে তা হলো পরিবেশগত সমস্যা। জনবসতিটি ছিল একটি সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে, ব্যাঘ্র অভয়ারণ্য থাকা বাস্তুতন্ত্রের জন্য যা হয়ে উঠেছিল বিপজ্জনক। জনবসতিটি আদৌ সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে ছিল কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়ে গেছে; তাদের এলাকাটি ব্যাঘ্র অভয়ারণ্যর মধ্যে না হওয়া সত্ত্বেও সরকারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল এটি পাশের সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে যেখানে কোনো প্রকার বসতি স্থাপন বেআইনি।[9]

দ্বীপটিতে সরকারের নিজেদের আবাদিই এই সংরক্ষিত অরণ্যের দাবিকে অগ্রাহ্য করেছিল । যদিও তা ছিল পরিত্যক্ত, জায়গাটি এতে এমন কোনো স্বর্গীয় স্থান হয়ে ওঠেনি। জায়গাটিকে ছেড়ে দিয়ে সরকার অনিচ্ছাসহকারে হলেও যা করতে চাইছিল তাকে আজকের পরিভাষায় বলা হবে রিওয়াইল্ডিং, যেখানে কোনোরকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই সংরক্ষিত এলাকাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এই পরিবর্তন কিন্তু ততটা সহজসাধ্য না যতটা মনে হচ্ছে। "যদি শরণার্থীদের বাধ্য করা হয় ওখান থেকে সরে যেতে, তাহলেও সুন্দরবনে গাছ কাটা থামবে না। এই গরীব মানুষগুলোর মতো বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় গাছ না কেটে, দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে এই সংরক্ষিত অরণ্য ধ্বংস করে ফেলবে।"[10] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে জ্যোতি বসুকে ইঙ্গিত করা সম্ভব ছিলনা কীভাবে ব্যবসায়ীরা সিপিএমকে কাঠের জন্য পয়সা দিচ্ছে যদিও এই গোটা ব্যবস্থা যেভাবে কাজ করে তা জেনে এর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এমনকি সরকারের নিজেদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী শরণার্থীদের থাকার জন্য যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা ছিল। এই জায়গাটি খুব উন্নত মানের ছিল না, কারণ উর্বর জায়গাগুলিতে এর মধ্যেই ঘন জনবসতি হয়ে গেছিলো। একটু সহায়তা করলে ,যদি সরকারের তরফ থেকে জায়গাগুলিকে শনাক্তকরণের কোনোরকম প্রচেষ্টা হতো তাহলে জায়গাটিকে পুনরুদ্ধার করা যেত। মরিচঝাঁপি জোয়ারের নোনা জলের সমতলে অবস্থিত হওয়ায়, লবনাক্ত ভাব দূর করার জন্য প্রয়োজন ছিল ৫ ফুট উঁচু বাঁধের, জমিকে কৃষিযোগ্য করার জন্য সর্বোচ্চ পরিশ্রমও লাগে। সরকারি সাহায্যে অন্যান্য এলাকাকে অনেক কম পরিশ্রমে তৈরী করে এই গণহত্যা ও রাজনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব সহজেই এড়ানো যেত। রিওয়াইল্ডিং ছিল উচ্ছেদের জন্য সরকারের সব থেকে সহজ যুক্তি। পরবর্তীকালে সরকার যখন একটি পারমাণবিক কেন্দ্র তৈরী করতে এবং এর কাছাকাছি জায়গাগুলিকে পর্যটনের জন্য বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলো পরিবেশবিদদের প্রবল সমালোচনায় এই পরিকল্পনাকে ত্যাগ করতে হয়।[11]

---

[9] কমিউনিস্ট-উত্তর সরকারের মন্ত্রী ইউ এন বিশ্বাস, (মরিচঝাঁপি: টর্চারড হিউম্যানিটি, ইউটিউব) এবং হাইকোর্টে শরণার্থীদের আইনজীবী, শাক্য সেন দুজনেই দাবি করেছেন মরিচঝাঁপি ছিল সংরক্ষিত অরণ্যের বাইরে যদিও কিছু কিছু মানচিত্রে ও পর্যবেক্ষকরা এটিকে দেখিয়েছেন সংরক্ষিত অরণ্যের মধ্যে।

[10] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,"এন আপিল টু দ্য চিফ মিনিস্টার", ইন পাল (এডিটর) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃষ্ঠা, ২।

[11] অমৃতেশ মুখোপাধ্যায়, "নেগোশিয়েটিং ডেভেলপমেন্ট: দ্য নিউক্লিয়ার এপিসোড ইন দ্য সুন্দরবনস্ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল", এনথ্রোপোলজি ম্যাটার্স, খন্ড ৭, সংখ্যা ১, ২০০৫।
অণু জ্বালে, "দ্য সুন্দরবনস: হুস ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট?" কনসারভেশন এন্ড সোসাইটি, খন্ড ৫, সংখ্যা ৩, ২০০৭।

এর ফলে বোঝা যায় সরকার যেরকম দেখিয়েছিলো পরিবেশ বাঁচানোটা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এমন কি সেই সময়ে সিপিএম নিজেই তাদের দুহাজার ক্যাডারকে ঝড়খালির সংরক্ষিত অরণ্যে পাঠিয়েছিল, কাজেই তাদের কাছে রাজনীতি ছিল পরিবেশের থেকে বেশি প্রয়োজনীয়।[12] উচ্ছেদের পরে বলা হয় সিপিএম শরণার্থীদের ফিরে আসা আটকাতে, সাময়িকভাবে নিজেদের সমর্থকদের মরিচঝাঁপিতে রেখেছিলো, যদিও এখন তারা কেউই নেই।[13] আরেকটি প্রচলিত যুক্তি দেওয়া হয়, যে অনেক বেশি মানুষ এরম করে পশ্চিমবঙ্গে এসে উপস্থিত হলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই রাজ্যে অনুপ্রবেশ করছিল, সরকারের মত ছিল এটা বন্ধ করা না গেলেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মরিচঝাঁপির শরণার্থীরা সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না এবং নিজেরাই একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন, ফলে সরকারের কাছে অহিংস কোন উপায়ই ছিল না এদেরকে সরাবার। দুর্ভিক্ষে ও রোগে বহু মানুষ মারা যাওয়া, এবং অর্থনৈতিক অবরোধ স্বত্ত্বেও যখন এদেরকে এখান থেকে তোলা যায়নি,, পুলিশ ত্রিশটি মোটর লঞ্চে করে এসে 'স্বেচ্ছাসেবকদের' সাহায্য নিয়ে শরণার্থীদের জনবসতিটি দখল করে, এই স্বেচ্ছাসেবকদের অনেকেই ছিল পার্টির কর্মী ও গুন্ডা নেতা। নিহত মানুষদের ফেলে দেয়া হয় গঙ্গায়ে বা জঙ্গলের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া মৃতদেহ খেয়েই এখানকার বাঘেরা নরখাদক হয়ে ওঠে।[14] সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ছয় থেকে আট হাজার মানুষ থাকতেন এই জনবসতিতে, যদিও অন্যান্য মতামতে এই সংখ্যা ছিল ত্রিশহাজারের কাছাকাছি এবং একটি জায়গায় সর্বোচ্চ ধরা হযেছে এক লক্ষ অবধি। এসব ধরেও ৯ কোটি মানুষের রাজ্যে এই সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য, সরকারের তরফ থেকে কোন প্রকার হস্তক্ষেপই থাকার কথা নয়। ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তাদের পশ্চিমবঙ্গে থাকার সবরকম অধিকার ছিল, যেমন সংখ্যালঘুরা থেকে এসেছে বহুযুগ ধরে। কিন্তু আইন নয়, এক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠেছিল সিপিএমের ঔদ্ধত্য।

বাংলাভাগের পর নমঃশূদ্র প্রাধান্য আছে এমন জেলাগুলিকে যদি পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া যায় কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সোজা হতো। দেশভাগ নিয়ে বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের মতে, যিনি উদ্ধৃত হওয়ার অনুরোধে সাড়া দেননি, "বাংলা ভাগের জন্য কংগ্রেসের মরিয়া ভাব দেখে প্রথম থেকেই তাদের নমঃশূদ্র আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেয়ার অভিসন্ধি ফুটে ওঠে। পূর্ব বাংলায় নমঃশূদ্রদের ফেলে রেখে, উচ্চবর্ণের আধিপত্য অটুট রাখার জন্যই এই পরিকল্পনা করা হয়েছিল।" উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চলে যাওয়ার পর তাদের একসময়ের জোটসঙ্গীদের উপর সাম্প্রদায়িক মুসলমানরা যে চড়াও হবে তা দলিতদের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। এবং এর সামগ্রিক ফল হিসেবে, কংগ্রেসের বাংলাভাগের মূল নকশাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ পালিয়ে আসতে থাকা দলিত শরণার্থীরা।

---

[12] "দ্য ডিম্যান্ড টু ডিক্লেয়ার মরিচঝাঁপি এজ এ রিফিউজি কলোনি", পাল (সম্পাদক) মরিচঝাঁপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস, গাংচিল, "মরিচঝাঁপি: টর্ন নেশন, টর্ন হিস্টোরি", ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৮০।

[13] ইন্টারভিউ, এস.পি. মল্লিক আইএএস, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ।

[14] অণু জ্বালে, "ডুয়েলিং অন মরিচঝাঁপি: হোয়েন টাইগার্স বিকাম 'সিটিজেনস', রিফিউজিস 'টাইগার ফুড', ইকোনোমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি, ২৩শে এপ্রিল, ২০০৫।

ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী দলিত আন্দোলনের ধারাবাহিকতাকে আটকে দেওয়া যাওয়ার জন্য বলা যায় কংগ্রেস সরকার শরণার্থীদের অন্যান্য রাজ্যে পাঠিয়ে দিয়েছিলো। "এই সমস্ত কর্মসূচির একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল নমঃশূদ্র আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া....শরণার্থীদের বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দিলে শুধু যে নমঃশূদ্র সমাজ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তা নয়, পশ্চিমবাংলার তিনবর্ণ ভিত্তিক নির্বাচনী রাজনীতিতে নমঃশূদ্রদের উত্থানও আটকানো যাবে।[15] তিনবর্ণের আধিপত্য থাকা কংগ্রেসের বাংলা ভাগের রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণ হবে না যদি শরণার্থীদের অনুপ্রবেশের ফলে দলিত আর মুসলমানরা নিজেদেরকে আবার ক্ষমতায় ফিরে আনে।[16] এদের ক্ষমতায় আসা সব থেকে সহজ ভাবে আটকানো যেত জাতিভিত্তিক গণহত্যা করে। এই শব্দবন্ধটি সরাসরি ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু উচ্চবর্ণের কাছে রাজনৈতিক ও জাতি পরিচিতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়ার সুযোগ ছিল, দলিতদের তা ছিল না, কিন্তু তাদের পরিণতি হয়েছিল জাতিগত গণহত্যার মতনই। বহু প্রতিবাদের পরও সরকারের তাদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তর থামানোর উপায় উদ্বাস্তু শরণার্থীদের কাছে ছিল না। এমনকি সুদূর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ যেটিকে ব্রিটিশরা রাজনৈতিক বন্দিদের কারাশিবির হিসেবে ব্যবহার করেছিল সেখানেও বসতি তৈরী করা হয়েছিল। সাধারণত রাজনৈতিকরা তাদের বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য তাদের নেতাদেরকে লক্ষ্য করে, কিন্তু কোনো এক আজব কারমে, এখানে তাদের সমর্থকদের লক্ষ্য করে গণহারে আদিবাসী অধ্যুষিত অপরিচিত জায়গায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। নির্বাসিত জনবসতি গুলির ৪২০০০ পরিবারের মধ্যে গড়ে প্রায় ২৭০০০ পরিবার মারা গেছিলো।[17] ১৯৬৬ সালের একটি মেডিক্যাল রিপোর্টে পাওয়া যায় দণ্ডকারণ্যে একটি পুরুষের গড় ওজন ছিল ৮৩ পাউন্ড যেখানে স্বাভাবিক ওজন হচ্ছে ১৩১ পাউন্ড এবং মহিলাদের ৭৪ পাউন্ড, যেখানে তাদের ১২৩ পাউন্ড হওয়ার কথা।[18]

এই লক্ষ্য সফল করার জন্য কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি সি রায়ের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সমর্থন প্রয়োজন ছিল, যাকে তিনি লিখেছিলেন, "আমাদের মধ্যে ...শরণার্থীরা এমন মানসিক উত্তেজনার মধ্যে চলে আসছেন, এতে স্বার্থসন্ধানী রাজনৈতিকদের পক্ষে সরকার ও কংগ্রেসবিরোধী নানারকম উস্কানি দিয়ে এদেরকে কব্জা করা সহজ হচ্ছে।"[19]

---

[15] দেবদত্তা চৌধুরী, মার্জিনাল লাইভস্, পেরিফেরাল প্রাকটিস: এ স্টাডি অফ বর্ডার ন্যারেটিভস এলং দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল-বাংলাদেশ বর্ডার", পিএইচডি থিসিস, ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েস্টমিনিস্টার। মে, ২০১৪, পৃ. ১৭৪।

[16] ইন্দ্রজিৎ রায়, "ট্রান্সফর্মেটিভ পলিটিক্স" ইন দ্য পলিটিক্স অফ কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", এডিটেড বাই উদয় চন্দ্র, গেইর হেইয়েরস্ট্র্যাড এন্ড কেনেথ বো নিয়েলসেন, রুটলেজ, ২০১৭, পৃ. ১৮৮।

[17] অথর্বকি বিশ্বাস, "হোয়াই দণ্ডকারণ্য এ ফেলিওর, হোয়াই মাস এক্সোডাস, হোয়ের সল্যুশন?", দ্য অপ্রেসড ইন্ডিয়ান, খন্ড. ৪, নং.৫, ১৯৮২, পৃ. ১৮।

[18] শৈবাল কুমার গুপ্ত আইসিএস, চেয়ারম্যান দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, "দ্য মরিচঝাঁপি রিফিউজিস" ইন পাল (এডিটর), মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ.৪৬।

[19] এস চক্রবর্তী, উইথ ডাঃ বি সি রায়, পৃ ১৮২, কোটেড ইন জয়া চ্যাটার্জি, দ্য স্পয়েলস অফ পার্টিশন, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ. ১৩০-১৩১. ডাঃ রায় ছিলেন আমার দাদামশায়ের চিকিৎসক, যেটা ওনার কাছে অপবিত্র একটি কাজ হতে পারতো। বাঙালি অভিজাত সমাজের একজন ডাক্তার হয়ে তিনি এটি নাও করতে পারতেন, যা বুঝিয়ে দেয় জাতিভিত্তিক নয় ওনার সিদ্ধান্ত ছিল

প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে প্ররোচণা দিয়ে তার প্রভাব ব্যবহার করে তিনি বাধ্য করেন অন্যান্য অনিচ্ছুক রাজ্যকে শরণার্থী গ্রহণ করতে। নেহেরু বি সি রায়-কে লেখেন, "আমাদের অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, বেশিরভাগ প্রদেশকে শরণার্থী গ্রহণ করতে রাজি করানো মুশকিল। আমরা অনেক চাপ দিচ্ছি কিছুসময় ধরে, তা করার জন্য।"[20] সবচেয়ে প্রান্তিক ও দরিদ্রতম মানুষদের জোর করে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দলিত আন্দোলনকে শেষ করে দেয়ার যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল তা কখনোই সামনে আনা হয়নি, কিন্তু বাংলাভাগের রাজনীতি সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকা যে কেউই বুঝে যাবে তারা কি করতে চাইছিল এবং প্রত্যাশিত ভাবেই তিনি দলিত নেতৃত্বকে সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছিলেন। নিচুতলার রাজনৈতিক বিভিন্ন হিসাবে বোঝা যায় কংগ্রেস ও বি সি রায়ের অনুগত উচ্চবর্ণের শরণার্থী শিবিরের কাউকেই নির্বাসিত হতে হয়নি।[21] কংগ্রেস আমলে হাজার হাজার মানুষের বর্বরভাবে রহস্যমৃত্যর কারণ হওয়া সত্ত্বেও, দলিত আন্দোলন ধ্বংস করতে এই নীতি ছিল সফল। তফশিলী সম্প্রদায়ের কাছে নিজেদের সমর্থন বাড়ানোর জন্য বিরোধী কমিউনিস্টদের কাছে এটি ছিল একটি বড় সুযোগ। এরপর মুসলিম মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকার হয়ে বাংলাদেশে ও কয়েকহাজার বছর ধরে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে নমশূদ্ররা হয়ে পড়ে নির্যাতিত সংখ্যালঘু।

আমি শরণার্থীদের অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার রাজনৈতিক অভিসন্ধিটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম কিন্তু গবেষণা প্রকাশনা গুলি থেকে তা বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং সুনিশ্চিত করার দায়ভার কয়েকজন গবেষক ছাত্রছাত্রীর অপ্রকাশিত থিসিসের উপর পড়েছিল। "উচ্চবর্ণের এই সরকারের অনৈতিক ও বিভেদজনক রাজনীতি একেবারেই কাকতালীয় ছিল না বরং এটি ছিল নমঃশূদ্র রাজনৈতিক শক্তিকে ভেঙে দেওয়ার জন্য খুবই সচেতন ও পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা এবং বাংলাতে একটি সমজাতীয় উচ্চবর্ণের নেতৃত্ব তৈরী করা।[22] এই বিষয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা আমার এই প্রশ্নের মেলের জবাব দেননি, যদিও তারা আমার ব্যাপারে জানেন এবং আমার লেখাকে উদ্ধৃত করেছেন। ইতিহাসের অধ্যাপকদের এই বিষয়ে অনাগ্রহ, তিন জাতির প্রাধান্য থাকা একাডেমিয়ার মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর নীরবতাকেই

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কে নিয়েও একই কথা বলা যায় মরিচঝাঁপি ঘটনা নিয়ে। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে দলিত মানুষদের নিয়ে কম ভাবনাচিন্তা হতে থাকায় এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাতে মুখমন্ত্রীদের পক্ষে কোনোরকম তাৎক্ষনিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই নিজেদের নীতি বাস্তবায়না করা সম্ভব হলো।

[20] এস. চক্রবর্তী, উইথ ডাঃ বি.সি. রায়, পৃ ১০৭ কোটেড ইন জয়া চ্যাটার্জি, দ্য স্পয়েলস অফ পার্টিশন, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ ১৩৩

[21] উদিতি সেন, "দ্য মিথস রিফিউজিস লিভ বাই:মেমোরি এন্ড হিস্ট্রি ইন দ্য মেকিং অফ বেঙ্গলি রিফিউজি আইডেন্টিটি" মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, ৪৮, ২০১৪, পৃ ৪৮।

[22] দেবব্রী সেনগুপ্ত, "দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার এন্ড দ্য মিথ অফ কাস্ট ইন দ্য পলিটিক্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল", পৃ ৭, ইন্টার্নাল এসেসমেন্ট সেমেস্টার ৪, এপ্রিল ১৯, ২০১৬, ইউনিভার্সিটি অফ দিল্লি, ডিপার্টমেন্ট অফ ইংলিশ ইন academia.edu/31518498।

ইঙ্গিত করে।[23] বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কাছে মরিচঝাঁপি হত্যাকাণ্ডের জন্য কাউকে আড়াল করার কোন কারণই ছিল না, এই গণহত্যার জন্য দায়ী রাজনৈতিকরা বহু দশক আগেই মারা গেছেন। একটি পডকাস্টে অবশ্য খোলাখুলি এর আসল উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। "দেশভাগের আগে নমশূদ্ররা ছিল রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত সক্রিয় একটি জাতি, তারা যদি একসাথে থাকতো তাহলে বাংলায় ভদ্রলোক একাধিপত্যর দম্ভকে তারা খর্ব করতে পারতো, ভদ্রলোক বাঙালির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বামফ্রন্টের জাতপাত বিরোধিতার শত বুলি সত্ত্বেও তারা নিজেদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা হারাতে চায়নি, তাই তারা তাদের (শরণার্থীদের) ভেঙে দিয়ে সারা ভারতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।"[24]

কোনো একজন ঐতিহাসিকের নাম আলাদা করে বলা ভুল হবে কারণ সব জায়গাতেই একই রকম দৃষ্টিভঙ্গীর সমস্যা। কিছু ক্ষমতাশালী লোকের অসুবিধা হবে এমন ইতিহাসকে যখন বাদ দিয়ে দেওয়া হয় কোনো ঘটনাকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখার দাবি তখনই চলে যায়। দলিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তাদেরকে নিয়ে চর্চার জন্য সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মানবাধিকার, কিন্তু গবেষণাচর্চায় এই বিষয়ে নীরবতা উচ্চবর্ণের সুস্পষ্ট প্রভাবকে বুঝিয়ে দেয়। উচ্চবর্ণ থেকেই উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এসেছিলো, দলিতরা তাদের থেকে সংখ্যায় বেশি হলেও বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্যে দলিতদের অনুপস্থিতির কারণে ভারতের উপর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় নেই বললেই চলে। গরিবদের জোর করে নির্যাতন করার সুযোগ নয়, কংগ্রেস দলের জাত নির্মূলের পরিকল্পনা এই তিন জাতি নির্ভর ইতিহাসের দৌলতে একরকম হয়ে ওঠে অত্যন্ত নিরীহ ভালো উদ্দেশ্য থাকা নীতি যেটি শুধুমাত্র অযোগ্য প্রশাসনের জন্য ব্যর্থ হয়েছে। যদি অন্যভাবে বিষয়টিকে দেখানো হতো তাহলে এই দেশের সব থেকে ক্ষমতাশালী ও বিখ্যাত রাজনৈতিকদের মানবধিকার লঙ্ঘনের কাজ কারবার দেখানো যেত, যেটি এটি আসলে ছিল। কোন মুখ্য প্রশাসকই এই বিষয়ে কোথাও কাগজে লেখেননি, কিন্তু কাজ দেখেই তাদের অভিসন্ধি বোঝা যায়। দলিতদের বিশেষত শরণার্থীদের চিরাচরিত প্রান্তিকীকরণর ফল হয় জাতিগত গণহত্যা এবং তাদের রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণের সমান্তরালে চলতে থাকে তিন উচ্চবর্ণের অভিজাতদের দেশভাগ হওয়া রাজ্যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

এই ভাবে প্রান্তিকীকরণ যে নিতান্তই কিছু ফলপ্রসূ নীতির অনিচ্ছাকৃত প্রভাব তা একেবারেই অসমর্থনযোগ্য। ক্ষমতাশালীরা সবসময় তাদের নিজেদের স্বার্থর দিকেই ধেয়ে এসেছে এবং তারা যে দেশভাগের পর আবার ক্ষমতালীপ্সায়ে মেতে উঠবে তা ছিল অবধারিত। হাজার বছর ধরে কতৃত্ব দেখিয়ে এসে দেশভাগ ও স্বাধীনতার সময়ে সেই সুযোগ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা তারা স্বাভাবিক ভাবে করতোই বিশেষ করে যখন মুসলিম আর দলিতরা আর ক্ষমতায় নেই। স্বভাবতই, উচ্চবর্গের রাজনৈতিকরা কখনোই স্বীকার করবে না, কিভাবে এই প্রভাবকে তারা তাদের পরিবার ও

[23] ঐতিহাসিকরা কিভাবে এই উৎপাটন ও পুনর্বাসন কে দেখেছেন তার জন্য দেখুন, অন্বেষা সেনগুপ্ত, "মুভেবল মাইগ্রেন্টস, লেবারিং লাইভস, মেকিং রিফিউজিস "ইউসফুল ইন পোস্ট-কলোনিয়াল ইন্ডিয়া", ইন মহুয়া সরকার (এডিটর), ওয়ার্ক আউট অফ প্লেস, ডে গ্রুটার, ওল্ডেনবর্গ, বার্লিন, ২০১৭ পৃ ১২২ এবং অন্বেষা সেনগুপ্ত, ব্রেকিং আপ বেঙ্গল: পিপল, থিংস এন্ড ল্যান্ড ইন টাইমস অফ পার্টিশন, ডক্টরাল থিসিস, জওহরলাল নেহেরু উনিভার্সিটি, নিউ দিল্লী, ২০১৫।

[24] গানা, পডকাস্ট ২৮: মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার, খুনি: দ্য ক্রাইমস অফ ইন্ডিয়া, সিজন ১, অক্টোবর ১৫,২০২০,৪৫.০৯ মিনিট।

জাতের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু এটিকে অন্য কিছু ভাবে ভাবা একদমই বোকামো হবে। হতেই পারে মরিচঝাঁপি গণহত্যা ছিল তিনজাতির অধীনে থাকা কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা আগলে থাকার প্রচেষ্টার অন্তিম পরিণতি, কিন্তু সেই একই ব্যাপার, অন্য কেউ তো নয়ই, সিপিএম আরোই এই ব্যাপারে কিছু স্বীকার করবে না। বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেখিয়ে, বিভিন্ন মানবধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য কমিউনিস্টদের পরিচিতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু দিনের শেষে বিশ্বব্যাপী তাদের কুকীর্তি ধরা পড়েছিল, কোনো প্রকার পন্ডিতি ধূর্ততাই সেটি আড়াল করতে পারেনি। তাদের এই রকম ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে অবশ্য খুব একটি বিতর্ক নেই। "ঔপনিবেশিক বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া ও সমর্থকদের কেন্দ্রবিন্দু এই ভৌগোলিক ভাবে একসঙ্গে থাকা কৃষকসমাজটি পূর্ব ও মধ্য ভারতের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। খুব অদ্ভুত ভাবে বাংলার তফশিলি জাতির একটি বড় অংশই কোনো শক্তিশালী দলিত আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য আর থাকলো না।"[25] তুষার ভট্টাচার্য্য এই ঘটনাকে উল্লেখ করে বলেন বাংলার মতো দণ্ডকারণ্যের শরণার্থীদের মধ্যে জাত ভেদাভেদের কোনো ধারণা ছিল না, যেটা তাদেরকে অনেকটাই একে অপরকে সমান ভাবার সুযোগ করে দিয়েছিলো, যেটার সুযোগ তাদের আগে ঘরে ছিল না। "আমি দণ্ডকারণ্যে গেছিলাম। আমি দেখেছিলাম জাত নিয়েই কেউই খুব একটা ভাবতো না। যেটা পশ্চিমবঙ্গে একটা বিরাট সমস্যা।"[26]

কংগ্রেস বা সিপিএম কেউই 'জাতি নির্মূল'-কে তাদের লক্ষ্য হিসেবে স্বীকার করবে না, কিন্তু আদতে তা হয়নি। মতাদর্শগত বা বাস্তব কারণে তারা তা স্বীকার না করলেও, নীচুতলার বিভিন্ন তথ্য থেকে অন্যরকম সত্যিটি উঠে এসেছে। "অন্যান্য রাজ্যে কিছু বিশেষ জাতের তোষণের নীতি রাজনৈতিক দলগুলিকে বরাবরই সুবিধে দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই নীতিটি কোনোকালেই কাজে দেয়নি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, কোনো জাতই সংখ্যাগত বা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে একটি বিশাল ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে প্রভাবশালী ছিল না। এইরকম জনজাতি বিন্যাস বরাবরই জাতিগত আন্দোলন বা দাবিদাওয়া মেটানোর ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হিসেবে কাজ করেছে। বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনে যেমন ছিল আজও এই সমস্যাটি রয়ে গেছে।...এই ধরনের ঘটনা বুঝিয়ে দেয় জাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মসূচির ভবিষ্যত এখানে খুবই ক্ষীণ।"[27]

এরমটা হয়তো হতো না যদি পশ্চিমবঙ্গে নমঃশূদ্র শরণার্থীদের থাকতে দেওয়া হতো। আজকের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনভাবেই অবশ্যম্ভাবী ছিলো না, শুধুমাত্র কংগ্রেসের ও সিপিএমের বিভিন্ন রাজ্যে ও মরিচঝাঁপিতে

---

[25] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুসূয়া বসু রায় চৌধুরী, ইন সার্চ অফ স্পেস: দ্য সিডিউলড কাস্ট মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল আফটার পার্টিশন। কলকাতা রিসার্চ গ্রুপ, ২০১৪, পৃ. ১২।

[26] তুষার ভট্টাচার্য্য, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ১৬।

[27] অয়ন গুহ, "কাস্ট এন্ড পলিটিক্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল: ট্র্যাডিশনাল লিমিটেশনস এন্ড কনটেম্পোরারি ডেভেলপমেন্ট", কনটেম্পোরারি ভয়েসেস অফ দলিতস, ২০১৭, ৯(১), পৃ. ৩০-৩১।

শরণার্থীদের ছত্রভঙ্গ করার ফলে এই পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। তাদের একসাথে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসা উচিত ছিল কিনা এই নিয়ে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতর্কও আছে। সমালোচকরা যদিও দেখিয়েছেন সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেস সরকারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লে আরোই তারা একে অপর থেকে দূরে সরে যেত কারণ তাদেরকে অভুক্ত রেখে কংগ্রেস সরকার তাদের বশ্যতা আদায় করে নিতো। পূর্ব বাংলায় কংগ্রেসি জমিদারদের আতঙ্ক ছিল একই জায়গায় একত্র থাকা দলিতরা, তার পুনরাবৃত্তি আটকানোর জন্য তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই যুক্তিটিই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং কংগ্রেস ও সিপিএম দু'দলই এটা মেনে নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে থাকলে তিনজাতির আধিপত্যের বাধা হয়ে দাঁড়াতো দলিতরা। এখনকার পরিস্থিতি অনুযায়ী কেবলমাত্র দলিত, মুসলিম ও আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ জোটই উচ্চবর্ণদের ক্ষমতা থেকে সরাতে পারবে কিন্তু এই ক্ষমতালোলুপ গোষ্ঠীগুলি কিন্তু নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখতে সব কিছুই করতে প্রস্তুত যেমনটি তারা দেখিয়েছিলো মরিচঝাঁপির সময়।

কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রেও শরণার্থীদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য একই রকম রাজনৈতিক যুক্তি খাটে। নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকা দলিত ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দ্বারা গোটা রাজ্যের কর্তৃত্বগ্রহণের সম্ভাবনাকে একপ্রকার সমান্তরাল সরকারই বলা হতো। এই যুক্তিকে হয়তো গণহত্যার জন্য দায়ী করা যেত, কিন্তু সেক্ষেত্রে মরিচঝাঁপিতে বসতকারীর সংখ্যা মোটেই আশঙ্কাজনক ছিল না। যদি তাদেরকে থাকতে দেওয়া হতো পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য দলিত উদ্বাস্তু মানুষদের মতো সহজেই তারা কমিউনিস্টদের দলে চলে আসতো। সিপিএমের মধ্যে একটা অংশ চেয়েছিলো, মরিচঝাঁপির বসতিকে স্বীকৃতি দিতে, কিন্তু তাদের কাছে দলের নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা ছিল না।[28] যেটা কমিউনিস্টদের কাছে সমর্থন বাড়ানোর একটি সুযোগ ছিল, সেটি থেকে তারা কোনোপ্রকারে রেহাই পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বিরোধী থাকার সময় তারা এটিকে হিসেবেই দেখে ছিল কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর কোনোভাবে এটিকে তারা ঝামেলা হিসেবে দেখতে শুরু করে। তাদের নেতৃত্বের মধ্যে হয়তো কোনো দলিত না থাকার ফলে তারা নিজেদের প্রথাগত উচ্চবর্ণ ভাবনা চিন্তার বাইরে কমিউনিজমের সাহায্যে দলিতদের উন্নতির কথা ভাবতে পারেনি।

শরণার্থীরা এক দোটানার মুখোমুখি পড়ে গেছিলো। সিপিএম চেয়েছিলো তারা তাদের পার্টির সংগঠনে যোগ দিক কিন্তু শরণার্থীরা নিজেদের সংগঠনেই থাকতে চেয়েছিলো কারণ কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ফিরে এলে সিপিএমের সংশ্রব তাদেরকে আবার ঘরছাড়া করতে পারতো। সরাসরি অধিবাসী না হওয়ার কারণে তারা বামফ্রন্ট সরকারের দলগুলির মধ্যে বিবাদ বোঝার সুযোগ পায়নি, তারা ভেবে নিয়েছিল তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গে থাকতে দেওয়ার ব্যাপারে সবারই অভিন্ন মতামত। ঔপনিবেশিক নমঃশূদ্র আন্দোলন যেটি উচ্চাকাঙ্খী মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা পরিচালনা করেছিলেন, তাদের সাথে এই শরণার্থী সংগঠনের নেতৃত্বের অনেকটাই তফাৎ ছিল। শরণার্থীদের নেতা সতীশ মন্ডল নিজের নাম সই করতে পারলেও, ছিলেন নিরক্ষর। তিনি অবশ্য একজন ভালো সংগঠক ছিলেন এবং দণ্ডকারণ্যের একজন সফল ব্যবসায়ীও হয়ে উঠেছিলেন। অন্যান্য নেতারাও ছিলেন অক্ষরজ্ঞানহীন কিন্তু মোটামুটি সবাই ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে নীচুতলা থেকে উঠে এসেছিলেন, সেটাই হয়তো ধর্ষণ, খুন ও না খেতে পাওয়ার কষ্টর মুখে তাদেরকে রাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার

[28] অমিয় কে. সামন্ত, মরিচঝাঁপি ইন পাল(এডিটর) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ১০৫।

সাহস জুগিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে তাদের সরাসরি কোনো মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য ছিল না, কিন্তু তাদের লক্ষ্য ছিল তাদের থাকা ও চাষবাসের জন্য জমি জোগাড় করা।

সতীশ মন্ডলের একমাত্র যে বর্ণনা আমি মরিচঝাঁপিতে পেয়েছি সেখানে পাওয়া যায়, "একজন বৃদ্ধ মানুষ, যেন বহু প্রাচীন যুগ থেকে এসেছেন, তার ধবধবে সাদা দাড়ি উড়ে যাচ্ছে আর তিনি বাঁধের উপর বসে চড়কায়ে সুতো বুনছেন। শান্ত ও নিরুত্তাপ। তিনি সতীশ মন্ডল। বয়স পঞ্চান্ন, মাছ ধরার জাল বুনতে ওস্তাদ। তার দুর্বল হাত দিয়ে একরকম ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে তিনি তার থাকার জায়গা টি বানিয়েছেন, একটা কুঁড়ে ঘর এবং চারপাশের মানুষজনের সুবিধের জন্য মাটিও খুঁড়েছেন। তিনি শেষ তিনদিন ধরে কোনোরকম রান্না করা খাবার খাননি। 'এতো যন্ত্রণায় আছেন! তাও আপনারা সবাই এই জায়গায় থাকতে চাও কেন?' ঋষির মতো মানুষটি সংক্ষেপে যা উত্তর দিলেন তা অনেকটা এরকম:' দণ্ডকারণ্যে যে ত্রিশ বছর কাটিয়েছি সেখানে নৈরাশ্য আর হতাশা ছাড়া কিছুই ছিল না। যদি বা বৃষ্টির দেবতা দেখা দিতেন তাতেও দুমাসের বেশি পরিবারকে খাওয়ানোর রসদ হতো না। পুনর্বাসনের দায়িত্বে থাকা সরকারি কর্মীরা কেউই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার কথা শুনতে রাজি ছিলেন না। আমরা হয়ে গেছিলাম ফুটবলের মতো। নিজেদের মর্জি মতো যেখানে খুশি আমাদেরকে পাঠাতো। আমরা যদি এই সুন্দরবনে তিন চার মাস খিদে কে জয় করে বেঁচে থাকতে পারি তাহলে আমরা এই জায়গাতে খুব সুন্দর একটি জনবসতি তৈরী করতে পারবো। সমস্ত রকম ঝঞ্ঝা সহ্য করছি একটি স্বপ্নকে সত্যি বানাবো বলে। ওখানে কুড়ি বছর ধরে টিকে ছিলাম। তোমার কি মনে হয় তিন চার মাসের যন্ত্রণা আর সমস্যাকে সামলাতে পারবো না? আর তারপর, কেউ আমায় রিফিউজি বলতে পারবে না। আমার নিজের একটা ঘর হবে।[29]

মরিচঝাঁপি ছাড়ার পর সতীশ মন্ডল তার স্ত্রী ও তিন ছেলেকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে একটি বাড়ি পেয়েছিলেন। ২০০৬ সালের ২৭শে মে একজন তথ্যচিত্র পরিচালক তুষার ভট্টাচার্য তার সাথে দেখা করেন। তার বাড়িটি ছিল দোতলা; এবং খুব সহজেই কেউ বুঝতে পারবে যে তিনি এখন স্বচ্ছল অবস্থাতেই আছেন ... তার বড়ো ছেলে আগেই স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন, যে তিনি তার বাবাকে মরিচঝাঁপি বা এই সব বিষয় নিয়ে কিছু বলতে দেবেন না। আমাদের কোনো আবেদন আবদারই উনি শুনলেন না। তার ছবি তোলার কথা বলতে গেলেও তিনি আপত্তি জানান .. বড়ছেলেটি মৎসশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার কাজের জন্য তাকে সকালবেলা বেরোতে হতে হতো এবং সন্ধেবেলা উনি ফেরত আসতে পারতেন। বলাই বাহুল্য আমাদেরকে সন্ধ্যের আগে বড় ছেলে ফেরার আগে সতীশবাবুর সাক্ষাৎকার শেষ করতে হতো।

সতীশবাবু উঠোনে বসে থাকতেন, তাকে দেখে বোঝাই যেত তার শরীর বেশ খারাপ এবং তিনি কথাও ঠিক করে বলতে পারতেন না। তার স্ত্রী তাকে এক কাপ চা হাতে দিতেন। আমরা আধঘন্টা ছিলাম কিন্তু পনেরো মিনিটের একটি

[29]জ্যোতির্ময় দত্ত, "টেন থাউজেন্ড রবিনসন ক্রুশো", যুগান্তরে প্রকাশিত, জুলাই ২৭ এবং ৩০, ১৯৭৮। পুনর্মুদ্রিত হয়েছে পাল(সম্পাদক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ, ৩০।

সাক্ষাৎকারই রেকর্ড করতে পেরেছিলাম।"[30] পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাছে খবর ছিল তিনি কোথায় থাকতেন, যদিও দণ্ডকারণ্যে তাকে গ্রেফতার করা হয়নি, হয়তো যে সময়ে গণহত্যা কে তারা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছিলো তাকে বন্দি করে জনমানসে কোনরকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া তারা সৃষ্টি করতে চায়নি।[31] মণ্ডলবাবুর ছেলেও হয়তো এই গ্রেফতারির ভয়েই কোনোরকম প্রচার চাননি। ডঃ সামন্ত আই পি এস, শরণার্থী নেতাদের নিয়ে লিখেছিলেন, "সতীশ মন্ডল, কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর নিজের বিস্তৃত ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখতে মধ্যপ্রদেশে ফিরে যান। রাইহরণ বারুই কিছু লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের খুলনায় চলে যান এবং বেশ কয়েকবছর সেখানে থাকার পর ভারতে ফিরে আসেন। রঙ্গলাল গোলদার কিছুদিন বাদে ক্যানিং অঞ্চলে উদয় হন এবং সিপিএমের নিরাপত্তার মধ্যেই ছিলেন। জনশ্রুতি অনুযায়ী তিনজনই মারা গেছেন।"[32] দীপ হালদারের পরিবারের সাথে গোলদারের মেয়ে লুকিয়ে ছিলেন এবং তাঁর 'ব্লাড আইল্যান্ড' বইটিতে তার কথা লেখাও হয়েছে।[33]

এটা জানা গিয়েছিলো, শরণার্থীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছিলেন, একটি রাইহরণ বারুইর সাথে যারা সরকারের সাথে কোনোরকম সহযোগিতার বিরোধিতা করেছিল অন্যদিকে রঙ্গলাল গোলদারের নেতৃত্বে যিনি সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে তাকে কেন থাকতে দেওয়া হয়েছিল, তা বোঝা যায়। গোলদার মনে করতেন, "রাইহরণ বিরোধী রাজনীতিতে ঢুকে সংবাদমাধ্যমে উস্কানি মূলক কথাবার্তা বলে সরকারকে ক্ষুদ্ধ করেছিলেন। যখন আমরা শহর থেকে লোকজনদের আসতে বলেছিলাম, উনি বামফ্রন্টের কাউকে দ্বীপের মধ্যে পা রাখতে দেননি। এটা একটা ভুল পদক্ষেপ ছিল। জলে থেকে কুমিরের সাথে শত্রুতা করা যায় না।"[34]

যদিও সিপিএম নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলো যে তারা কারুর কথা শুনতে রাজি ছিলো না এবং শরণার্থীদের অন্ধ আনুগত্য ও তাদের দণ্ডকারণ্যে ফেরত চলে যাওয়া চেয়েছিলো। হয়তো সিপিএমের সংশ্রবে থাকাও যথেষ্ট ছিলো না তাদের থাকার জন্য কারণ আনুগত্যর জন্য তাদেরকে ওই জমি ছাড়তেই হতো। তাদেরকে ওখানে সিপিএম সমর্থক হিসেবে থাকতে দেওয়া হলেও, বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে তাদেরকে আবার উচ্ছেদের মুখোমুখি হতে হতো।

তখন থেকেই গণহত্যার প্রকৃত কারণ লোকেদের ভাবিয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ পার্থ চ্যাটার্জি লিখেছেন, "১৯৫০ সালের সরকারি শরণার্থী পুনর্বাসন নীতি সুবিধা করে দিয়েছিলো মূলত উচ্চবর্ণের শরণার্থীদের। তফসিলি দলিত সম্প্রদায়ের

---

[30] তুষার ভট্টাচার্য, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, খসড়া ইংরেজি অনুবাদ, পৃ. ১৫-১৬।

[31] অমিয় কে সামন্ত, "মরিচঝাঁপি", পাল (প্রকাশক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ১১০।

[32] অমিয় কে সামন্ত, "মরিচঝাঁপি", পাল (প্রকাশক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ১১০।

[33] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, হার্পার কলিন্স, ২০১৯, পৃ. ১১৭-১৩২।

[34] নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি, "মিডনাইটস আনওয়ান্টেড চিলড্রেন: ইস্ট বেঙ্গলি রিফিউজিস এন্ড দ্য পলিটিক্স অফ রিহ্যাবিলিটেশন", পিএইচডি থিসিস, ব্রাউন উনিভার্সিটি, ১৯৯২, পৃ. ৩৭৮।

শরণার্থীদের জন্য বরাদ্দ ছিল দণ্ডকারণ্য ও আন্দামানে জোর করে স্থানান্তকরণ। যখন ১৯৭৭ এর বামফ্রন্ট সরকার তৈরীর পর অনেকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরতে চেয়েছিলো, তাদেরকে উগ্রভাবে মরিচঝাঁপিতে দমন করা হয়। এই সিদ্ধান্ত গুলো বুঝিয়ে দিয়েছিলো উচ্চবর্ণেরা তাদের স্বার্থ ঠিকই বজায় রাখতে পেরেছিলো।[35]

এটি নীতির ফলাফলের কথা বললেও, উচ্ছেদের সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা দলিতদের বিরুদ্ধে কতটা পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন তা বোঝা শক্ত। কারুরই দলিতবিরোধী বলে কোনো পরিচিতি ছিল না। তারা কিন্তু ভালো করেই জানতেন, কোনধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে তারা পার পেয়ে যাবেন এবং অন্যান্য প্রভাবশালী সংখ্যালঘুদের মতো দলিতদের গণহত্যার জন্য কোনোরকম শাস্তির সম্মুখীন যে তারা হবেন না, এটাও তাদের জানার কথা। শরণার্থীদেরকে সিপিএম বিপদ বলে মেনে নিলেও এটা তাদের শ্রেণী বা জাতির জন্য না দুয়ের জন্যই তা অজানাই রয়ে গেছে। একইরকম উচ্চবর্ণের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের ছোট শরিক দলগুলির অনেকে এবং সিপিএমের নিজেদের অনেক ক্যাডার শরণার্থীদের সমর্থন করেছিল। সরকারের মধ্যে দলগুলির এই ভিন্নমত আদর্শগত বা সিপিএমকে দুর্বল দেখানোর জন্য সুযোগসন্ধানী উপায় হতে পারে। কিন্তু ক্ষমতাশীল দলগুলির মধ্যে কেউই আর গণহত্যার পর মামলা এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়নি।

সাবল্টার্ন সিরিজের বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা সম্ভবত অভিযুক্তদের সাথে পারিবারিক ও দলীয় সম্পর্ক থাকার কারণে আগের উক্তিটি বাদ দিয়ে তাদের প্রকাশনা থেকে এই ঘটনার কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। যদিবা সিপিএম এটিকে তাদের একাধিপত্যের জন্য বিপজ্জনক হিসাবে ভেবে থাকে, শঙ্কাজনক হওয়ার জন্য এই জনবসতিটি খুবই ছোট একটি এলাকা ছিল। তাদেরকে উপেক্ষা না করে, হত্যা করা ছিল তাদের জন্য একেবারেই ভুল একটি পদক্ষেপ। ভারতের ভোটদাতাদের মধ্যে প্রায় ১৬% মানুষ হচ্ছেন দলিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, কমিউনিস্টদের তাদেরকে দূরে সরানো একদমই উচিত ছিল না। কমিউনিস্ট হওয়ার পরিবর্তে একরকম স্তালিনপন্থী স্বেচ্ছাচারী দল হিসেবে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্ব করে তারা বুঝিয়ে দিয়েছিলো তাদের আসল প্রতিকৃতি। ক্ষমতাশালী উচ্চবর্ণ অভিজাতরা স্বীকার না

---

[35] পার্থ চ্যাটার্জি," পার্টিশন এন্ড দ্য ডিস্‌এপিয়ারেন্স অফ কাস্ট', দ্য পলিটিক্স অফ কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, সম্পাদক উদয় চন্দ্র, গেইর হেইএরস্টাড, এন্ড কেনেথ বো নিয়েলসেন, রুটলেজ, ২০১৭, পৃ. ৯৭। অধ্যাপক চ্যাটার্জি বইয়ের পাণ্ডুলিপি পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন পড়ে আমাকে জানাবেন, যেমনটা সাধারণত পাণ্ডুলিপি পাওয়ার পর উত্তর আসে। এই বিষয়ে তার মতামত যাই থাকুক মরিচঝাঁপির সময়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ছোট করেও ঘটনাটিকে উল্লেখ করতে তার প্রায় চার দশক লেগেছিলো বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর। অক্সফোর্ডে থাকার সময় আমি সাবল্টার্ন স্টাডিজের প্রতিষ্টাতা রণজিৎ গুহর সঙ্গে সাসেক্সে দেখা করেছিলাম। তিনি যুবা বয়সে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ফ্রন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আমার কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিচিত তার কাছে ছিল। তিনি বিষয়টিকে তাচ্ছিল্য করে বলেন আমার নিজের পরিদর্শক তপন রায়চৌধুরীর কাছেও একইরকম পরিচিতি ছিল, কিন্তু তিনি কিছুই করেননি তাই আমি একরকম সময় নষ্ট করছি এর পিছনে পড়ে থেকে। আমার নিজের পরিদর্শকও এই সমস্ত পরিচিত মানুষদের সন্ধান দিতে রাজি হননি তাই আমাকে নিজেকেই খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়েছিল যাতে অনেক সময়ও লেগেছিলো যেটা হয়তো ওনারা অগ্রণী হলে হত না।

করলেও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত, দলিতদের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে অভিজাত উচ্চবর্ণরা তাদের ক্ষমতার সামান্যতম বিচ্যুতিতেও খুন করতে প্রস্তুত।[36]

গণহত্যার বহু দশক পার হয়ে যাওয়ার পড়েও বামফ্রন্টের নেতারা ঘটনাটি সম্বন্ধে বুঝতে চাননি এবং অন্তত পক্ষে জনসমক্ষে কিছু কবুল করতে চাননি। ইন্ডিয়া টুডে ম্যাগাজিনের এক সম্পাদক একটিমাত্র নেতাকে খুঁজে পেয়েছিলেন এই

---

[36] "দ্য পলিটিক্স অফ কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল" যেখানের সংশোধনবাদী ইতিহাসে জাতিগত বিভেদের কথা আছে, গণহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। দলিতদের কাছে এর গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা অভিজাত উচ্চবর্ণ ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের সাথে দলিতদের অনুভূতির অসামঞ্জস্যকেই প্রকট করেছে। আরো শোচনীয় ভাবে এই ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা হয়েছে ২০১৬ সালে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর প্রকাশিত হওয়া দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যের বইতে। এখানে শুধুমাত্র বলা হয় সরকার দণ্ডকারণ্য থেকে চলে আসা শরণার্থীদের আটকানোর জন্য একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মরিচঝাঁপির বা গণহত্যার কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়। অথচ লেখক পালের বইটিকে তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন, পুঙ্খানাপুঙ্খ যেখানে মরিচঝাঁপির রক্তাক্ত বর্ণনা আছে। লেখক কিন্তু এই বইটি ও আমার কেমব্রিজ উনিভার্সিটি প্রেসের বইটির খসড়া পড়ে ভালোভাবেই গণহত্যার কথা জানলেও, কোথাও এই হত্যাকাণ্ডের কথা লেখেননি বরং তুলনামূলক ভাবে কম উগ্র ও বেশি প্রচারিত সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে ভূমিউচ্ছেদ নিয়ে একটি গোটা পরিচ্ছেদ লিখে ফেলেছেন। বারবার বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলে হয়তো বামফ্রন্টকে পুনরোজ্জীবিত করার রাস্তা অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু সত্যিটা যেহেতু সবারই জানা বামফ্রন্টকে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের মধ্যে জনপ্রিয় করতে হলে এই গণহত্যাকে অবশ্যই ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে। সোভিয়েত রাশিয়ায়ে 'ডিস্তালিনাইজেশন', স্তালিনকে ছাড়া এগিয়ে যাওয়ার যে প্রচেষ্টা হয়েছিল সিপিএম সেটাই কোনোদিনও করতে চাইনি, তারা এতটাই স্তালিনের প্রতি অনুগত ছিল। তার ছবি তাদের জাতীয় কংগ্রেস গুলোতেও থাকতো। মরিচঝাঁপি সম্বন্ধে যেসব বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা জানতেন, তারা বামফ্রন্ট সরে যাওয়ার পরেও এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন; যেটা একরকম বুঝিয়ে দেয় তাদের অতীত কে মেনে নেওয়ার অনীহা এবং তাদের এই ঘটনা আড়াল করার পিছনে নিজেদের ভূমিকা। এখনও বাঙালিরা ও বামেরা মরিচঝাঁপির এই ঘটনাতে দেখতে পাওয়া নিজেদের প্রতিচ্ছবি নিয়ে অস্বস্তি তে ভোগে। এই ঘটনা নিয়ে কোনোরকম লুকোছুপি কাজ করবে না জেনেও তারা নিজেদের করা এই গণহত্যাটি নিয়ে তদন্ত করার বদলে ধামাচাপা দেওয়ার সবরকম প্রচেষ্টা করেছিল, নিজেদের আরো গভীরে ফেলে। ভুলে যাওয়ার জন্য খুব বেশি মানুষই বিষয়টি নিয়ে জানতেন এবং বিরোধীরা খুবই সক্রিয় ছিল এই ঘটনাকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। এই ঘটনার বর্তমান রাজনৈতিক তাৎপর্য্য বোঝা যায় যখন ২০২১ সালের নির্বাচনের জন্য বিজেপির দিক থেকে ইউটিউবে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। বিজেপির জন্য এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত ছিল এই ঘটনা নিয়ে প্রচার করা যেহেতু কমিউনিস্ট উত্তর সরকারগুলি এটি নিয়ে তেমন কোনো পদক্ষেপই নেয়নি খুব সহজেই তা বাম ও রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারকে দুর্নাম করেছিল (ভিএসকে দক্ষিণবঙ্গ, মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার ২৪শ থেকে ৩১ শেজানুয়ারি ১৯৭৯: লেফটিস্ট ইনহিউম্যান এট্রোসিটি, মার্চ ৩, ২০২১ ইউটিউব)। অপরাধীদের সরাসরি সামনে এসে দোষ না স্বীকার করা বামদলগুলিকে আরো আঘাত করেছিল। এই ঘটনা সরাসরি মেনে না নেওয়া বামফ্রন্টের পুনর্জীবন আরো কঠিন করে তুলেছে। দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, গভর্নমেন্ট এস প্র্যাক্টিস: ডেমোক্রেটিক লেফ্ট ইন এ ট্রান্সফরমিং ইন্ডিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬, পৃ. ১২। তুলনামূলক ভাবে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "১৯৭৯ সালে মরিচঝাঁপির ঘটনার সময় যখন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশ সুন্দরবনের জঙ্গলে জনবসতি গড়ে তোলা দলিত শরণার্থীদের হত্যা করেছিল (মল্লিক, ১৯৯৯ আরো বিস্তৃত জানার জন্য) , সেই ধাক্কার আগে পর্যন্ত শরণার্থীরা কমিউনিস্টদের বিশ্বস্ত সমর্থক ছিল।" শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, "পার্টিশন এন্ড রাপচারস ইন দলিত আইডেন্টিটি পলিটিক্স ইন বেঙ্গল", এশিয়ান স্টাডিজ রিভিউ, ডিসেম্বর ২০০৯, খন্ড ৩৩, পৃ. ৪৬৪। বিদেশে কাজ করার সুবিধের কারণে বা আদর্শগত ভিন্নমতের জন্য এই লেখা সম্ভব হয়েছিল কিনা তা নিয়ে চর্চা করাই যায়, কিন্তু অন্য লেখাটি একটি গোপন করার প্রচেষ্টা ছিল, যেটি এই লেখাটি ছিল না।

বিষয়ে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য। বামফ্রন্টের সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি সেখানে বলেন ওই গণহত্যার সময়ে দশেরও কম মানুষের মৃত্যু হয়েছিল যখন ওই সম্পাদক নিজে বারবার বলছেন যে ওই ঘটনার সাক্ষী ও অংশগ্রহণকারীদের সাথে উনি কথা বলে জেনেছেন হাজারেরও বেশি মানুষের মৃত্য হয়েছিল ওই হত্যাকাণ্ডে। যদিও মন্ত্রী মেনে নেন যে শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে বলা ছিল খুবই নিম্নমানের রাজনীতি এবং ভুল ছিল তাদের কম্পিউটার আসা আটকানোর আন্দোলনও। কিন্তু উনি ততটা ভুল স্বীকার করতেই রাজি ছিলেন। প্রাক্তন মন্ত্রী বিশেষ সাহায্যপ্রাপ্ত মানুষদের থাকার অ্যাপার্টমেন্ট দখল করে নিজেও খুব একটা ভালো ছাপ ফেলতে পারেননি।[37] গাঙ্গুলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের পিছনে জাতপাতের কোনো ভূমিকা আছে বলে মেনে নেননি। "আমাদের ওই দ্বীপ খালি করার পিছনে নমশূদ্র বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। নমশূদ্রদের উচ্চবর্ণের লোকেদের উপর ব্রাহ্মণ্যবাদের উপর যথেষ্ট রাগ আর ঘৃণা ছিল, কিন্তু আমাদের সরকারের নিম্নবর্ণের শরণার্থীদের প্রতি কোনো বৈষম্য ছিল না...ওই নমশূদ্রদের ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ছিল। একজন ব্রাহ্মণ হিসেবে আমি এটি নিজে দেখেছি।"[38] সেই সময়ে রাজ্যের প্রত্যেক রাজনৈতিক ভাবে সচেতন মানুষ দলিতদের কাছ থেকে এই ব্যাপক গণহত্যা সম্বন্ধে শুনে ফেলেছিলেন, যা স্বভাবতই বিশ্বাসযোগ্য ছিল, তাই শুধুমাত্র বিষয়টিকে অস্বীকার করে দলিতদের সাথে বামফ্রন্টের যে দূরত্ব তৈরী হয়েছে তা মেটানো যাবে না। জাতিগুলিকে কাছাকাছি আনার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি তদন্ত জরুরি ছিল, কিন্তু যেহেতু সবাই মোটামুটি জানতো সরকারের বক্তব্য মিথ্যাচার ছিল, যেকোনো বিশ্বাসযোগ্য অনুসন্ধান কমিউনিস্টদের জন্য আরো বড় বিপদ ডেকে আনতে পারতো, তাই তারা সমস্ত অভিযোগকে অস্বীকার করে।

আমি একজন অধ্যাপকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম গণহত্যার মূল কারণ, তার প্রত্যুত্তর ছিল; "সিপিএম কেন এরম করেছিল তা নিয়ে অনেক মতামত আছে, প্রত্যেকটাই ছিল এক অপরের মতো হাস্যকর।" একজন সিপিএম ক্যাডার জানিয়েছিলেন তার দল "অনমনীয়" ভাবে শরণার্থীদের সাথে ব্যবহার করেছিল এবং তাদের উচিত ছিল শরণার্থীদের সাহায্য করে একটি "অনুগত সমর্থকগোষ্ঠী" তৈরী করা, কিন্তু সিপিএম রাজ্য কমিটিতে এই বিষয়ে কেউই পার্টির রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্তকে বাধা দেননি। কলকাতা হাইকোর্টে মরিচঝাঁপির শরণার্থীদের আইনজীবী শাক্য সেনের মতে, "কেন সরকার হঠাৎ করে শরণার্থীদের দণ্ডকারণ্যে সরাতে মরিয়া হয়ে উঠলো, তা রহস্যই রয়ে গেছে। জ্যোতি বসু ছিলেন একজন স্বৈরাচারী। তিনি হয়তো মেনে নিতে পারেননি কেউ তার নির্দেশ অগ্রাহ্য করছে। আর কিছুই নয় কারণ হয়তো ছিল তার অপমানিত হওয়া অহংবোধ।"[39] দলের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা অজানা কিন্তু অন্য রাজ্য

---

[37] আমার নিজের সিপিএম তত্ত্বাবধায়ক খুব সহজেই অনেক অ্যাপার্টমেন্ট হাতিয়ে ছিলেন, যেটা বামফ্রন্টের আমলে খুব পরিচিত দুর্নীতি ছিল। বামফ্রন্ট সরকারের পতনের বড় কারণ ছিল শাসকদলের সুবিধের জন্য সম্পত্তি দখল অন্যদিকে তাদের হাতে মরিচঝাঁপির মতো জায়গায় বসতকারী মানুষদের হত্যা, যা তাদের নিজেদের মধ্যে বৈপরীত্য ও ভণ্ডামিকে সর্বসমক্ষে এনে দিয়েছিলো।

[38] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, হার্পার কলিন্স, ২০১৯, কিন্ডেল লোকেশন: ১৪০০।

[39] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, হার্পার কলিন্স, ২০১৯, কিন্ডেল লোকেশন: 1047।

কমিটির নেতারা হয়তো জানতে পারেন কিভাবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এটা জানাও সম্ভবত যাবে না কারণ যারা বেঁচে আছেন দলের বিভিন্ন উচ্চপদে তারা কেউই এগিয়ে আসেননি। তখন এটা বোঝা না গেলেও যদি তারা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সাহায্য করতো এটা তাদের একমাত্র সফল পরিকল্পনা হতো। তাদের অন্যান্য ব্যবস্থা গুলি বিভিন্ন সরকারের থেকে আলাদা ভাবে গরিবদের কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি। শুধুমাত্র বিশ্বের ইতিহাসে গণতান্ত্রিকভাবে জিতে আসা দীর্ঘতম কমিউনিস্ট সরকার হিসেবে নয় বরং এই সম্মানের মর্যাদা না দিয়ে কত অল্প কাজ তারা করতে পেরেছিলো এই দীর্ঘ সময় তার জন্যেও এটি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

গণহত্যার একটি কারণ জানা যায় প্রত্যক্ষদর্শী মনোরঞ্জন মন্ডলের বয়ান থেক। "আমি কোনো সভা সমিতিতে ছিলাম না. আমার একটি দোকান ছিল। প্রত্যেকদিন রেশন বিক্রি করতাম। আমি মালপত্রের যোগান পেতাম মরিচঝাঁপির পাশের দ্বীপ কুমিরমারি থেকে, আমার ভালোই দিন যাচ্ছিলো... কিন্তু পুলিশ গুলি চালানোর পর আমি আমার মাকে আর দেখতে পেলাম না। চলে আসার পর আমি আর তাকে আর খুঁজে পাইনি.. আমি জানি কেন আমাদের উপর হামলা হয়েছিল। আমরা, (পূর্ব) পাকিস্তান থেকে আসা নিম্নবর্ণের ভূমিহীন কিছু মানুষ যে স্বাবলম্বী ভাবে বাঁচতে পারছি, সেটা অনেকেরই সহ্য হয়নি।"[40] যদিও মুখ্যমন্ত্রীর বিদ্বেষ থাকার কথা নয়, কিন্তু জ্যোতি বসু কিছুটা হলেও শঙ্কিত হয়েছিলেন। কিন্তু সঠিক তথ্যপ্রমাণের অভাবে আসল ভয়ের কারণ কি ছিল তা অনুমানই রয়ে গেছে।

গণহত্যার বিরোধিতা বামপন্থীরা কেন করেছিল, সেটা সিদ্ধান্তদাতাদের কাছে বোঝা খুব সহজ ছিল। দলিতরা ছিল পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ এবং ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ১৬%। কুড়িকোটি ভোট আছে এমন কোনো নির্বাচকমন্ডলীকে কোনো রাজনৈতিক দলই আলাদা করতে চাইবে না। এমনকি হিন্দু মৌলবাদীরা যাদের শাস্ত্র নির্দেশিত বর্ণভেদ প্রথাকে সমর্থন করার কথা তারাও প্রভাবশালী সমর্থক হিসেবে দলিতদের পাশে দাঁড়াতে রাজি ছিল। মুসলিমদের সাথে দূরত্ব তৈরী হয়ে যাওয়ার পর দলিতদের সাথেও একই পরিণতি হলে নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতা দখল করা অত্যন্ত কঠিন হতো। এছাড়া এই রকম সম্পর্ক বজায় থাকলে দলিতরা খৃষ্ট ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে সহজেই উৎসাহিত হতো, যেটা আটকানো দরকার ছিল হিন্দু শাসন বজায় রাখতে গেলে। যদিও গোহত্যা নিয়ে তাদের খবরদারি এই প্রচেষ্টাকে অনেকটাই দুর্বল করে দিয়েছিলো। দিনের শেষে যদি কেউ কমিউনিজম এ আকর্ষিত হয়, দলিতরাই সেই দিক দিয়ে সবচেয়ে আগে থাকবে, তাই তাদেরকে খুন করা ছিল একদম নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। কমিউনিস্টরা ভেবেছিলো অসংগঠিত এবং রাজনৈতিক ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার কারণে কোনোরকম রাজনৈতিক মূল্য না দিয়েই তারা দলিতদেরকে উচ্ছেদ করতে পারবে। পরবর্তী তিনদশকে তারা ঠিকই প্রমাণ হয়েছিল। তারা যেটা বুঝতে পারেনি তা হলো আজীবন দলিতরা অসঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বা এই হত্যাকান্ড ভুলে থাকবে না।

---

[40] সুমাল্য মুখোপাধ্যায়, "থিংকিং অফ মাইগ্রেশন থ্রু কাস্ট: রিডিং ওরাল ন্যারেটিভস অফ ডিসপ্লেসড পার্সন(স) ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান (১৯৫০-১৯৭০)", জার্নাল অফ মাইগ্রেশন এফেয়ার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃ ১২৪।

সেই সময় যে কমিউনিস্টদের পিছনে যে কেন্দ্রীয় সরকারের মদত ছিল তা সবারই জানা ছিল কারণ শাসক জনতা দলের লোকসভায় সিপিএম সাংসদদের সমর্থন প্রয়োজন ছিল। প্রধানমন্ত্রী দেশাই তাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেটা চেয়েছিল সেটা করতেই উৎসাহিত ছিলেন। "প্রফুল্ল চন্দ্র সেন (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) ঘোষণা করেছিলেন তিনি মরিচঝাঁপিতে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী (জ্যোতি বসু) একটি সভা ডাকেন ও বলে দেন সেনকে যেন দ্বীপে ঢুকতে না দেওয়া হয়। তিনি সরাসরি বলেছিলেন, "ওকে একদম বের করে দেবেন।" কাউকে দূর করে দেওয়ার থেকে থামানো অনেক সোজা কাজ। কিন্তু তাকে কিভাবে আটকানো যেত? কলকাতা থেকে যাওয়ার পথে তাকে গ্রেফতার করা যায়। অন্যভাবে অনেকগুলি লঞ্চ দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাকে মাঝরাস্তায় থামানো যায়। কিন্তু জনসমক্ষে দুটো উপায়েই খুব একটা ফলপ্রসূ হতো না। আমরা এই ব্যাপারে আমাদের অস্বস্তির কথা সরাসরি বলে দিয়েছিলাম। মুখ্যমন্ত্রী আর জোর করেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন যিনি প্রফুল্ল সেনকে মরিচঝাঁপি না যেতে অনুরোধ করেন। সেন কলকাতায় তার বদলে উৎখাত হওয়া মানুষদের সমর্থনে সত্যাগ্রহ (গান্ধীবাদী) আন্দোলন আরম্ভ করেন।[41]

"অভিজ্ঞ এক গাঁধীবাদী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, যিনি মরিচঝাঁপিতে গিয়ে দ্বীপবাসীর উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন করতে চেয়েছিলেন, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই তাকে যেতে দেননি। সমস্ত রাজনৈতিক দলের এইটাই সমস্যা, দলের বৃহত্তর স্বার্থের কারণে প্রতি পদক্ষেপে নিজেদের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। সময়ানুক্রমিক ভাবে মনে নেই কিন্তু স্মৃতিতে আছে লন্ডন থেকে মোরারজি দেশাই জ্যোতি বসুর সাথে ফোনে কথা বলেছিলেন শরণার্থী অচলাবস্থা নিয়ে। জ্যোতি বসু সরাসরি পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের থাকতে দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তখন সিপিএমের সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় ২২ জন সাংসদ ছিল। মোরারজি তার সরকার বাঁচাতে এদের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন হারানোর ঝুঁকি নিতে চাননি। সেই স্বার্থ রক্ষা করতে কয়েক হাজার বাঙালিকে তাদের প্রাণ বলি দিতে হতো। বৃহওর কল্যাণের জন্য এটাও মেনে নেওয়া হয়েছিল।"[42]

জ্যোতি বসু সম্ভবত মরিচঝাঁপির দায়ভার প্রধানমন্ত্রী দেশাইর উপর চাপানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিঠি আদানপ্রদান পেশ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হয়তো কমিউনিস্ট সমর্থকদের মতো সাদাসিধা নয় বলেই প্রকাশিত হওয়ার পর ইংরেজি এই বার্তালাপে জ্যোতি বসুর জনসমক্ষে সিআইএ জড়িত থাকার অভিযোগ বাদ যায়,, শুধুমাত্র একটিই বিদেশী সংস্থা অক্সফ্যামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আন্তরিক এই পত্র প্রত্যুত্তরে আরো বোঝা যায় মুখ্যমন্ত্রী বুঝে গিয়েছিলেন কোনোরকম কেন্দ্রীয় সরকারি পদক্ষেপ আসার সম্ভবনা খুবই ক্ষীণ। ১৯৭৯ এর ২৪শে জানুয়ারির জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, "আমরা মরিচঝাঁপির এই পরিস্থিতি আটকাবো ঠিক করেছি এবং উদ্বাস্তুদের ফেরৎ পাঠানোর জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেবো। আমার আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত সুন্দরবনে গড়ে ওঠা এই জটিল সমস্যা সমাধানে রাজনৈতিক স্তরে সহায়তার জন্য।" প্রধানমন্ত্রী দেশাইর ১৯৭৯ এর

---

[41] অমিয় কে সামন্ত, "মরিচঝাঁপি", পাল (প্রকাশক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ১০৬। .

[42] কমলা বসু, "মরিচঝাঁপি ইন আইসোলেশন", ইন পাল (এডিটর) মরিচঝাঁপি। ইংরেজি খসড়া, ২০১১, পৃ. ১২।

৩০শে জানুয়ারির জ্যোতি বসুকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন, "আপনি এই বিষয়ে যা যা পদক্ষেপ নিয়েছেন বা নিতে চাইছেন তার বিষয়ে আমি আপনার সাথে সহমত।"[43]

যেহেতু প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে কোনোরকম সতর্কীকরণ করেননি, জ্যোতি বসু বুঝে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়া তিনি যা খুশি তাই করতে পারেবন। এই চিঠিগুলির গুরুত্ব বিচার করে কিছু ব্যাখ্যা অত্যন্ত উপযোগী। যখন সবাই তাদেরকে শরণার্থী (রিফিউজি) বলে অভিহিত করছিলো যা বুঝিয়ে দেয় এদের সাহায্য দরকার, জ্যোতি বসু এদেরকে উল্লেখ করছিলেন 'পলাতক' (ডেসার্টর) বলে, যেটা সাধারণত সৈন্যদলের পলাতকদের বলা হয়ে থাকে এবং কিছু যুদ্ধে এদেরকে হত্যাও করা যায়। তাদেরকে এই রকম খারাপভাবে দেখানোর চেষ্টা, যখন মুখ্যমন্ত্রী নিজে জানতেন তারা যে শিবিরগুলি থেকে পালিয়ে এসেছে সেইগুলির অবস্থা কিরকম ছিল যে কারণে তিনি নিজে বিরোধী থাকাকালীন তাদের হয়ে দাবি তুলেছিলেন, বলে দিচ্ছিলো তিনি কোন ধরনের নীতি নিতে চলেছেন। মাত্র চার বছর আগে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারিতে, জ্যোতি বসু ভিলাইতে দণ্ডকারণ্যের শরণার্থী নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ক্ষমতায় এলে তাদের পুনর্বাসনের জন্য সবরকম সরকারি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[44] কংগ্রেসের নীতির প্রতি তার বিরোধিতা বহুদিনের ও বহুপ্রচারিত ছিল। ১৯৫১ সালে তিনি বলেছিলেন, "অন্য জায়গা দখল করে থাকা শরণার্থীদের কোনোভাবেই বলপূর্বকভাবে উচ্ছেদ করা উচিত নয় এবং তাদের জন্য অন্যত্র বসতির ব্যবস্থা করা উচিৎ।"[45]

যখন বিশদে আরো তথ্য সামনে আসে, প্রধানমন্ত্রী দেশাইর এই উচ্ছেদ ও গণহত্যার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী করার নিন্দনীয় ভূমিকা বোঝা যায়। তার জনতা দলকে জাতীয় ও রাজ্যস্তরে এই ব্যাপারে মুখ খুলতে না দেওয়ার ফলে জ্যোতি বসু সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেতে কাজ করতে থাকেন কারণ তিনি জানতেন কেন্দ্রের বা রাজ্য জনতা দল, যেটিকে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ অকেজো করে দিয়েছিলেন তাদের তরফ থেকে তাকে কোনো রকম বাধা দেওয়া হবে না। প্রধানমন্ত্রী যে একজন রাজনৈতিক হিসেবে কাজ করেছেন তা আশ্চর্য্যের ছিল না কিন্তু এখানে তিনি এই গণহত্যা হওয়ার পিছনে ইন্ধন যুগিয়ে ছিলেন এবং হত্যাকান্ড আটকানোর জন্য বা দোষীদের আইনের সামনে আনার জন্য কিছুই করেননি।

উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার পর, জ্যোতি বসু এই নীতির পিছনে স্থানীয় বামফ্রন্টের নেতাদের সমর্থন চেয়েছিলেন এবং তাদেরকে নিজেদের কলকাতার অফিসে ডেকে পাঠান। কুমারমারি দ্বীপের পঞ্চায়েত প্রধান প্রফুল্ল মন্ডলের মতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন:

> আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি কারণ তোমরা শরণার্থীদের সাহায্য করছো। "আমরা বললাম, "না আমরা তা করছি না।"

---

[43] মধুময় পাল (সম্পাদক) মরিচঝাঁপি; ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস, ২০১১, পৃ. ৮৭-৮৮।

[44] এ কে বিশ্বাস, "মেমোরিজ অফ চণ্ডাল জীবন: অ্যান আন্ডারডগ স্টোরি", মেনস্ট্রিম, এপ্রিল ১৩, ২০১৩।

[45] জ্যোতি বসু, ওয়েস্ট বেঙ্গল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি প্রসিডিংস, ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৫১, পৃ. ২৯০।

জ্যোতি বসু: "তাহলে তোমরা কি করছো?" উত্তর "আমরা সমর্থনও করছি না বাধাও দিচ্ছি না।"

জ্যোতি বসু: "এখন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে নির্দেশ এসেছে এদেরকে সরাতেই হবে। আমি তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি কারণ তোমরা স্থানীয় বামফ্রন্ট নেতা। যদি তোমরা অতীতে ওদেরকে সাহায্য করে থাকো, ভবিষ্যতে আর কোরো না। যদি তোমরা আমার নির্দেশ অমান্য করো তাহলে তোমাদেরকে আমি দেখে নেবো।

আমি বললাম, "আপনার কি মনে হয় বাঙালি শরণার্থীরা কুকুর না ছাগল?" জ্যোতি বসু "আপনি এমন কেন বলছেন?"

"উনি খুব রেগে ছিলেন।" আমি বললাম, "দেখুন ওদেরকে বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নানা শিবির এবং অন্যত্র গরু ছাগলের মতো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের নিজেদের ইচ্ছেমতো আমরা ওদেরকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাঠাই। ওদেরকে পশ্চিমবঙ্গে আনার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছে এবং কারা দিয়েছে সেটা? আমরা, বামফ্রন্টের নেতারা। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওদেরকে এই পাড়ে আনার কোনো ইচ্ছে না থাকে তাহলে তাদেরকে বাঙলার সীমান্তেই ওদেরকে আটকানো হলো না কেন?"

জ্যোতি বসু: আপনাদের কাছ থেকে আমি এরকম কথা শুনতে অভ্যস্ত নেই। কিন্তু আমার একটাই কথা বলার ওদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এবং আপনি যেটা বললেন, আমি অস্বীকার করবো না সরকারেরও কিছু ভুল হয়েছে।" আমি প্রত্যুত্তরে বললাম, "কিন্তু স্যার সরকারের ভুলের জন্য কাউকে জীবন দিয়ে মূল্য চোকাতে হবে।" জ্যোতি বসুর উত্তর ছিল, "রাজনীতিতে আবেগের কোনো জায়গা নেই। এরপর থেকে শরণার্থীদের সাথে সহায়তা করবেন না।"[46]

গ্রামবাসীদের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর কথোপকথনে উচ্ছেদের মূল দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কেন্দ্রের নির্দেশের কোনো প্রমাণ ছিল না উল্টোদিকে স্পষ্টতই এটি ছিল রাজ্য সরকারের উদ্যোগ। গ্রামবাসীদের জানার কথা নয়, কিন্তু জ্যোতি বসু নিজের ভূমিকা এড়িয়ে তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য এই কথা বলেছিলেন। ক্ষমতায় আসার পর ১৮ জন শরণার্থী নেতার সঙ্গে বৈঠকে জ্যোতি বসু বলেছিলেন সরকারি সাহায্য ছাড়া তারা মরিচঝাঁপিতে থাকতে পারে, হয়তো এই ঘটনাকেই তিনি সরকারের তরফ থেকে ভুল বলেছিলেন।[47]

---

[46] তুষার ভট্টাচার্য, তথ্যচিত্র নির্মাতা ও প্রযোজক, "মরিচঝাঁপি: টর্চার্ড হিউম্যানিটি", ইউটিউব।

[47] ঝুমা সেন, "রিকন্সট্রাকটিং মরিচঝাঁপি", ইন পার্টিশন: দ্য লং শ্যাডো, উর্বশী বুটালিয়া দ্বারা প্রকাশিত, পেঙ্গুইন ভাইকিং, ২০১৫, পৃ ১১২।

“বামফ্রন্টের নেতা মন্ত্রীরা শরণার্থীদের মরিচঝাঁপিতে থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। জ্যোতি বসুও ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। শরণার্থীদের নেতা সতীশ মন্ডল কয়েকজন প্রতিনিধির সাথে ১৯৭৭ সালে মহাকরণে (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল প্রশাসনিক দপ্তর) জ্যোতি বসুর সাথে দেখা করেন। দুদিন ধরে চলা এই সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদের আশ্বস্ত করেছিলেন, যার পরে তারা দণ্ডকারণ্যে ফিরে যান।”[48]

সিপিএমের ও জ্যোতি বসুর সুন্দরবনে তাদের বসতি গড়ার জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতির একজন প্রতক্ষ্যদর্শী বরাবর বলেছেন সরকারি অনুমোদনের কথা, যেটি সুনীল মন্ডলও বলেছেন।

> “সিপিএমের শরণার্থী সংগঠন ইউসিআরসি, আলোচনার জন্য শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে ডেকে পাঠিয়েছিল। আমি নিজেও ওই দলের এক সদস্য ছিলাম। আমরা আমাদের অবস্থার কথা বলেছিলাম। আমরা পশ্চিমবঙ্গে আমাদের থাকার ইচ্ছের কথা জানিয়েছিলাম কারণ দণ্ডকারণ্যে আমাদের জন্য বসবাসযোগ্য ছিলো না। তারপর ইউসিআরসির প্রধান নেতারা প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং সুহৃদ মল্লিক শরণার্থীদের নেতা সতীশ মন্ডল, রাইহরণ বাড়ুই, রাঙ্গালাল গোলদারদেরকে নৌকা করে সুন্দরবনের চারটি দ্বীপ ঘুরিয়ে দেখান। সেগুলির মধ্যে শরণার্থী নেতারা মরিচঝাঁপিকে বিশেষভাবে পছন্দ করেন। এই খবরটি কলকাতার ‘সত্যযুগ’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। সেই বছর ১৯৭৫ সালে জ্যোতি বসু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ভিলাইতে যান। ওখানে আমাদের নেতাদের সাথে তিনি আলোচনা করেন। আমিও সেখানে ছিলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, “আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, আপনাদের সবাইকে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।” রায়পুরের দৈনিকগুলিতে ‘নয়া বুনিয়া’ এবং ‘নবভারত টাইমস’ এ খবরটি ছাপা হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে জ্যোতি বসু ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে আসি। রাম চ্যাটার্জি আমাদের সবাইকে মহাকরণে জ্যোতি বসুর কক্ষে নিয়ে যান। আমার সাথে ছিলেন সতীশ মন্ডল, রাইহরণ বাড়ুই, রাঙ্গালাল গোলদার, রবিন চক্রবর্তী, সমীর হালদার, আশা সাহা, ময়নামাসি এবং আরো তিনজন ভদ্রমহিলা। অনেক আলোচনার পর জ্যোতি বসু বলেন, “আমরা পশ্চিমবঙ্গের ভূমিহীন চাষীদেরই জমি দিতে পারছি না, আপনাদেরকে কি করে দেব?” আমরা তখন তাকে নয়া দুনিয়া এবং নবভারত টাইমস এর লেখাগুলি দেখালাম, যেখানে ভিলাইতে করা তার বক্তৃতার প্রমাণ ছিল। আমরা প্রায় কুড়ি মিনিট কথাবার্তা বলেছিলাম। “আপনারা যদি নিজে সুন্দরবনে থাকার ব্যবস্থা করে নিতে পারেন, কংগ্রেস সরকারের মতো আমাদের পুলিশ বাধা দেবে না”, তিনি এই বলে বৈঠক শেষ করেন। অন্য আরএকদিন এসেও আমরা তার সাথে দেখা করেছিলাম। তার বক্তব্য একই ছিল। কলকাতা থেকে আমরা রাম চ্যাটার্জির বাড়িতে গেলাম। তিনি অনেক কথা আলোচনা করার পর বলেন, “আপনারা চলে আসুন।”[49]

---

[48] তুষার ভট্টাচার্য, আনপাবলিশড মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ ৯।

[49] তুষার ভট্টাচার্য, আনপাবলিশড মরিচঝাঁপি, ইন্টারভিউ উইথ সুনীল হালদার, জুন ১০, ২০১০, পৃ ১০৯-১১১।

তার প্রত্যাবসানের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে জ্যোতি বসু শরণার্থীদের কাছে ধরা পড়ে গেছিলেন, এবং নিজেদের কথার খেলাপ করার পরিবর্তে তিনি এই ব্যাপারে গররাজি হয়ে সীমিত অনুমতি দেন। তার ক্ষমতা আরো দৃঢ় হলে ঔদ্ধত্যর কারণে তিনি নিজের আশ্বাসবাক্য প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বুঝতে পারেননি যদি সদ্য বসতি গড়া শরণার্থীরা প্রতিবাদ গড়ে তোলে, তার দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল কি হবে। তার নিজের নীতি বাতিল করার সময় তিনি সম্ভবত বুঝতেও পারেননি তিনি কিভাবে স্বাধীনতা উত্তর ভারতের বৃহত্তম গণহত্যার জন্য দায়ী থাকবেন।

মরিচঝাঁপিকে তারা বেছে নিয়েছিল কারণ ঐতিহাসিক ভাবে পূর্ববঙ্গে ম্যানগ্রোভের ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কারের অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তারা দেখেছিলো এখানে একপ্রকার স্থানীয় গাছ আছে যেটা থেকে বোঝা যায় এখানে চাষআবাদ করা যাবে।[50] প্রথমে কে এই দ্বীপের কথা প্রস্তাব করেছিল তা অজানা, কিন্তু পরিত্যক্ত আবাদভূমি হিসেবে সরকার এটিকেই উপযুক্ত মনে করেছিল। সরকারি অনুমতি ছিল বলে তারা জনবসতিটি গড়ে তুলতে পেরেছিলো। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছুদিন পরে কোনো এক অজানা কারণে তাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। দণ্ডকারণ্যে গিয়ে শরণার্থীদের পশ্চিমবঙ্গে আসার উৎসাহ দেওয়ার জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ও বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী রাম চ্যাটার্জিকে অনেক সময় দোষ দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি শুধুমাত্র আগের বিরোধী পক্ষ ও পরবর্তীকালের সরকারের নীতি মেনে এগোচ্ছিলেন। সিপিএম যে নীতি সম্পূর্ণ ভাবে বদলে ফেলবে সেটা তার জানার কথা নয়। মনোরঞ্জন ব্যাপারীর মতে, যার বাবা মরিচঝাঁপিতে পাঁজরে পুলিশের রাইফেল বাঁটের আঘাতের পরবর্তী সমস্যায়ে মারা যান, "দুঃখের বিষয় ছিল এই সমস্ত লোকগুলি বসুকে ভগবান ভাবত। এরা ছিল সিপিএমের অন্ধ ভক্ত। ওই রাম চ্যাটার্জির আশ্বাসে তারা দণ্ডকারণ্য থেকে ছুটে এসেছিল। যখন চ্যাটার্জি দণ্ডকারণ্যে গিয়ে ওদেরকে আসতে বলেছিলেন, তারা মনে করেছিল বসুর সমর্থন আছে এই বিষয়ে। যদি তারা জানত বসু চাননি তারা আসুক, এরা চ্যাটার্জির ডাকে কোনোদিন সাড়া দিত না।[51] সাংবাদিক সুকুমার দেবনাথ এই নীতি প্রত্যাহার করার স্বভাব দেখেছিলেন জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগত চরিত্রে। "বসু স্তালিনের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। কোনো রকম মতভেদকে তিনি একদম সহ্য করতে পারতেন না। মরিচঝাঁপিতে ধর্ষণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক, যেমনটি যুদ্ধে বিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য হয়ে থাকে। ... তারা সরাসরি বসুর নির্দেশ অমান্য করেছিল। এবং তার মূল্যও তাদেরকে চোকাতে হয়েছিল।[52]

মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অন্য নানারকম বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকায় জ্যোতি বসু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে খুব কম ভাবনা চিন্তা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু অত্যধিক দেরি হয়ে যাওয়ায়ে তারা নিজেরাই নিজেদের বসবাসের ব্যবস্থা করে

[50] তুষার ভট্টাচার্য, "মরিচঝাঁপি: টর্চার্ড হিউম্যানিটি", ইউটিউব।

[51] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, পৃ ১৬২।

[52] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, পৃ ১৬৭

নিয়েছিলেন। বসুকে তাই তাদেরকে খুন করতে বা সাহায্য করতে হতো অথবা বিষয়টিকে ছেড়ে দিতে হতো, কিন্তু তার অহংকার ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে তার পক্ষে পিছিয়ে আসা সম্ভব ছিল না।[53]

গ্রামের নেতাদের সাথে আলোচনাটিতেই সম্ভবত মরিচঝাঁপি নিয়ে শেষবারের মতো সরকারের মুখের উপর সত্যিকথা শোনানো হয়েছিল। সেই সময় মন্ত্রিসভার ৯০% সদস্য ছিল ৬% উচ্চবর্ণ অভিজাতের প্রতিনিধি এবং মন্ত্রিসভায় বা সিপিএমের রাজ্য নেতৃত্বে কোন দলিত প্রতিনিধি ছিল না, দলিতদের তরফ থেকে এই বিষয়ে আপত্তির কোন সুযোগই দেওয়া হয়নি। মন্ত্রিসভার মধ্যের বিভাজন সিপিএম এবং বামফ্রন্টের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে মতানৈক্যকেই বুঝিয়ে দিত। সেই সুযোগে জ্যোতি বসু তাদের বিরোধিতাকে হয়তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু না খেতে পেয়ে, রোগাক্রান্ত হয়ে বা পুলিশের গুলিতে তিনটি আলাদা জায়গায় ২৩৬ জন মারা যাওয়ার খবর মৃতদের নাম বয়সসহ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, হত্যাকাণ্ডের আগেও খবরের কাগজে একই রকম খবর বেড়িয়েছিল। নিতান্তই খবরের কাগজ না পড়লে বা কারুর কাছ থেকে না শুনলে, তার কারণে হওয়া মৃত্যুর সম্বন্ধে তার পক্ষে অজানা থাকার কথা নয়। ডঃ সামন্তর মতে তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যদের সাথে ১৯৭৯ সালের ১১ই মে তে একটি বৈঠক করেছিলেন সেখানে জ্যোতি বসু "রেগে গিয়ে বলেন তার প্রশাসনে অনেক গুপ্তচর আছে যারা সংবাদমাধ্যমে গোপন খবর পাচার করে দিচ্ছে। কাউকে সরাসরি না দেখালেও তিনি এইরকম ভাবে পরবর্তী কিছু মিনিট বলতেই থাকেন। আমাদের অস্বস্তি হতে থাকে। তিনি তখন জানতে চান আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি কি হবে। আমরা বলি নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী ১৪ই মে কাজ শুরু হবে। আমরা বিশদে বলে দিয়েছিলাম নামার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের গ্রেফতার করা হবে। তিনি রাজি হন। আলোচনা শেষ হওয়ার আগে তিনি আগের মতো বারবার বলেন এই খবর গোপন রাখতে।"[54] সংবাদমাধ্যমে খবর ফাঁস হওয়ার জন্য উচ্ছেদের পরিকল্পনা আগে পিছিয়ে গেছিলো, তো তার ক্ষোভ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই রকম কার্যকলাপ স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আড়াল করা যায় না এবং মরিচঝাঁপির নেতারা বুঝতে পারেন কি হতে চলেছে, সেই অনুযায়ী তারা পালানোর পরিকল্পনা করতে থাকেন। জ্যোতি বসু ও তার কাছের লোকেরা সম্ভবত বুঝতে পারেননি গরিব মানুষদের হত্যা করে, মৃত ও আহতদেরকে বাঘ ও কুমিরের মুখে ফেলে তার কমিউনিস্ট পার্টি বেশিদিন এগোতে পারবে না। সরাসরি স্বীকৃত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় একটি দলের ক্ষেত্রেও যেখানে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই সর্বেসর্বা, কিছু তথ্য সিদ্ধান্তদাতাদের কাছে যাওয়ার কথা। জনৈক ইংরেজি অধ্যাপকের লেখা তার অনুমোদিত জীবনী "জ্যোতি বসু", তে এই গণহত্যার কথা কোথাও বলা হয়নি। এই অধ্যাপক অবশ্য অন্যান্য অনেক নামকরা সিপিএম সমর্থকদের মতো বাজার মূল্যের আংশিক মূল্যে বেআইনি জমি পেয়েছিলেন।[55]

---

[53] সিপিএমের অবস্থান জানার জন্য দেখুন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় জ্যোতি বসুর বক্তৃতাগুলি, 'হোয়্যার দ্য বার্ডস নেভার সিংগ', সৌম্যশংকর বোস, রেড টার্টল, ২০২০, নিউ দিল্লি।

[54] অমিয় কে সামন্ত, "মরিচঝাঁপি", পাল (প্রকাশক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ১০৮।

[55] অনন্যা রায়, সিটি রিকুয়েম, ক্যালকাটা: জেন্ডার এন্ড দ্য পলিটিক্স অফ পভার্টি, ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা প্রেস, ২০০৩, পৃ. ১০।

তার আত্মজীবনী "উইথ দ্য পিপল", এ দাবি করা হয়েছে, "রাজ্য সরকারের সংযত ও দীর্ঘ প্রচেষ্টার" ফলে শরণার্থীরা তাদের পুরোনো শিবিরে ফিরতে পেরেছিলেন।[56] এখান থেকে হয়তো মনে হয় তিনি জানতেন না গণহত্যার বিষয়ে। কিন্তু তিনি শরণার্থীদের যে প্রচারপত্র পাঠান তাতে তিনি লিখেছিলেন, "প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনার বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের জন্য আমার গভীরতম সমবেদনা। এই সময়ে আপনাদের অনেক শরণার্থী সঙ্গী মারা গেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেরই নানা রোগ ছিল এবং কেউ কেউ খুব গুরুতর অসুস্থ ছিল। আপনারা সবাই এক দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন .... পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার সবসময় আপনাদের পাশে আছে এবং সেখানে (দণ্ডকারণ্যে) আপনাদের বাসস্থান গড়ে তোলার জন্য সমস্ত সহায়তা আপনারা পাবেন।"[57] যখন এই উপায়ে কাজ করলো না তিনি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে খাবার, জল, ওষুধ দ্বীপে পৌঁছনো বন্ধ করে দেন যার ফলে আরো অনেক মানুষ মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের মরিচঝাঁপিতে যাওয়া বন্ধ করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। বুদ্ধিমানের মতো কাজ হতো যদি তিনি চুপচাপ হাইকোর্টের আদেশ মেনে বিষয়টিকে ছেড়ে দিতেন।

সিপিএম বিধানসভার বিরোধী নেতা কাশীকান্ত মৈত্র সহ আরো ৬ বিধায়ককে, ১২ জনতা পার্টি কর্মীকে ও কলকাতা থেকে ফেরার পথে আসা সাংবাদিকদের গ্রেফতারও করে ফেলেছিল। কাশীকান্ত মৈত্র বলেছিলেন, "কত মানুষ মরিচঝাঁপিতে না খেতে পেয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমরা কিছু খাবার ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে সেখানে গেছিলাম। সাংবাদিকরাও আমাদের সাথে গেছিলেন। ফেরার সময় আমাদের ও সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা হয়। হাইকোর্টের আদেশও অমান্য করা হয়েছে।"[58]

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়ে এই নিয়ে তুমুল হট্টগোল হয়, এমনকি স্পিকারের আওয়াজও শোনা যায়নি। এবং বিরোধীপক্ষ সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। "কোলাহলের মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের ছায়া ঘোষ মাইক নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেন। প্রথমদিকে কিছুই শোনা যায়নি কিন্তু সভা শান্ত হওয়ার পর তাকে বলতে শোনা যায় মরিচঝাঁপির মহিলাদের উপর কোনো অত্যাচার হয়েছে কিনা তা জানার জন্য তদন্ত হওয়া উচিত। যদি দোষী সাব্যস্ত হয় সরকারের উচিত অভিযুক্ত পুলিশ কর্মচারীদের শাস্তি দেওয়া। রাজ্যের সমস্ত মেয়েদের হয়ে এটা আমার দাবি।" কংগ্রেসের সত্যরঞ্জন বাপুলি বলে ওঠেন, "মরিচঝাঁপির ঘটনা ক্রুরতা ও বর্বরতার দিক দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কেও হার মানায়।"[59]

---

[56] বিশ্বজিৎ রায়, "কন্ট্রোভার্সিস দ্যাট ডগড দ্য প্রব্লেমেটিক চিফ মিনিস্টার", দ্য টেলিগ্রাফ, জানুয়ারি ১৮, ২০১০।

[57] জ্যোতি বসু, "টু দ্য দন্ডকারণ্য রিফিউজিস", পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এপ্রিল ১১, ১৯৭৮।

[58] আনন্দবাজার পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৭৯, পাল(সম্পাদক), মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৭৭।

[59] নিজস্ব সংবাদদাতা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৯৭৯, ইংরেজি খসড়া, পৃ ৭৬-৭৭, পাল (সম্পাদক), ২০১১।

বামফ্রন্টের কাছে মরিচঝাঁপি অত্যন্ত সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছিল, যে কারণে তার মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাদের অবস্থান আগে বারবার বলে দেওয়ার পর, তাদের পক্ষে পিছনে ফিরে আসা মুশকিল ছিল। তুলনামূলক ভাবে উদারপন্থী হিসেবে বিধানসভার সদস্যদের বা সাংবাদিকদের গ্রেফতার করা ছিল সরকারের জন্য বাড়াবাড়ি এবং উচ্চশিক্ষিত অভিজাতদের সরকারের উপর থেকে আস্থা হারানোর মতো পরিস্থিতি এনে দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্টের মধ্যে থাকা বিভাজনের সুযোগও এনে দিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক ভাবে সচেতন মানুষ জানতেন শরণার্থীদের অসহায় অবস্থার কথা সুতরাং ঢাকাচাপা দেওয়ার সুযোগ আর ছিল না। অবরোধ করে বা না খাইয়ে মারার পরিকল্পনা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ছিল তাই তারা জোর করে গণহত্যার ঝুঁকি নিয়েই উচ্ছেদের পরিকল্পনা করে। শরণার্থীদের দিক থেকে দেখলে তারা আশা করেছিলেন জনপ্রচার ও তাদের আন্দোলনে অভিজাতদের সমর্থনের ফলে বামফ্রণ্টের মধ্যে নতুন করে বিভাজন হবে না যা সিপিএমকে অপদস্থ করবে এবং সরকারকে বাধ্য করবে পিছু হটতে। কিন্তু এই রকম সমালোচনামূলক প্রচার সিপিএমকে সমস্যা সমাধানের বদলে উচ্ছেদ ও গণহত্যার দিকে ঠেলে যায়। এখানেই জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্তর ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কারণ তারা চরিত্রগত ভাবে কোনো বিষয়ে আপস করা ও পিছিয়ে আসার বিরোধী ছিলেন। অতুল কোহলির মতো অনেকের ধারণা অনুযায়ী সিপিএম সামাজিক গণতান্ত্রিক মতে সংস্কার করলেও তাদের ভিত্তি রয়ে গেছিলো স্তালিনিজমে, যেটা এই সমস্ত নেতারা যোগদান করার সময় দলের নীতি ছিল এবং অন্য বিভিন্নভাবে এখনও মেনে নেওয়া হয়। 'নিওলিবারেল ক্যাপিটালিস্ট' পদ্ধতি মেনে নিলেও যে কোনরকম বিক্ষোভের সম্মুখীন হলে তারা স্তালিনপন্থী হয়ে ওঠে। চীনে যেখানে দলের বড় নেতারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে ধনতন্ত্রকে (ক্যাপিটালিজম) উৎসাহ দেয়, তাদের সাথে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে। যেমন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নিজের ইচ্ছেমতো স্বৈরাচারী ভাবে ভিন্নমতালম্বীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়।

যেভাবে জ্যোতি বসু নিজেকে মরিচঝাঁপির সাথে জড়িয়ে ফেলেছিলেন তা বেশ আশ্চর্যজনক ছিল। তিনি একজন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ আইনজীবী, "সিটিজেনস ফর ডেমোক্রেসি" এর সম্পাদক জাস্টিস ভি তারাকুন্ডে ও পরবর্তীকালের বিজেপি মন্ত্রী ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাথে যুক্ত অরুণ শৌরীর সাথে দেখা করতে ৯ই মে দিল্লিতে যান এবং তাদেরকে মরিচঝাঁপিতে না আসার জন্য অনুরোধ করেন।[60] জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া জনপ্রিয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন "সিটিজেনস ফর ডেমোক্রেসি"এর সভাপতি এবং এই আন্দোলনে সবাই জড়িত ছিলেন। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তরফ থেকে সাংবাদিক নিরঞ্জন হালদার মরিচঝাঁপি যাওয়ার জন্য জাস্টিস তারাকুন্ডেকে রাজি করিয়েছিলেন। একজন মুখ্যমন্ত্রী যে এত কষ্ট করতে রাজি হয়েছিলেন, তা বুঝিয়ে দেয় বিষয়টি কত স্পর্শকাতর ছিল এবং তিনি কি যুক্তি দিয়েছিলেন তা জানা যায়নি, তারাকুন্ডের উদ্দেশে পাওয়া একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন শরণার্থীরা কোনোরকম আইন শৃঙ্খলা মেনে চলছে না এবং জঙ্গল কেটে ফেলছে। "আপনাকে এখানে আসার কষ্ট করতে হবে না, আমরা শরণার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণই করছি।"[61] রাজনৈতিকভাবে সূক্ষবুদ্ধির

[60] তুষার ভট্টাচার্য, "অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি", "আনপাব্লিশড মরিচঝাঁপি", খসড়া ইংরেজি অনুবাদ, পৃ ২০।

[61] তুষার ভট্টাচার্য, "অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি", "আনপাব্লিশড মরিচঝাঁপি", খসড়া ইংরেজি অনুবাদ, পৃ ২০।

পরিচয় দিয়ে তার উচিৎ ছিল শরণার্থীদের সাহায্য করা কিন্তু তা না করে তিনি যে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন বুঝিয়ে দেয় তার দাম্ভিকতার সমস্যা ছিল, যেটি তাকে পিছনে ফিরে আসতে দেয়নি। জরুরি অবস্থা উত্তর রাজ্য নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে এসে, তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। তিনি ও তার সহযোগীরা কল্পনাও করতে পারবেন না যে শাসকগোষ্ঠী থেকে কিভাবে একটি দল ২০২১ এর নির্বাচনে সম্পূর্ণ বিধায়কশূন্য হয়ে যাবে।

যদি জ্যোতি বসুর সংবাদ মাধ্যমে পরিচয় অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে শহুরে অভিজাতদের সাথে স্বচ্ছন্দ বিলেত ফেরত একজন মার্জিতরুচির ব্যারিস্টারের ছবি ভেসে ওঠে যিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও বিধানসভায় নিজের দক্ষতার পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন। তিনি হয়তো প্রধানমন্ত্রীও হতেন কিন্তু তার নিজের সিপিএমের কেন্দ্রীয়সভা সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয় যেটিকে উনি "ঐতিহাসিক ভুল" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু এই পরিমার্জিত ভদ্র পরিচিতির বাইরে যারা তাকে জানতেন বুঝেছিলেন তার একটি নির্মম রূপ ছিল যেটি পত্রপত্রিকায় উঠে আসেনি। তিনি প্রথম যখন পুলিশমন্ত্রী হিসেবে যুক্তফ্রন্ট সরকারে ক্ষমতায় আসেন, একজন পুলিশ অফিসার রণজিৎ কুমার গুপ্ত পদোন্নতির লোভে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে থাকা পুলিশ গুপ্তচরদের নাম তাকে পাঠায়, তাদের মধ্যে প্রায় ১০০ জন মানুষকে খুন করা হয়।

হত্যার তদন্ত করা হয়েছিল, এবং অভিযুক্তদেরকে খুঁজেও পাওয়া গেছিলো কিন্তু কারুর বিরুদ্ধে কোনো রকম কার্যকলাপ নেওয়া হয়নি এবং অফিসারটি পরে কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল হয়ে যান।[62] দলের মধ্যে সমালোচনা সত্ত্বেও চীনের উচ্চপদস্থ কমিউনিস্ট নেতাদের ছেলে মেয়েদের মতো জ্যোতি বসুর ছেলে সরকারি সুযোগ সুবিধের অপব্যবহার করে বড়লোক হয়ে ওঠেন। কারুর কাছে জবাবদিহি না করার স্বাধীনতা মুখ্যমন্ত্রীকে একপ্রকার অপ্রতিরোধ্য করে তোলে যেটা তাকে আশ্বাস দিয়েছিল এই গণহত্যার কোনো ফলই তাকে ভুগতে হবে না এবং তার অবসর গ্রহণ অবধি এটি সত্যিই প্রমাণ হয়েছিল। তার এতটাই খ্যাতি ছিল যে তার মৃত্যুশয্যার সময় প্রধানমন্ত্রী সিং তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং তার শোকবার্তায় মরিচঝাঁপির কোন কথাই কেউ উল্লেখ কেউ করেনি।

ডঃ সামন্ত কে দেওয়া জ্যোতি বসুর ব্যক্তিগত নির্দেশ অনুযায়ী ২৪ পরগণার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট শরণার্থীদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করেন। ইন্টারনেটে পরে ডঃ সামন্তকে নিয়ে বলা হবে, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল একে সামন্ত একটি মহৎ কাজ করবেন যদি তিনি রাতের শেষে কনস্টেবল ভর্তি ৩০ টি মোটর বোট নিয়ে গিয়ে সুন্দরবনের মরিচঝাঁপির বাসিন্দাদের উপর পৈশাচিক আক্রমণের কথা বিস্তারিত বলেন। সিপিএম সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের বিরুদ্ধে এই হামলার পরিকল্পনা করেছিল তাদের আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সদর দপ্তরে। সামন্তর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা

[62] ইন্টারভিউস, সুকুমার মল্লিক, আইসিএস, চিফ সেক্রেটারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, প্রফুল্ল রায় চৌধুরী, ওয়েস্ট বেঙ্গল- এ ডিকেড ১৯৬৫-১৯৭৫, ক্যালকাটা, ১৯৭৭, পৃ. ২২৫।

হওয়ার কথা কিন্তু শাসক দলের সাথে ভালো সম্পর্কের কারণে তিনি পার পেয়ে যান। কিন্তু তাকে এর জন্য জবাবদিহি করতেই হবে। এতো অসংখ্য মানুষের মৃত্যু মিথ্যে হতে পারে না।"[63]

এটা একপ্রকার কাল্পনিক ভাবনা কারণ যারা বেঁচে আছেন সবাই অবসর নিয়েছেন এবং বিচার তো দূরের কথা কোনোরকম তদন্তও এই বিষয়ে হয়নি। দুঃখের বিষয় পুলিশ অফিসারটিকে ব্রিটিশ আমলে চাকরি করতে হয়নি। অমৃতসর গণহত্যার পরেও ইংরেজরা হান্টার কমিশন তৈরি করে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে সৈন্যবাহিনী থেকে বার করে দিয়েছিল। ডঃ সামন্ত কেবল পদোন্নতি পেয়েছিলেন। তিনি মাত্র দুজনের মৃত্যু দেখিয়েছিলেন, আরো ভালো হতো যদি তিনি লিখতেন অন্ধকার থাকার কারণে তিনি দূরে কিছু দেখতে পাননি বা অতবড় এলাকার সব জায়গায়ে যেতে পারেননি[64] এবং যেহেতু সিপিএমের কর্মীরাও তাকে উচ্ছদে সাহায্য করেছিল, তার নিজের বাহিনীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার ছিল না।[65]

---

[63] ঝিমলি মুখার্জি পান্ডে, "এক্স কপ ট্রেসেস লস্ট রাসবিহরী বোস রেকর্ডস", টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৭ ই অগস্ট, ২০১৫।

[64] আগের একটি প্রকাশনায় আমি লিখেছিলাম কিভাবে মুসলিম মস্তানদের ভাড়া করা হয়েছিল গণহত্যা আর উচ্ছেদে সাহায্য করার জন্য কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তাপের কারণে এইবার সেটি উল্লেখ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। ২০২১ সালের নির্বাচনী প্রচারে একটি হিন্দু মৌলবাদী প্রকাশনা মুসলিম মস্তানদের নিয়ে আমার লেখা উদ্ধৃতি করে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি তৈরী করতে চেয়েছিল যাতে আমার লেখাটি খুবই সমস্যাজনক হিসেবে উঠে আসে। (অভীক সরকার, "রিভিজিটিং দ্য স্টেট্ স ্পন্সরড জেনোসাইড অফ ১৭০০০ বেঙ্গলি হিন্দু রিফিউজিস ইন মরিচঝাঁপি", স্বতন্ত্র, জানুয়ারি ২৬, ২০২১)। দুদশকের পুরনো একটি লেখার অনেক পরিণাম হতে পারে যেটি হয়তো লেখার সময় ভাবা যায়নি। দীপ হালদার এই বিষয়ে একটি বক্তব্যে বলেন, "কোনো কোনো সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে পুলিশ তাদেরকে বলে আমরা পারবো না। এইভাবে হয় না। আপনারা আমাদেরকে যেটি বলছেন সেটি করতে পারবো না। তখন তারা মুসলিম গুণ্ডাবাহিনীকে দিয়ে ধর্ষণ করতে বা শিশুদের মারতে পাঠিয়ে দেয়। দীপ হালদার, "দ্য ন্যারেটিভ অফ ইলিউশনস এন্ড কনফ্লিক্ট", জানুয়ারি ১০, ২০২০, ইউটিউব। "এটি একটি প্রামাণ্য ইতিহাস এবং আমি এখনো বলিনি দ্বীপটি শরণার্থী রা ছেড়ে যাচ্ছে না বলে তারা কি পরিমাণ অধৈর্য হয়ে পরে। তাদের মাথায় এসেছিলো 'মুসলিম গুণ্ডাবাহিনীকে' এদের উপর চড়াও করে দিলে পুলিশের থেকেও বেশি অত্যাচার এরা করবে কারণ এরা এদেরকে ঘৃণা করতো। তাই শুধুমাত্র পুলিশ না মুসলিম বাহিনীও গণহত্যায় সাহায্য করেছিল। আমি বেঁচে যাওয়া একজন শরণার্থীর কাছে এই ব্যাপারে শুনেছিলাম, আমি এটি বইতে রাখতে চাইনি। কিন্তু লিখিত কোনো নির্দেশ ছিল না, এটি ছিল সম্পূর্ণ অনুমোদনহীন আদেশ। কেউ বলেছিলো পুলিশদের ঢুকিও না মুসলিম গুন্ডাদের ছেড়ে দিন, ওরা যা ইচ্ছে করুক, কারণ পুলিশ একসময় থেমে যাবে, কিন্তু এরা নৃশংসতা বন্ধ করবে না। তাই দাগী আসামিদের এই দ্বীপে যেতে হয় যন্ত্রণা দিয়ে এই শরণার্থীদের বের করে দিতে।" হালদার বলেছিলেন কোনো কোনো মস্তানকে বাংলাদেশ থেকে আনা হয়েছিল তাই তারা আগেও একবার দলিতদের বের করে দিয়েছিল এবারে মরিচঝাঁপিতে আবার তারা সে সুযোগ পায়। দীপ হালদার সঙ্গম টকস, ব্লাড আইল্যান্ড, ইউটিউব। মরিচঝাঁপিতে সিপিএম ও অন্যান্য দুষ্কৃতী দলগুলির মধ্যে যোগসাজশ নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত।

[65] আমি আইএএস এসপি মল্লিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কারা আসলে হত্যাটি করেছিল কিন্তু তদন্ত না হওয়ায় সেই তথ্য একত্রিত করা যায়নি। আইএএস একে বিশ্বাস প্রেসিডেন্সি ডিভিশনাল কমিশনার একে মজুমদারকে বেসামরিক প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন কিন্তু তিনি বলেন, "সমস্ত কিছুই পুলিশ আর দলের ক্যাডাররা করেছিল। জেলার প্রশাসন কোনোভাবে যুক্ত ছিল না।" একে বিশ্বাস, "মেমোয়ার্স অফ চণ্ডাল জীবন: অ্যান আন্ডারডগস স্টোরি।" মেনস্ট্রিম, এপ্রিল ১৪, ২০১৩। একজন ডাক্তার আমায় বলেছিলেন ২৪ পরগণার জেলাশাসক ওই কাণ্ডের জন্য হাসপাতাল থেকে স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আমি একজন সরকারি আমলার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম যিনি এই কাজে অংশ নেওয়ার বদলে ছুটি নিয়ে নিয়েছিলেন। কাজেই আগের কথাটি সঠিক নয়।

নিঃসন্দেহে ডঃ সামন্তর জন্য এটি খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল। অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা ও হোমগার্ডরা সকলে মিলে ছুটি নিয়ে নিয়েছিল এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবে না বলে,[66] এই বিষয়ে তার নিজের মতামত যাই থাকুক কিন্তু একজন আইপিএস অফিসার হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সরাসরি নির্দেশ তার পক্ষে অমান্য করা সম্ভব ছিল না।

কিন্তু তিনি নিজে এই পরিস্থিতিতে ফেঁসে গেছিলেন না এটিকে পদোন্নতির রাস্তা হিসেবে দেখেছিলেন সেটি উনিই ভালো বলতে পারবেন। তার নিজের মানসিক দ্বিধা বা অনুশোচনার কথা তার একটি বক্তৃতা থেকে বোঝা যায়। "আমলা ব্যবস্থায় ভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক স্বার্থ জুড়ে থাকে।.... আপনাকে দৃঢ় ভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। আমরা যখন কাজে যোগ দিয়েছিলাম এটি ছিল কম দুর্নীতিগ্রস্ত বা অসৎ। লক্ষ্য হওয়া উচিত সসম্মানে কোনোরকম পাপবোধ ছাড়া অবসর নেওয়া।"[67] অভিযুক্ত প্রায় সব রাজনীতিকের মৃত্যুর পর শুধুমাত্র বেঁচে আছেন বলে ডঃ সামন্ত কে দোষ দেওয়া একপ্রকার অনুচিৎ। যতক্ষণ না আমরা নিজেরা ওই পরিস্থিতিতে পড়ছি আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় আমরা কি করতাম (ডিনায়াল, ফিল্ম)।

যখন সিপিএম শরণার্থীদের উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় ডঃ সামন্ত ২৪ পরগণার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ছিলেন। একজন বিদ্বজন ও প্রকাশিত লেখক হয়ে মনে হয়না তিনি কোনোদিনও এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু একজন আইপিএস পুলিশ অফিসার হিসেবে তার কাছে আর উপরমহলের নির্দেশ মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু নতুন গবেষণা থেকে জানা যায় তার এই অবস্থান একেবারে আকস্মিক ছিল না। তার নিজের জবানিতে, "আমি ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে যোগদান করি ১৯৭৮ এর ১৮ই আগস্ট এবং বিকেলবেলা যখন আমি আইজিপি (ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ), স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মুখ্যসচিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, আমাকে মরিচঝাঁপি দ্বীপের পলাতকদের সম্বন্ধে জানানো হয়। খবর অনুযায়ী দ্বীপটিতে প্রায় ৩২০০০ জন বাস করছিল।[68] কিভাবে তিনি এই কাজটি পেলেন সেটি তিনি লেখেননি। "শুধুমাত্র অত্যাচারী একজন পুলিশ অফিসার হওয়ার জন্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের (জ্যোতি বসুর পূর্ববর্তী কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী, দুজনে বন্ধু ছিলেন), সঙ্গে তার সুসম্পর্ক তৈরী হয়। একজন বিখ্যাত সাংবাদিক আমাকে বলেছিলেন, যখন জ্যোতি বসু চিন্তিত ছিলেন মরিচঝাঁপি নিয়ে, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ই তাকে বলেন শরণার্থীদের শেষ করার জন্য অমিয় সামন্তকে আনতে।"[69] ১৪-১৯ বছরের মধ্যের "বহু (মাওবাদী) যুবককে কুড়িদিনের মধ্যে" নিকেশ করার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। শান্তিনিকেতনের (বিশ্ববিদ্যালয়) উপাচার্য বহুবার ইন্দিরা গান্ধীকে এই বিষয়ে জানিয়েও আটকাতে পারেননি। তার অত্যাচারের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জানা যায় তিনি নিজে পুলিশি লাঠি দিয়ে পেটাতেন যেটি তার অধস্তন কর্মচারীদের করার কথা।[70] "রস

---

[66] কিরণ তালুকদার, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক: লাইফ এন্ড মিশন,ক্যালকাটা, ২০১০, পৃ ১৯।

[67] সুদেষ্ণা ব্যানার্জি, "ওয়ার্ড অফ এডভাইস ফর সিভিল সার্ভিস র‍্যাঙ্কারস" দ্য টেলিগ্রাফ, জুন ১৭, ২০১৬।

[68] অমিয় কে সামন্ত, "মরিচঝাঁপি", পাল (প্রকাশক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ৯৯।

[69] তুষার ভট্টাচার্য্য, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ২৭।

[70] তুষার ভট্টাচার্য্য, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ২৫।

মল্লিকের পিতৃপরিচয় কে উল্লেখ করে অমিয় সামন্ত অত্যন্ত নিম্নরুচিকর ভাবে তার কাজকে আক্রমণ করেছিলেন", যদিও তার নিজের অপরাধের কাছে এটি কিছুই নয়।[71]

প্রথমদিকে সরকার একটি অবরোধ করে শরণার্থীদের না খাইয়ে মারতে চেয়েছিলো বসতিটি দ্বীপের উপর হওয়ার কারণে সেটি খুব সহজ ছিল। ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও রামকৃষ্ণ মিশন যারা ওই এলাকাতে ত্রাণ পাঠাচ্ছিল তাদেরকেও ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। "মাদার টেরেসাও শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠাচ্ছিলেন। এই ঘটনার প্রভাব তার উপরেও পড়ে। একটি বার্তায় তিনি জানান শরণার্থীদের আর সাহায্য করতে না পাড়ার জন্য উনি দুঃখিত। এবং এর কারণটি তিনি বলতে পারবেন না।"[72] শরণার্থীদের আইনজীবীরা কলকাতা হাইকোর্টে বিষয়টি নিয়ে যান, যেখান বলা হয় অবরোধ তুলে দিতে, কিন্তু সরকার তাদের পেটোয়া একজন বিচারক জাস্টিস বি সি বসাককে ধরে আগের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে এবং অবরোধ চালিয়ে যায় যার ফলে অসংখ্য মানুষ সেখানে রোগে ভুগে না খেতে পেয়ে মারা যান।[73]

"এক রাত্রে কেউ এসে নলকূপের জলে বিষ মিশিয়ে চলে যায়। তেরজন লোকের মৃত্যু হয় পরের দিন। ইঁদুরের মতো বাচ্ছারা বিভিন্ন রোগ থেকে মারা যেত এবং মহিলারা পুলিশের কাছে ধর্ষণের ভয়ে বাইরে বেরোতে পর্যন্ত আশঙ্কিত থাকতেন। বহুবার হয়েছে পুলিশের লঞ্চ ধাক্কা দিয়ে আমাদের নৌকা মাঝ নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছে।"[74]

শরণার্থীরা আশা করেছিলেন মহিলারা মূল ভূখণ্ড থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এলে পুলিশ অন্তত কিছু বলবে না এবং কোন কোন মহিলা রাজিও হয়েছিলেন, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে মোটরের পুলিশ লঞ্চ দিয়ে তাদের নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কোনো কোনো মহিলাদের পুলিশ তুলে নিতো এবং তাদের ছেড়ে দেওয়ার আগে জেলে রেখে দিনের পর দিন গণধর্ষণ

---

[71] তুষার ভট্টাচার্য্য, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৩০।

[72] তুষার ভট্টাচার্য, "দ্য রিফিউজি সেটেলমেন্ট দ্যাট ভ্যানিশড ইনটু নোহোয়্যার", মধুময় পাল, সম্পাদক, মরিচঝাঁপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস, ২০০৯ এছাড়াও "মরিচঝাঁপি: টর্চার্ড হিউম্যানিটি", ইউটিউব, এবং অনন্যা দত্ত, "বসু এবং মাদার টেরেসা: এ স্পেশাল এসোসিয়েশন", দ্য হিন্দু, জানুয়ারি ১৭, ২০১০।

[73] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, হার্পার কলিন্স, ২০১৯, পৃ. ১১৩। শরণার্থীদের আইনজীবী শাক্য সেন মরিচঝাঁপি মামলায় সরকারের হয়ে লড়া পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভোকেট জেনারেল স্নেহাংশু আচার্য্যর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রায় চার দশক বাদে আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছি মিঃ আচার্য্য কেন আমাকে সাক্ষাৎকার দিতে চাননি। আচার্য্য ছিলেন ময়মনসিংহের মহারাজার ছেলে এবং কমিউনিস্ট পার্টির পৃষ্ঠপোষক। আমার কাকা আইসিএস সুকুমার মল্লিক প্রথমে তাকে ফোন করেন আমাকে সাক্ষাৎকারটি পাইয়ে দেওয়ার জন্য এবং পরে আমি অনেকবার ফোন করেছিলাম সময় নেওয়ার জন্য প্রত্যেকবার উনি সরাসরি না করে দিয়েছিলেন। আমার কাকা তার এরম প্রত্যাখ্যানে অবাক হয়ে গেছিলেন। আমার কাকা যখন কেমব্রিজে আইনের ছাত্র ছিলেন, তিনি তার লন্ডনে ডাক্তারি করা বড়দাকে দিয়ে আচার্য্যর প্রেমিকার গর্ভপাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই আনুকূল্য তিনি কিন্তু ফিরিয়ে দেননি। আমাদের পরিবারের ইতিহাস দেখে তিনি হয়তো বুঝেছিলেন তার কি ভূমিকা ছিল মরিচঝাঁপি অবরোধের ফলে রোগভোগ ও অনাহার থেকে হওয়া বিপুল সংখ্যক শিশুর মৃত্যুতে এবং সেই প্রসঙ্গ সাক্ষাৎকরে আসতই। পরে জ্যোতি বসু তার নামে হওয়া একটি আইন কলেজের উদ্বোধনও করেছিলেন।

[74] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, হার্পার কলিন্স, ২০১৯, পৃ. ৬৫।

করতো, বাকিরা ডুবে যেত এবং কেউ সাঁতরে নিকটবর্তী দ্বীপগুলিতে গেলে পুলিশ ও পার্টির ক্যাডাররা তাদের ধর্ষণ করতো।[75]

সাংবাদিকদের যেহেতু মরিচঝাঁপিতে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল কলকাতার খ্যাতনামা ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য স্টেটসম্যানের চিত্রসাংবাদিক লুকিয়ে ওই দ্বীপে যান, এবং তার ছবিগুলি দেখা যাবে https://marichjhapi.com এ। "তখন এবং এখনো আমি বুঝতে পারিনি কেন সরকার মরিচঝাঁপি থেকে ওদেরকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। সূর্যাস্তের পরে হৃদয়বিদারক কান্না শোনা যেত কাছাকছি ঘরগুলি থেকে। এবং কিছুক্ষণ বাদেই বোঝা যেত গোটা এলাকার সবাই কাঁদছে। দিশাহীন কাকুতির আওয়াজ আসতো এই বিষণ্ন বসতি থেকে। জিজ্ঞেস করলে জানা যেত বহু শিশু দূষিত জল ও খাবার খেয়ে মারা যাচ্ছে। যেহেতু দ্বীপের মধ্যে কোনোরকম চিকিৎসা পরিষেবা ছিল না, শিশুরাই ছিল সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর শিকার। প্রত্যেকটা পরিবারই একটি বা দুটি শিশু হারিয়েছিল। আজ বহু বছর অতিক্রান্ত কিন্তু ওই বিলাপের প্রতিধ্বনি আজ আমাকে যন্ত্রনা দেয়।"[76]

সরকার শেষমেশ ১৯৭৯ এর ১৪এ মে মাঝরাতে পুলিশের মোটর লঞ্চে করে এসে উচ্ছেদের কাজ শুরু করে। "প্রথমে মরিচঝাঁপির বাজারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে স্কুল, গ্রামীণ হাসপাতাল, রুটিঘর এবং নৌকা বানানোর জায়গা জ্বালানো হয় ... এক ঘন্টার মধ্যে একশো বা প্রায় হাজারেরও বেশি শরণার্থীকে আগুনে পোড়ানো ও গুলি করা হয়, এবং যারা বেঁচে ছিল পুলিশের লঞ্চে করে তাদের দেহ ব্যাঘ্র প্রকল্পে ফেলে দেওয়া হয়, সংরক্ষিত জঙ্গলের বাঘেদের খাওয়ানোর জন্য। বাকি সমস্ত লাশ পৌরাণিক ঋষি কপিলদেবের তীর্থস্থানের কাছে বঙ্গোপসাগরের জলে পাচার করা হয়েছিল। এটি কোন গল্পকথা না। এই সমস্ত ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন কুমিরমারি গ্রামের বাসিন্দারা যেটি গণহত্যার জায়গার কাছেই ছিল। দুদিন ধরে বাধাহীন ভাবে এই কাজ চলতে থাকে। এই ঝঞ্ঝার আওয়াজ, চিৎকার, আকুতি এবং কান্নার শব্দ .... কুমিরমারির যে সমস্ত মানুষেরা এই ঘটনা সামনে থেকে দেখেছিলেন তারা আজও মানসিক শঙ্কায় থাকেন।"[77]

---

[75] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড, হার্পার কলিন্স, ২০১৯, পৃ. ১৩৫-১৩৬। দীপ হালদারের বর্ণনা করেছিলেন অবরোধের সময়ে "মধ্য রাত্রে মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হতো পুলিশ স্টেশনে, তাদেরকে গণধর্ষণ করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হতো বাঘে খাওয়ার জন্য বা সম্ভ্রম হারিয়ে গ্রামে ফিরে আসতে হতো। এটি ছিল একপ্রকার চাপ সৃষ্টি করার পদ্ধতি। কিন্তু দ্বীপবাসীর সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলেন তারা ছেড়ে যাবেন না।" দীপ হালদার, দ্য ন্যারেটিভস অফ ইলিউশনস এন্ড কনফ্লিক্ট, জানুয়ারি ১০, ২০২০, ইউটিউব।

[76] সুব্রত পত্রনবীশ, "দ্য লাস্ট ভিউ", ইন্টারভিউ বাই মধুময় পাল, মে ২৩, ২০১৬ মধুময় পাল, সম্পাদক, মরিচঝাঁপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন পাল, ইংরেজি খসড়া অনুবাদ, পৃ. ৫।

[77] তুষার ভট্টাচার্য, "দ্য রিফিউজি সেটেলমেন্ট দ্যাট ভ্যানিশড ইনটু নোহোয়্যার", মধুময় পাল, সম্পাদক, মরিচঝাঁপি: ছিন্ন দেশ, ছিন্ন পাল, ইংরেজি খসড়া অনুবাদ, পৃ. ৩৭।

লঞ্চচালকের মতে অনেক আহতরা আর্ত চিৎকার করছিলেন, "আমরা এখনো বেঁচে আছি, আমাদেরকে বাঘের হাত থেকে বাঁচান।"[78]

প্রতক্ষ্যদর্শী হিসাবে তাকে খুন করা হবে এই ভয়ে তিনি পালিয়ে আসেন। "হাসনাবাদের জেলেরা মাছ ধরার জাল ফেলেনি কারণ তারা জানতে মাছের সাথে মৃতদেহ উঠে আসবে। আমাদের মধ্যে কতজন যে মারা গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমি জানি না কোনদিন সেই সংখ্যা গোনার চেষ্টা হয়েছে কিনা। সংবাদমাধ্যমকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমাদের কথা কোথাও পাবেন না।"[79]

পুলিশ ভেবেছিল মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সমাজের নেতাদের গ্রেফতার করবে।[80] কিন্তু নৌকাচালকদের সংগঠনের সাথে যোগসাজশ করে বলা হয় তাদের সমিতির সব টাকা পয়সা তছরুপ করে তারা আগেই পালিয়ে যান।[81] তাদের মধ্যে কয়েকজন খাদ্য সংরক্ষণ ও পরিবহণের ব্যবসায় ঢুকেছিলেন। একজন বলেছিলেন ১৭০০ লোক প্রায় মারা যায় ওই ঘটনায় এবং দাবি করেন স্কুলে পড়া বাচ্ছাদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছিল।[82] স্থানীয়রা মনে করেন শরণার্থীদের তিন-চতুর্থাংশ মারা যায়[83], আসল সংখ্যাটি অজানাই রয়ে গেছে। তাদের মতে বাঘেরা এই মৃতদেহগুলি খেয়েছিল এবং সেই থেকেই মানুষখেকো হয়ে উঠে তাদের উপর শিকার করতে শুরু করে। বাকিদেরকে কুমিরে খেয়ে নিয়েছিল যার ফলে দাহ করাও যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর তৈরী করা পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ ট্রেনে করে শরণার্থীদের ফেরৎ পাঠানো হয়ে।[84] "যখন শরণার্থীদের জোর করে বিশেষ ট্রেনে দণ্ডকারণ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়, তাদেরকে কামরার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল। ট্রেনের মধ্যে খাবার, পানীয় জল বা ওষুধপত্র কিছুর ব্যবস্থা ছিল না, জন্তুর থেকেও জঘন্য ভাবে তাদের সাথে ব্যবহার করা হয়েছিল। গরমে ছটফট করে বহু শিশু মারা যায়।"[85] "বহু মানুষ তাদের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে গেছিলেন, অনেকের শরীর এত খারাপ ছিল ও অসুস্থ ছিলেন যে তারা চলতেই পারছিলেন না, যে সমস্ত বাচ্চারা মারা গেছিলেন এই ভয়াবহ রাস্তায় তাদেরকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।[86]

---

[78] তুষার ভট্টাচার্য, ইংরেজি খসড়া পৃ. ৩৩।

[79] সৌম্যশঙ্কর বোস, "হোয়্যার দ্য বার্ডস নেভার সিঙ্গ", ফিল্ম, ভিমেও, https://vimeo.com/517033560

[80] অমিয় কে সামন্ত, "মরিচঝাঁপি", পাল (প্রকাশক) ইংরেজি খসড়া পৃ ১০৮।

[81] অচিন্ত্যরূপ রায়, মিস্ট্রি অফ মরিচঝাঁপি, ব্লগ, মে ২৪, ২০১০।

[82] জয়দ্বীপ মজুমদার, "দ্য ফরগটেন স্টোরি অফ দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার বাই মার্ক্সিস্টস", স্বরাজ্য, জানুয়ারি ৩০, ২০১৭।

[83] অণু জ্বালে, "ডুয়েলিং অন মরিচঝাঁপি", ইকোনোমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি, এপ্রিল ২৩, ২০০৫, পৃ ১৭৬১।

[84] অমিয় কে সামন্ত, "মরিচঝাঁপি", পাল (প্রকাশক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া পৃ. ৯৮।

[85] ইতিবৃত্তে চণ্ডাল জীবন, খন্ড ১, মনোরঞ্জন ব্যাপারী, প্রিয় শিপলা প্রকাশন, পৃ. ২৭২ উল্লেখিত হয়েছে একে বিশ্বাস, "মেমোয়ার্স অফ চণ্ডাল জীবন", মেইনস্ট্রিম, এপ্রিল ১৩, ২০১৩।

[86] মনোরঞ্জন ব্যাপারী, ইন্টারগেটিং মাই চণ্ডাল লাইফ: অ্যান অটোবায়োগ্রাফি অফ এ দলিত, সেজ ২০১৪, নিউ দিল্লি, পৃ. ২৪১।

সিপিএম তাদের ক্যাডারদের অভিনন্দন জানিয়েছিল এই উচ্ছেদকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং তথ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যিনি জ্যোতি বসুর পরে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, বিধানসভায় ঘোষণা করেন মরিচঝাঁপি আজ শরণার্থী মুক্ত।[87]

১৫০ খানা ট্রাক এসে পুলিশ লঞ্চ থেকে ফেলে দেওয়া শরণার্থীদের তুলে নেয়, কিন্তু আহত কাউকেই শুশ্রুষা করা হয়নি এবং তাদের শারীরিক অবস্থা না দেখেই ট্রাকের মধ্যে তাদেরকে তুলে দেওয়া হয়। "উৎখাত করা মানুষগুলির কারুর জন্য প্রশাসন থেকে খাবার বা জলের বন্দোবস্ত করা হয়নি। সদ্যজাত বাচ্চা বা তার মা কেউই ওষুধ কিছু পায়নি। ট্রাক থেকে পড়ে পাঁজর ভেঙে যাওয়া ছেলেটিরও কর্তৃপক্ষ কোনো দায়িত্ব নেয়নি। ওদের একটাই কাজ ছিল যে করেই হোক শরণার্থীদের ট্রাকে তোলা এবং দূরে সরিয়ে দেওয়া।"[88] বসিরহাটের সাবডিভিশনাল অফিসার বলেছিলেন, "সৈন্যবাহিনীর যে কাজ করার কথা সেটি আমরা করেছি। যে গতিবেগে আমরা হাসনাবাদ থেকে শরণার্থীদের হটিয়ে দিয়েছিলাম তা ছিল অভূতপূর্ব।"[89]

১৯৭৯ সালের জুনে দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন পরিষদের মুখ্য অধিকর্তা পারি আইএএস মহাপাত্র জ্যোতি বসুর সাথে দেখা করেন, যিনি বলেছিলেন, "আমরা অনেক কষ্ট করে এই মানুষদের রাজি করিয়ে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছি।" খুবই বিরক্তি প্রকাশ করে পারি মহাপাত্র উত্তর দেন, "স্যার, আপনি আমায় বলছেন এদের আপনি 'রাজি করিয়েছেন।' কিন্তু স্যার, প্রায় আপনার পাঠানো শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় পাঁচহাজার মানুষ নানারকম আঘাত নিয়ে রায়পুর, কোভাগাঁও ও কোরাপুরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছে!" পারি মহাপাত্র এই বিষয়টি তার বাঙালি আইএএস বন্ধুদের জানিয়েছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, "তোমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমার চোখের দিকে সাপের ফণা তোলার মতো করে দেখলেন এবং বললেন, "আপনি কতদিন ধরে এই কাজ করছেন।"[90]

প্রয়াত সাংবাদিক সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত তদন্ত করেছিলেন, "কারা একের পর এক বসতিগুলি উপর আগুন জ্বালিয়েছিলো? শরণার্থীরা কোনো পুলিশকে এই কাজ করতে দেখেননি। যদিও সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে হামলাকারীদের শনাক্ত করা সম্ভব

---

[87] কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া-মার্কসবাদী (সিপিএম), ১৯৮২, রাজনৈতিক সাংগঠনিক রিপোর্ট, ("পলিটিক্যাল-অর্গানাইজেশনাল রিপোর্ট") ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট্ কমিটি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তথ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম এবং খুব অবাক হয়ে গেছিলাম যখন উনি বলেছিলেন উনি যে সাক্ষাৎকার ভেবেছিলেন তাতে আগে থেকে লিখে প্রশ্ন পাঠানোর কথা। আমি অবাক হয়ে গেছিলাম এই ভেবে যে উনি সাংবাদিকদের সাথেও একই রকম দাবি করেন কিনা এবং আমার মতো একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলা নিয়ে ওনার কিসের এত হীনমন্যতা যে উনি সরাসরি কথা বলতে সাহসী হচ্ছেন না। তিনি কি ভয়ে ছিলেন যে দলের অনুমোদিত বক্তব্যের বাইরে উনি কিছু বলে ফেলবেন? আমি সাক্ষাৎকারটি করতে রাজি হইনি। উনি পরে মুখ্যমন্ত্রী হবেন জানলে হয়তো রাজি হয়ে যেতাম। এমনকি দলেরও সমাজতান্ত্রিক পথে এগোনোর বিষয়ে খুবই দুর্বল ধারণা ছিল আর যে আইএএস অফিসাররা জানতেন কি করতে হবে তারা সিপিএমের সুবিধেবাদী স্বার্থের কারণে কাজ করতে পারেননি।

[88] "থ্রি সন্স এন্ড হাজব্যান্ড আনট্রেস্ড, হাউ টু গো? বাট দে ফোর্সড মি!", আনন্দবাজার পত্রিকা, মে ১৮, ১৯৭৯। পাল(সম্পাদক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৮২।

[89] ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৮৩।

[90] সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, "কারবালা অফ দ্য মডার্ন টাইমস", পাল (সম্পাদক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৮৬।

ছিল না। মরিচঝাঁপির গ্রামগুলিতে আগুন লাগার আগে শরণার্থীদের তীব্র আর্তনাদ শুনে কুমিরমারি ও বাগনার বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে যায়। আমার নিজেরও বিশ্বাস ছিল পুলিশ আগুন লাগায়নি। কারণ সম্পূর্ণ ভাবে তখনো পুলিশ সিপিএমের কব্জায় আসেনি। তাছাড়াও তখনো অবধি এমন অনেক পুলিশ অফিসার ক্ষমতায় ছিলেন যারা সরাসরি জ্যোতি বসুর মুখের উপর না বলতে পারতেন। দুজন আইএএস অফিসার ও তিনজন আইপিএস অফিসার জানতেন ২৪ পরগণার এক নেতা আগুন লাগানোর জন্য ক্যাডারদের জড়ো করেছে। তাদের কাছে এই খবরও ছিল ক্যাডারদেরকে শেখানো হয়েছে কিভাবে সহজে কাজটি করা যায়। সেই আইএএস অফিসাররা ছিলেন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং ২৪ পরগণার জেলাশাসক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী (দুজনেই এখন মারা গেছেন)। আর বাকি তিন আইপিএস অফিসাররা এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন, অমিয় কুমার সামন্ত, সন্ধি মুখার্জী এবং সুজিত সরকার। এই তিনজন ছিলেন মরিচঝাঁপিতে হামলা চালানোর মুখ্যনেতা। কুমিরমারি ও বাগনাতে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর 'চরেরা' দেখেছিলেন পুলিশ তাদের নিজেদের লঞ্চে করে আগুন ধরানোর লোকদের নিয়ে আসছে। কিন্তু যেই নেতা এই গোটা আগুন লাগানোর পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি প্রমোদবাবু (সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক) ও জ্যোতি বসু দুজনেরই কাছের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি মন্ত্রী ছিলেন না সেই সময়ে। ১৯৮২ সালে তাকে মন্ত্রী বানানো হয়।"[91]

"হাসনাবাদে কিছু শরণার্থী আমাদের বলেছিলেন যে আগুন লেগে তাদের গায়ে ছেঁকা খাওয়ার ক্ষত তৈরী হয়েছিল। মরিচঝাঁপির ফেরিঘাটে পুলিশ তাদেরকে মারধর করে ও লঞ্চ ভর্তি করার জন্য নিয়ে যায়। বহু মানুষ এই সময় আহত হন। পুড়ে যাওয়ার বা কাটার জায়গার উপর কোনো ওষুধ দেওয়া হয়নি। এইভাবে দুধকুন্ডিতে শরণার্থীদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটি পরিত্যক্ত সেনা ছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হয়.. সেই দুধকুন্ডি থেকে বিশেষ ট্রেনে করে বিভিন্ন ভাগে তাদেকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল।" "৬৫ বছর বয়সের বৃদ্ধা ফণীবালা মন্ডল যার কুঁড়ে ঘরে পুলিশ ১৪ ই মে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, তিনি কোনোরকম চিকিৎসা ছাড়াই পোড়ার ক্ষত নিয়ে দুধকুন্ডি শিবিরে অসম্ভব যন্ত্রনায় ছটফট করছিলেন .... আমি তার যে কাপড়ের অংশ বুককে ঢেকে রেখেছিল সেটি খুলে নিয়েছিলাম। তার বুকের অর্ধেক অংশ পুড়ে গিয়েছিল। তপন একের পর এক ছবি তুলছিল। ও বারবার নিজের চোখের জল মুছ্ছিল ছবি তোলার সময়। ২১শে মে (১৯৭৯) তে বৃদ্ধার ছবির সাথে আনন্দবাজারে আমার লেখা বের হয়েছিল।"[92]

---

[91] সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, "কারবালা অফ দ্য মডার্ন টাইমস", পাল (সম্পাদক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৮৮। লেখাটি পড়ে বোঝা যায় লেখক মন্ত্রীর নাম জানতেন, কিন্তু তিনি জীবিত ছিলেন এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারতেন তাই তিনি তার নাম উল্লেখ করেননি। যদি তার নাম কারুর জানা থাকে আমাকে জানাতে পারেন, আমি সেটি যোগ করে দেব। ইন্টারনেটে আমি সুখরঞ্জন সেনগুপ্তর মরিচঝাঁপির উপর লেখা একটি ইংরেজি বইয়ের খোঁজ পাই যেখানে বইটির ওজন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ও আইএসবিএন নম্বর দেওয়া ছিল। কিন্তু প্রকাশক জানান তারা কখনই বইটি প্রকাশ করেনি, সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু প্রকাশনার জন্য তৈরী একটি খসড়া থাকার কথা, সেটি যদি কেউ পান। তাহলে marichjhapi.com পোস্ট করা হবে ও হয়তো প্রকাশও করা হবে। কেউ কোনো কপি খুঁজে পেলে তাকে আর্থিক মূল্য দেয়ারও ব্যবস্থা আছে।

[92] সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত, "কারবালা অফ দ্য মডার্ন টাইমস", পাল (সম্পাদক) মরিচঝাঁপি, ইংরেজি খসড়া, পৃ. ৮৩-৮৪।

আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষ কুমার ঘোষ ১৯ মে একটি সম্পাদকীয় লেখেন এইরকম – "মরিচঝাঁপি 'উদ্বাস্তুমুক্ত' হয়েছে। কিন্তু তার আগেই রাজ্য সরকার এটিকে একটি নিষিদ্ধ এলাকা বানিয়েছিল! (আমরা জানিনা একটি গণতান্ত্রিক দেশে কোন্ সাংবিধানিক আইন এমনটা করার অনুমতি দেয়!) তারপরেও তিন হাজারের বেশি সশস্ত্র পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেনি। উচ্ছেদ অভিযানকে সফল করতে সিপিএমের প্রায় দু-হাজারের বেশি ক্যাডারকে নিয়োগ করতে হয়। ক্যাডারদের উপস্থিতি জনগণকে বিচলিত ও ভীতসন্ত্রস্ত ক'রে তোলে। শোনা যায়, শরণার্থীদের উৎখাত করতে এরা তাদের ঘরবাড়ি লুঠপাঠ ক'রে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়।... দলের ক্যাডারদের কেন অসহায় মানুষদের ওপর নির্যাতন করতে দেওয়া হল? পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কি পুলিশবাহিনী প্রস্তুত ছিলনা? নাকি তাদের সামর্থ্যের ওপর সরকারের আস্থা ছিলনা? ক্যাডাররা কি নিজেদের পুরাণকথিত সেই ষাঁড়ের দল মনে করেছিল যারা নিজেদের চারপাশের সবকিছুকে হত্যা করার ক্ষমতা রাখে? তারা কি হিটলারি বাহিনীর সদস্য? গুন্ডাবাহিনীকে রিজার্ভ হিসাবে রাখা একটি রাজনৈতিক দলের জন্য মোটেও গণতন্ত্রের লক্ষণ নয়।"[93] সিপিআইএমের তরফ থেকে অবশ্য তাদের ক্যাডারদের ভূমিকাকে গোপন করার কোনো প্রচেষ্টা দেখা যায়নি; বরং তারা উচ্ছেদে অংশগ্রহণের জন্য তাদের অভিনন্দন জানায়।[94]

নিখোঁজ হওয়ার প্রাথমিক সংখ্যাটা সামনে আসে যখন সরকার শরণার্থীদের দন্ডকারণ্যের শরণার্থী শিবিরে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সেখানকার কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী ৪,১২৮ টি পরিবার ফিরে আসেনি, যদিও তারা কীভাবে মারা গেছে তার কারণ অজানা।[95] এমন কিছু পরিবার ফিরে এসেছিল যারা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছে। কিন্তু গণনায় তারা স্থান পায়নি। ফলে আশঙ্কা করা যায়, আসল ক্ষতির পরিমাণ এর তুলনায় বেশি হতে পারে। তাদের অনুমান প্রায় তিনহাজার লোক পালাতে সক্ষম হয়েছিল, যা মোট মৃত্যুর পরিমাণ কম হওয়ার পক্ষে সওয়াল করে। অবশ্য ফিরে আসা পরিবারগুলির ব্যক্তিগত ক্ষতির জন্য এটি করা হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। প্রতি পরিবারপিছু সদস্যসংখ্যা চার ধরে নিলে এতে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৭,০০০। সরকারের সাম্প্রতিকতম ও সবথেকে নির্ভরযোগ্য রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, দন্ডকারণ্য থেকে যাওয়া ১৫,২৪২ টি পরিবার মরিচঝাঁপি থেকে আর ফিরে আসেনি। এর মধ্যে কেউ কেউ পালিয়ে গিয়ে থাকবে। ফলে কতজন মানুষ নিশ্চিতভাবে মারা গিয়েছে তা পরিষ্কার নয়।[96] মরিচঝগাঁপির ১,০৪০ টি পরিবার পশ্চিমবঙ্গে ও অল্পকিছু পরিবার উড়িষ্যায় বসবাস করছে বলে রেকর্ড করা হয়েছে। ফলে হতাহতের সংখ্যা কিছু কম হয়ে থাকবে। তবে নিখোঁজদের মধ্যে অধিকাংশই যে কোনো-না-কোনোভাবে মারা গেছেন, তেমনটা বলা বোধহয় অসঙ্গত

---

[93] সন্তোষ কুমার ঘোষ, 'ওহ ল! ওহ এথিক্স' পাল (সম্পাদক)

[94] কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া মার্কসবাদী (সিপিএম), কলকাতায় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনফারেন্সের চোদ্দতম প্লেনারি সেশনে গৃহীত 'রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৮২।

[95] অথর্বকি বিশ্বাস, 'হোয়াই দন্ডকারণ্য এ ফেলিওর, হোয়াই মাস এক্সোডাস, হোয়্যার সলিউশন?' দি অপ্রেসড ইন্ডিয়ান, ১৯৮২, ৪(৪): ১৮-২০। গণনায় বলা হয়েছে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে ১৪,৩৮৮ পরিবার চলে যায়, যার মধ্যে ১০,২৬০ টি ৩১ অক্টোবর, ১৯৭৮-এর মধ্যে ফিরে এসেছে। অতএব, এই সংখ্যাটি গণহত্যার আগের পরিযানের কথা নির্দেশ করে। কিন্তু গণহত্যার পর কত মানুষ মরিচঝাঁপিতে এসে দখলদারি চালিয়েছে, তা জানার উপায় নেই।

[96] সালিচ আহমেদের সঙ্গে সৌম্য শঙ্কর বসুর কথোপথন, এক্সপেরিমেন্টর গ্যালারি, ভিমেও, এপ্রিল, ২০২১।

নয়। সাম্প্রতিকতম মিসিং ইন অ্যাকশনের পরিসংখ্যান গণহত্যার মাত্রা সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেয় এবং বামফ্রন্ট সমর্থকেরা হতাহতের যে নগণ্য সংখ্যাটিকে তুলে ধরত তাকে প্রশ্ন করে। বেঁচে ফেরা কিছু মানুষ নিজেদের পরিচয় সংগুপ্ত রেখে এটা তৈরি করেছে। একজন তথ্যচিত্র নির্মাতা তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা ক্যামেরার সামনে আসতে ভয় পান। চার দশকের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু হতাহতের কোনো যথাযথ হিসাব এখনো পুরোপুরিভাবে ক'রে ওঠা যায়নি। শুধুমাত্র সরকার বা বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাছেই ভুক্তভোগীদের শনাক্ত করার মতো তথ্য আছে। এই ধরণের তদন্ত ব্যতীত হতাহতের সংখ্যার কোনো সঠিক অনুমান করা সম্ভব নয়। ৬০,০০০ জন বাসিন্দার অনুমানের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মৃতের সংখ্যা হিসাব করা যেতে পারে ৪০,০০০, স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে যাদের তিন চতুর্থাংশই মারা গেছে। এই দুটি সরকারি গণনাকে আর গুরুত্ব দেওয়া হয়না। কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা গণনার হিসাবপদ্ধতির একটা বড়সড় গরমিলকে এটি নির্দেশ করে। পূর্ব টিমোরে জনসংখ্যা সম্ভাব্য কতটা বাড়তে পারত তার থেকে থেকে বাস্তব মোট জনসংখ্যার হিসাবটিকে বিয়োগ ক'রে মোট মৃত্যু সংখ্যাকে গণনা করা হয়েছিল। কিন্তু মরিচঝাঁপির ক্ষেত্রে দণ্ডকারণ্যের মৃত্যুগুলো এক্ষেত্রে গণনা করা মৃত্যুর হিসাবকে বাস্তবসম্মত করেনা। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায় অনেকে নিজেদের বেঁচে ফেরা মানুষ হিসাবে পরিচয় দেয়, যা প্রকৃত হিসাবকে আরও জটিল ক'রে তোলে। সংবাদমাধ্যমগুলিতে অবশ্য মৃত্যুর সংখ্যাকে কয়েক হাজারে রেখে কিছু হিসাব করা হয়েছে, কিন্তু এই হিসাবগুলো তারা কোত্থেকে পেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা অদূর ভবিষ্যতেই মারা যাবেন, তবু রাজনীতির ঘোলা জল থিতিয়ে এলে পরবর্তীকালেও তাদের বংশধরদের সাহায্য নিয়ে মৃত্যুর প্রকৃত হিসাব করা হয়তো সম্ভব হবে।

যদিও গণহত্যার ঘটনাগুলি মোটামুটি যথাযথভাবেই নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং এতে গুলিবিদ্ধ বা অবরোধ চলাকালীন অনাহার ও রোগভোগে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের একটি আংশিক তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, গণহত্যার সঙ্গে সঙ্গেই এই নথিপত্রগুলি শেষ হয়। সাগরে ভেসে যাওয়া লাশগুলির পরীক্ষা করা আর সম্ভব নয়। ফলে এর প্রমাণ হিসাবে একমাত্র রয়ে গেল প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, যেগুলি তিন দশকের বামশাসনের অবসানের পর ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে। এই বিবরণগুলো যদিও অমূল্য, তবু ঘটনার সম্পূর্ণ ছবি নির্মাণের ধারেকাছেও এগুলো এখনও নেই। সরকার বা সিপিএম-পক্ষের কেউ না থাকায় আক্রান্তের সাক্ষ্যই এক্ষেত্রে রয়েছে। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ এই বিপর্যয়ের ক্ষত তাদের স্মৃতিতে বয়ে নিয়ে চললেও আজও এর সামান্য কিছু অংশেরই কেবল সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছে।[97] অন্য কোনো ব্যাপক প্রামাণ্য তদন্তের যুযোগ না-থাকায় এটিকেই সর্বোৎকৃষ্ট তথ্যভান্ডার হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

[97] বিষয়টি সম্পর্কে সবথেকে বেশি সংখ্যক অ্যাকাডেমিক নিবন্ধ হল অমিতাভ ঘোষের উপন্যাসটি থেকে উদ্ভূত সাহিত্য সমালোচনা। এগুলো যদিও কোনো ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে কাজ করেনা, কিন্তু যেকোনো অ্যাকাডেমিক কাজের তুলনায় হত্যাকান্ডের ঘটনাটিকে বহুগুণে বেশি প্রচার করে। এটি এমন এক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল, যা দলিতরা তাদের নিজেদের থেকে কখনো অর্জন করতে পারেনি। দেবযানী সেনগুপ্ত, "দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল: ফ্র্যাজাইল বর্ডারস্ অ্যান্ড নিউ আইডেন্টিটিজ", কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬।

সিপিএমের এমনটা করার পিছনে কী কারণ ছিল তা আজও অজানা। "আমার কোনো ধারণা নেই সরকার কেন এমন কঠোর অবস্থান নিল – এটা গভীর রহস্য। সে-সময় আমি কমলাদিকে (সিপিআইয়ের [সিপিএমের প্রতিদ্বন্দ্বী] কমলা মুখার্জি) জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন বামপন্থী সরকার এমন নৃশংস পদক্ষেপ নিল। তারা যদি এদেরকে থাকতে দিত, তাহলে গোটা গোষ্ঠীটাই চিরকালের জন্য তাদের অনুগত থাকত। তিনি আমার মতোই ক্ষুব্ধ ও হতবাক ছিলেন। তিনি বলেন, 'কমলা, যে রাজনীতি তাদের এমনটা করতে প্ররোচিত করে, আমি সেই রাজনীতি কিছুমাত্র বুঝিনা।'"[98]

সচেতকের সতর্কবার্তা

তিন দশকের জন্য সকলে এই হত্যাকান্ডকে ভুলে গিয়েছিল। ইতমধ্যে এরজন্য সর্বাধিক দায়ী ব্যক্তি যারা, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী দেশাই, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)-র রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সকলেরই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। প্রেসের সাময়িক উৎসাহ থিতিয়ে এলে হাতেগোনা কয়েকটি দলিত প্রকাশনা ছাড়া বাকিরা ঘটনাটিকে অবহেলার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেন। অবশ্য সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের কথোপকথনে এটি কিন্তু আজও 'প্রায়শই' ফিরে ফিরে আসে।[99] ঘটনাটি ঘটার প্রায় বছর কুড়ি বাদে বেশ কয়েকবার প্রকাশ করার চেষ্টা করার পর আমার অ্যাকাডেমিক আর্টিকেলটি বের হয়। কোনো এক্সটার্নাল রিভিউ ছাড়াই আগেকার সম্পাদকেরা এটিকে বাতিল ক'রে দেওয়ার পর যে অ্যামেরিকান জার্নালের সম্পাদক এটিকে প্রকাশ করেন, তাঁর মতে, "এতদিন পরেও... আমরা এখনো আপনার পান্ডুলিপিটির জন্য একটি ভালো এক্সটার্নাল রেফারি রিপোর্ট পাইনি। আমরা বেশ কয়েকজন পর্যালোচকের কাছে অনুরোধ করেছি এবং কেউ কেউ কাজটি গ্রহণও করেছেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পান্ডুলিপিটি আমাদের কাছে একটি তুচ্ছ বিবৃতি-সমেত ফিরে এসেছে যে তারা তাদের প্রতিশ্রুত প্রতিবেদনটি সরবরাহ করতে অক্ষম।" সম্পাদক শেষমেশ কয়েকজন পর্যালোচক খুঁজে পেয়েছেন যাতে লেখাটিকে প্রকাশ করা যায়। যদিও লেখক কদাপি কোনো অ্যাকাডেমিক চাকরি করেননি, তথাপি, অ্যাকাডেমিকরা কী-পরিমাণ নিপীড়কদের পাশে থাকে, তা বুঝতে তাঁর বেশ কয়েকবছর লেগেছে। এক প্রজন্ম বাদে, যখন এ-বিষয়ক তথ্য আরও সুলভ হয়েছে, কমিউনিস্টরা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন এবং হত্যাকান্ডের পেছনে দায়ী প্রধান প্রধান মাথাদের অধিকাংশই মারা গেছেন, তখন দেখা যাচ্ছে এই লেখা প্রকাশ করা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ, এর উল্টোটাই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে এটিকে ছাপানোর জন্য একজন প্রকাশক মেলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। শিক্ষাবিদেরা মানবাধিকারের বহিঃপ্রকাশকে বাধা দেন, যদিনা তা তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

---

[98] কমলা বসু, "মরিচঝাঁপি ইন আইসোলেশন", পাল, সম্পাদক, মরিচঝাঁপি, ইংরেজি অনুবাদের খসড়া, পৃ - ৯।

[99] অমিতেশ মুখোপাধ্যায়, লিভিং উইথ ডিজাস্টার্সঃ কমিউনিটিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ইন্ডিয়ান সুন্দরবনস, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬, পৃ - ৪০।

অক্সফোর্ডে আমার ডক্টরাল থিসিসে যখন এই হত্যাকান্ডের ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হয়, পরীক্ষকেরা অর্থাৎ গোপাল কৃষ্ণ ও টি জে নসিটার কোনো পর্যালোচনা বা পুনরায় জমা দেওয়ার অনুমতি না দিয়ে শুধুমাত্র একটি এমলিট দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন। কৃষ্ণ মৌখিক পরীক্ষায় প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছিলেন, যদিও নসিটার শেষ অবধি নিজের বিশ্বাসকে চাপিয়ে দেননি। আমার তত্ত্বাবধায়ক তপন রায়চৌধুরি আমার পুনরায় জমা দেওয়ার এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেননি এবং বিষয়টির সঙ্গে জড়িত মানুষদেরও বিষয়টি থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে আমার লবিকে দুর্বল করেন। আমি যে কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সেই সেন্ট অ্যান্থনি'জ কলেজও আমাকে সমর্থন করেনি। নেভিল ম্যাক্সওয়েল যদিও এই বিষয়টির ভার নেন। সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান পিটার ওপেনহাইমার বিষয়টিকে তুলে ধরেন এবং বোর্ডের আরেকজন সদস্য অমর্ত্য সেন আমার পুনরায় জমা দেওয়ার অধিকারকে সমর্থন করেন। তপন রায়চৌধুরিও এসময় সুপারিশ সম্পর্কে নিজের অবস্থান পরিবর্তন করেন। আমি এসময় আমার কাজের আপিলটিকে হারাই। রায়চৌধুরি আমাকে সমাজ বিজ্ঞানের বদলে ইতিহাস অনুষদের একটি থিসিসে তদারকি করার প্রস্তাব দেন, কেননা সেখানে নিজের পরীক্ষককে নির্বাচন করার সুযোগ ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে অন্য আরেকটি থিসিস লেখার অনুমতি দেয়না। ফলে পিএইচডি-র জন্য আমাকে কেমব্রিজে আরেকটি থিসিস লিখতে হয়েছিল। থিসিসগুলো পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। বহিরাগত পরীক্ষক টি জে নসিটার (এলএসই) লিখেছেন যে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জ্যোতি বসুকে নিয়ে সেই বিখ্যাত বিবৃতি যে তিনি "[প্রধানমন্ত্রীর] ভূমিকার জন্য আরও উপযুক্ত ছিলেন, মন্তব্যটি একটি করুণাময় সোউজন্য নয়, বসুর অবস্থানের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ছিল।"[100] নসিটার জ্যোতি বসুর লন্ডন সফর ও লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে জনসভার আয়োজন করেছিলেন যেখানে মরিচঝাঁপির প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়নি; যদিও তিনি ডক্টরাল থিসিসটা, যেটিকে তারা ছাড়পত্র দেননি, থেকে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানতেন। নসিটার হয়তো উদ্বিগ্ন ছিলেন যে মরিচঝাঁপি গণহত্যার বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে পড়লে তা জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।[101] তবে, আমি যতদূর জানি, কোনও প্রধান ভারতীয় রাজনীতিবিদকে শুধুমাত্র বা

---

[100] টি জে নসিটার, মার্ক্সিস্ট স্টেট গভর্নমেন্টস ইন ইন্ডিয়া, পিন্টার, ১৯৮৮, পৃ - ১৩৯।

[101] আমাকে সিপিআইএম-বিরোধী হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু শুরুতে বিষয়টা এমন ছিলনা। আমি সিপিআইএম নেতা বিপ্লব দাশগুপ্তর তত্ত্বাবধানে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি পাকাপাকিভাবে ভারতে ফিরে গেলেন। ফলে আমি অক্সফোর্ডে পাড়ি জমালাম। যদিও আমাদের মধ্যে সেইঅর্থে কোনো সম্পর্ক ছিলনা, তবু তিনি আমার গবেষণায় সাহায্য করেছিলেন। বহুকাল বাদে আমি জানতে পেরেছিলাম তিনি মার থিসিসের জমা দেওয়া ও পুনর্মূল্যায়নের বিষয়ে সহানুভূতিশীল ছিলেন। ঘটনাটি আমায় অবাক করেছিল কেননা, আমি থিসিসে বাষ্ট্রফ্রন্টের কাজকর্মের তুঘুল সমালোচনা করেছিলাম। যে অধ্যাপক আমাকে এই ঘটনাটি বলেছিলেন, তাঁর মতে, বিপ্লবকে জ্যোতি বসুর সঙ্গে লন্ডন সফরের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা হয়, কেননা, নসিটার তাঁর ভূমিকা নিয়েছিলেন। এভাবে বিপ্লবকে তাঁর পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে সুশাসন সম্পর্কিত কোনো অভিজ্ঞতাবাদী গবেষণা করা সম্ভব নয়। যদিও তথ্যগুলি অনিবার্যভাবেই পুরোনো হয়ে গেছিল, তবু কেউ হাতেকলমে প্রমাণসহ এগুলোকে খন্ডন করতে সাহস পায়নি। এবং রাজ্যস্তরে সবকটি ক্ষেত্রে এরপর থেকে কোনো বিশ্লেষণও করা হয়নি। আমি এরজন্য তাদের দোষ দিতে পারিনা, কেননা, পশ্চিমবঙ্গে আমলাতন্ত্রের কাজ চালানো খুবই কঠিন, বিশেষতঃ ফোনের ব্যাপক ব্যবহারের আগে অনেক সরকারি অফিসেও ফোন ছিলনা। এবং সাধারণ নাগরিকদের জন্য এক দশকেরও বেশি সময় কখনো কখনো অপেক্ষা করতে হত। আমি ভাগ্যবান, কেননা, আমার বাবার খুড়তুতো ভাই এস পি মল্লিক,

প্রাথমিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে আটকানো বা পদ থেকে অপসারণ করা হয়নি, এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে পাঠানোও তাদের কাছে উদ্বেগের বিষয় নয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের প্রসিকিউটরের কাছে করা একটি আবেদনের উত্তরে বলা হয়েছিল যে, বিষয়টি নিয়ে কিছু করা তাদের এক্তিয়ার-বহির্ভূত। এবং হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ্ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও আমার আপিলটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। যদিও অ্যামনেস্টির লন্ডন অফিসে ভট্টাচার্যের ডকুমেন্টারিটি দেখানো হয়েছিল। অবশ্য তাতেও খুব-একটা কিছু যায় আসেনি।

১৯৭০-এর দশকে ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে মরিচঝাঁপির ঘটনা ঘটে যখন বামপন্থীরা তাদের ক্ষমতার তুঙ্গে অবস্থান করছে। এতদিনকার পর্তুগিজ উপনিবেশগুলি সে-সময় ফ্যাসিবাদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, কমিউনিস্টদের হাতে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার 'পতন' ঘটেছে এবং বামপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য অর্জন করেছে। তৃতীয় বিশ্বজুড়ে এটাই ছিল তখনকার ঐতিহাসিক প্রবণতা। যদিও শেষপর্যন্ত এই সমস্ত শাসকেরাই নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে

আই এ এস, ল্যান্ড রিফর্ম কমিশনার এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, তাঁর গাড়ির চালককে দিয়ে আমার ঘরে যাবতীয় সাম্প্রতিক তথ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমায় বাড়ি থেকে বেরোতে না হয়, যেটা ডক্টরাল রিসার্চের ক্ষেত্রে দস্তুর। আই এ এস অফিসারেরা পূর্বে পরিদর্শন করেনি, এমন অফিসগুলো এস পি মল্লিক যখন পরিদর্শন করেন, তিনি আমার তথ্য সংগ্রহের তুলনায় ঢের বেশি সহায়তা পান। এমনকি তিনি তথ্য সংগ্রহের জন্য নিজের কর্মচারীকে শিমলাতেও পাঠান, যেটা করার চেষ্টা অন্যথায় আমি করতাম না। সরকারি অফিসারদের কাছে আমি কোন্ পরিবারের সদস্য সেটা বোঝানোর জন্য আমার বাড়ির ঠিকানাটাই যথেষ্ট ছিল; এটা আমায় বেশ বিস্মিত করে, কেননা বাড়ি ফেরা ইস্তক কোনো শীর্ষস্তরীয় আমলাক্র ব্যক্তিগত বাসভবনের ঠিকানা আমার জানা ছিলনা। কিন্তু বিশ্লেষণ আর তথ্য সংগ্রহ এক জিনিস নয়। এটা একটা আদর্শের বিষয়, এবং তথ্য যদি সেই আদর্শকে প্রমাণে সহায়ক না হয়, তাহলে সেই তথ্যকে উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। আমার বইটা সংক্ষিপ্ত হয়েছে, এবং কোহলির কাজটির থেকে কম প্রচারিত হয়েছে। কাজটিতে কোহলি সিপিআইএমের কাজকে দৃষ্টান্তস্থাপনকারী হিসাবে মত দিয়েছিলেন, যদিও সেই মতকে সমর্থন জকরার মতো পর্যাপ্ত তথ্য সেখানে ছিলনা, আর তাঁর বক্তব্য যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন ছিল। কিন্তু শিক্ষাবিদেরা এভাবেই এই শাসনকালকে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই কাজটি প্রচার পেয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম, এডগার স্নো-র ড্রেড স্টার ওভার চায়নার কোনো সমতুল্য কোনো ভারতীয় কাজ হবে, কিংবা হিল্টনের ফ্যানশেনের পথ মোতাবেক সঠিক গ্রামটিকে পাওয়া যাবে। কিন্তু আদতে কোনোকিছুই হচ্ছিল না। যদিও এসময় বেশকিছু সম্ভাবনাময় প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। কিন্তু যেটা দরকার ছিল তা হল, এমন একটা ভাষা যা গোলাপি চশমা পরে সন্তর্পনে চেরি বাছাই করার মতো পরিসংখ্যাঙ্কে ব্যবহার করবে। পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ কখনোই প্রতিবেশী রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েনি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ছাড়া এ-বিষয়ে অ্যাকাডেমিক ও সাংবাদিকদের আগ্রহও ছিল সীমিত। আমি এর আগে গৃহযুদ্ধে যুযুধান মার্ক্সবাদী মোজাম্বিকে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছি। সেখানে আমি দেখেছিলাম, সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের তত্ত্ব কাজ করছেনা, কিন্তু আমি চুপ ছিলাম কেননা আমি মোহভঙ্গ করতে বা সত্যিকারের বিশ্বাসীদের সঙ্গে তর্ক করতে চাইনি। পশ্চিমবঙ্গ তার থেকে ঢের বেশি অনুকূল পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল, কিন্তু পার্টি নিজেদের সমর্থনের ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ না করায় শেষ অবধি সেই সম্ভাবনাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। মরিচঝাঁপিকে ফিরে দেখলে মনে হয়, দলিতদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ঘটনা বাম্ফ্রন্ট শাসনকে সামগ্রিকভাবে সংগায়িত করার মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও আধিপত্যকামী জাতেরা সম্ভবতঃ বিষয়টিকে এভাবে দেখবে না। চীন কমিউনিস্ট শাসনের কথা বলতে গিয়ে তিয়েনানমেন স্কোয়্যারের বদলে শিল্প বিপ্লবের কথা বলতে পারে। কিন্তু বামফ্রন্টের কাছে বড়াই করার মতো এইরকম কোনকিছুই নেই। এমনকি শিক্ষাক্ষেত্র, যা তাদের হাতে ছিল, সেখানেও তারা কোনরকম রূপান্তর বা সংস্কারসাধনে ব্যর্থ হয়েছে।

রাখতে এবং নিজেদের আখের গোছাতে পুঁজিবাদের মধু পান করে। তেল রাজস্বকে কেন্দ্র ক'রে অ্যাঙ্গোলায় এর নগ্ন রূপ এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল; অবশ্য বাকি গরীব দেশগুলোতেও মোটের ওপর এই একই পরিস্থিতি কায়েম হয়েছিল। সে-সময় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ মার্ক্সবাদের বিদ্যাতনিক চর্চার পরিসরে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়; আর পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টান্তটি সেই চর্চার আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের প্রশ্নটি। পূর্বের প্রশ্নটি এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। সত্যিই যদি রূপান্তরের কোনো প্রবণতা অবশিষ্ট থেকে থাকে, তবে উদারনীতিবাদ আর সমাজতন্ত্রের ভাঙনের পথ ধরে সেই প্রবণতা আজ মৌলবাদের দিকে ধাবিত। ভেবে দেখলে মনে হয়, মরিচঝাঁপির ঘটনা যে সময় ঘটেছিল, সে-সময় বিশেষতঃ বিদ্যায়তনিক চর্চার ঝোঁকটা সেদিকে ছিলনা। আজ বরং ছবিটা ঘুরে গেছে। বিশেষতঃ ভারতে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যায়তনিক চর্চার পরিসরে জাতপাতের প্রশ্নটির গুরুত্ব হু হু ক'রে বেড়েছে। যদিও এই পরিসরে বামপন্থী ভাবনাচিন্তার অভিঘাত এখনো যথেষ্ট রয়ে গেছে, কিন্তু ভালই হোক কিংবা মন্দই হোক, জনচেতনায় বামপন্থা আজ প্রায় বিলুপ্ত।

আমেরিকায় আমার নিবন্ধটির প্রকাশের বেশ কিছু বছর পর ভারতে সমাজবিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় জার্নাল ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি-তে আন্নু জালাইসের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।[102] সে-সময় কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় ছিল; ফলে তাদেরকে এমন একটি লেখা পড়তে বাধ্য করা সত্যিই সাহসী পদক্ষেপ। তৃণমূল স্তরে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ভিত্তিতে হওয়া এই কাজটি আমার রাজ্যস্তরের গবেষণার পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল এই যে, গণহত্যা যে হয়েছিল, যাতে (স্থানীয় হিসাবানুযায়ী) তিন-চতুর্থানশ মানুষ মারা যান, সেই সত্যিটাকে কাজটি প্রমাণ করেছে। বামফ্রন্টের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, যিনি গণহত্যার সময় ওই পদে ছিলেন, তিনি যদিও মনে করেন, এটা 'অতিকথন', কেননা, তাঁর মতে, ওই ঘটনায় মাত্র দু'জন মারা গেছিলেন। "এই ঘটনাকে গণহত্যা বলে উল্লেখ করা বাড়াবাড়ি। এ-জাতীয় অতিকথন আসলে সত্যি তো বলেইনা, বরং তার থেকে দূরে ঠেলে দেয়।"[103] তিনি যদিও মরিচঝাঁপির বিষয়ে নিজের ভূমিকা কিংবা অবস্থানকে পরিষ্কার করেননি। এই নিবন্ধটি যেহেতু সংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে প্রথম কোনো দলিতের করা অ্যাকাডেমিক কাজ, তাই আমার লেখাটির মতো এটিতে বিষয়স্বার্থের গন্ধ খুঁজে বের ক'রে এটিকে বাতিল ক'রে দেওয়া সম্ভব হয়নি। খুবই তাতপর্যপূর্ণভাবে এই দুটি কাজই (বর্তমানে) ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের করা, ফলে তাঁরা সরকারি বিধিনিষেধের কবলমুক্ত। কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা, যারা বিদেশে কর্মরত (ফলে পেশাগতভাবে নিরাপদ) এবং ঘটনাটি সম্পর্কে জানতেন, তাঁরাও এ-সম্পর্কে কেউই প্রায় লেখেননি। বিদেশী ডক্টরাল ছাত্রদের গবেষণার জন্য প্রথমে এটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, যার ফল মোটেও সুখকর হয়নি।

---

[102] অণু জ্বালে, 'ড্যুয়েলিং অন মরিচঝাঁপিঃ হোয়েন টাইগারস্ বিকেম 'সিটিজেনস্', অ্যান্ড রিফিউজিস 'টাইগার ফুড'', ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি, এপ্রিল ২৩, ২০০৫।

[103] অশোক মিত্র, 'হাইপারবোল অ্যাবাউট ম্যাসাকার', ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি, ভলিউম - ৪০, সংখ্যা - ২০, মে ১৪, ২০০৫।

এই বিষয়ে প্রথম বইটি কলকাতায় শুধুমাত্র বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং এতে ক্ষতিগ্রস্তদের নামের ৩৭ পৃষ্ঠার একটি তালিকা যোগ করা হয়েছিল।[104] লেখক ছিলেন ঔপনিবেশিক বাংলার একজন মন্ত্রীর ছেলে এবং পরে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী। সম্ভবত লেখকের আরও বড় পরিচয় যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিলেন এবং বিরোধী দলে থাকাকালীন জ্যোতি বসুর সঙ্গে জেল খেটেছেন। তাঁকে তার বিশিষ্টতার জন্য অথবা পুরানো সেই দিনের কথা ভেবে রেহাই দেওয়া হয়েছিল কিনা তা বলা অসম্ভব, তবে একটি সংবাদপত্রের বই পর্যালোচনাকারীকে বইটি পর্যালোচনা করার জন্য তার কাগজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পর্যালোচক মামলাটি আদালতে নিয়ে যান, যেখানে বিচারক রায় দেন যে তাঁকে বেআইনিভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে, কেননা, সেই পর্যালোচক সম্পাদকের আজ্ঞাপালন করেছিলেন মাত্র। আরেকজন লেখক উল্লেখ করেছেন, "জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের লেখা 'মরিচঝাঁপি, নৈঃশব্দের আড়ালে' বইটি আমি পড়েছি। বইটি পড়ে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে যাই এবং বইটি সম্পর্কে মানুষকে জানানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। সমাজের চোখে 'পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি' বহনকারী তথাকথিত 'প্রগতিশীল', 'আসামি'দের অনেকের কাছে আমি যোগাযোগ করেছি, কিন্তু তারা কেউই বইটি প্রকাশ বা ছাপতে রাজি হয়নি। তাই কোনো বিকল্প না থাকায়, আমি এই বইটি পুস্তকমেলায় ছদ্মনামে প্রকাশ করেছি (কলকাতা বইমেলার মুখপত্র)...পুস্তকমেলার সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সৌভাগ্যবশত আমি আগেই পাঁচকপি সরিয়ে রাখতে পেরেছিলাম। ক্রমাগত হুমকির ফলে আমার উপর চাপ আরও তীব্র হতে থাকে। আমার কিছু শুভানুধ্যায়ী আমাকে আমার ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে আপোষ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা আমাকে বলেছিলেন যে আমি আপোষ না করে মূর্খামির পরিচয় দিচ্ছি। আমি জানতাম যে আমি অত্যন্ত বোকা। আমি এ-সময় গিল্ড থেকে পদত্যাগ করি।"[105] আপত্তিকর বইটিকে বাদ দিয়েই পুস্তকমেলা আবার চলতে থাকে। যদিও সরিয়ে রাখা সেই পাঁচটি কপির "প্রতিদিন ফটোকপি করা চলতে থাকে। এটি কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিনেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। লেখাটি ইংরেজি ও হিন্দিতে অনূদিত হয় এবং বাংলার বাইরে প্রকাশিত হয়। অবশেষে, আমি লক্ষ্য করলাম মরিচঝাঁপি জেগে উঠছে। মরিচঝাঁপির রোমহর্ষক ইতিহাস নিয়ে অনেকেই আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন। তাদের কেউ কেউ গবেষণায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। আমি গণহত্যার ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হতে থাকি। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!"[106] [107]

আরেকজন কলামিস্ট ছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। "মরিচঝাঁপি নিয়ে পান্নালাল দাশগুপ্তের প্রতিবেদন প্রকাশ অব্যাহত রাখলে "যুগান্তর" পত্রিকার সমস্ত বিজ্ঞাপন বাতিল করার হুমকি দেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন সিপিআইএম-এর প্রতিষ্ঠাতা পলিটব্যুরোর সদস্য, রাজ্য সম্পাদক এবং সেই সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম প্রধান

---

[104] জগদীশ চন্দ্র মন্ডল, 'মরিচঝাঁপিঃ নৈঃশব্দের অন্তরালে', সুজন পাবলিকেশন্স, ২০০২।

[105] শৈলেন চক্রবর্তী, 'আইটেম মরিচঝাঁপি', তুষার ভট্টাচার্যের আনপাব্লিশড মরিচঝাঁপিতে সংকলিত, পৃ - ৫৬, marichjhapi.com.

[106] শৈলেন চক্রবর্তী, 'আইটেম মরিচঝাঁপি', তুষার ভট্টাচার্যের আনপাব্লিশড মরিচঝাঁপিতে সংকলিত, পৃ - ৫৬-৫৭, marichjhapi.com

[107] আমি যখন শ্রী মন্ডলের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি, তখন আমায় আশ্চর্য হতে হয় যে তাঁর মতো একজন মানুষ আমায় তাঁর বাড়িতে ডাকার বদলে নিজে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে কথা বলবেন বলছহেন।

নেতা এবং পান্নালাল দাশগুপ্ত ছিলেন তাঁর নিজের ভাই!"[108] যুগান্তরের মতোই অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বাংলা দৈনিকগুলিকেও একইভাবে বিজ্ঞাপনের বন্ধ করার হুমকি এবং ইউনিয়নের ভয় দেখিয়ে মরিচঝাঁপি সংক্রান্ত নিবন্ধ প্রকাশ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। "যেখানে মরিচঝাঁপির ঘটনাটি জাতীয় মিডিয়ার শিরোনামে আসার কথা ছিল, সেখানে স্থানীয় মিডিয়াতেও এটি তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি। কেন? দেবনাথ আমাকে আবার সেই সময়ের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করান। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে শক্তিশালী সংবাদপত্র গোষ্ঠী, আনন্দবাজার পত্রিকা, সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধাচরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ফলাফল? দলটির কর্মচারীদের তাদের অফিসের বাইরে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে মারধর করা হয়। 'এইটি (মারধর) আর সরকারি বিজ্ঞাপন প্রত্যাহারের হুমকি সবসময় কাজ করে।[109]

এই কালপর্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তুষার ভট্টাচার্য বলেন, "সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সদর দফতর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের হুকুম বা সেন্সরশিপের ফলে কোনো নেতৃস্থানীয় বাংলা দৈনিকে মরিচঝাঁপির কোনো সংবাদ প্রকাশিত হতে পারেনি। পান্নালাল দাশগুপ্তের মরিচঝাঁপি-বিষয়ক প্রবন্ধও স্থানীয় যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সিপিআই তখন বামফ্রন্টের অংশ ছিল না; এবং তারা তাদের মুখপত্র কালান্তরে মরিচঝাঁপি নিয়ে কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের উপর নীতি-বহির্ভূতভাবে অবরোধ করা ছিল সিপিআই(এম)-এর আরেকটি দমন-কৌশল। সরকার যে ভবিষ্যতে প্রচণ্ড দমন-পীড়ন চালাবে তার সূচনা হয়েছিল মরিচঝাঁপি গণহত্যার মধ্য দিয়ে।"[110] দলীয় ক্যাডার ও গুন্ডাদের শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করা যদিও নতুন কিছু ছিল না, কিন্তু মরিচঝাঁপি এই শাসনতন্ত্রের এমন একটি সুর বেঁধে দিয়েছিল যাকে আর কখনই নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি।

বিদেশী শিক্ষাবিদেরা এই শাসনপর্বকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে সবথেকে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন চেয়ার প্রফেসরের, যিনি বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে "সুশাসন"[111] ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে "সিপিএমের অধীনে [এটি ছিল] সম্ভবত ভারতের সেরা শাসিত রাজ্য"।[112] লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের অধ্যাপক, টি জে নসিটার দাবি করেছেন যে তারা "সত্যিই অসাধারণ সাফল্য"[113] অর্জন করেছেন, যার মধ্যে "নিঃসন্দেহে [সবথেকে] চিত্তাকর্ষক" হল ভূমি সংস্কার। অবশ্য সরকারে থাকা আমার আত্মীয়দের মধ্যে কেউই এই ধরনের দাবি করেননি এবং এই শাসনকালে আমি দাবির সমর্থনে কোনো প্রমাণ পাইনি। সিপিএমের সাফল্যের অগ্রগণ্য প্রবক্তা অতুল কোহলি

---

[108] বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দ্য টেল অফ মরিচঝাঁপি', র‍্যাডিকাল সোশালিস্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১২।

[109] দীপ হালদার কর্তৃক সাংবাদিক সুকুমার দেবনাথের সাক্ষাৎকার, ব্লাড আইল্যান্ড, কিন্ডেল সংস্করণ, অবস্থান - ১৪৯৮; প্রিন্ট সংস্করণ, পৃ - ১৬৭।

[110] তুষার ভট্টাচার্য, 'দ্য রিফিউজি সেটেলমেন্ট দ্যাট ভ্যানিশড ইনটু নোহোয়্যার', পাল(সম্পাদক), ইংরেজি খসড়া, পৃ - ৩৫।

[111] অতুল কোহলি, 'ক্যান দ্য পেরিফেরি কন্ট্রোল দ্য সেন্টার? ইন্ডিয়ান পলিটিক্স অ্যাট দ্য ক্রসরোডস্', ওয়াশিংটন কোয়াটারলি, ১৯৯৬, ১৯(৪), পৃ - ১২১।

[112] অতুল কোহলি, 'ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ডিসকন্টেন্টঃ ইন্ডিয়া'জ গ্রোয়িং ক্রাইসিস অফ গভর্নাবিলিটি', কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯০, পৃ - ২৬৮।

[113] টি জে নসিটার, 'মার্ক্সিস্ট স্টেট গভর্নমেন্টস্ ইন ইন্ডিয়া', পিন্টার পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃ- ১৮৪, ১৪০।

বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভূমি আমলাতন্ত্রের সদস্যরা প্রায়ই সিপিএমের গ্রামীণ সমর্থকদের 'মাঝারি কৃষক' প্রকৃতিকে 'অপারেশন বর্গা'-এর সমস্যা হিসেবে দায়ী করে... এই যুক্তি অনুসারে যেমন, দলের নিজস্ব সমর্থকরা তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে এমন কোনো কর্মসূচিকে সমর্থন করছে না। আমি এই যুক্তির সমর্থনে প্রমাণ খুঁজে পাইনি" "এটি "অপারেশন বর্গা" সম্পর্কে আমলাতান্ত্রিক লাইন বলে মনে হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের ল্যান্ড সার্ভে ডিরেক্টরের মতো সিনিয়র অসামরিক অফিসার, ডি. বন্দোপাধ্যায় এবং এস. সরকার, উভয়েই সাক্ষাৎকারের সময় এটির ওপর জোর দিয়েছিলেন।[114] আমলাতন্ত্রের নিম্ন স্তরেও এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে"। কর্মীরা, যারা পার্টি লাইনের পক্ষে মাঠে কয়েক দশক ধরে কাজ করেছে বিশেষতঃ এমন সব গ্রামাঞ্চলে সংক্ষিপ্ত পরিদর্শনের করেছে, যেখানে পার্টি আপনাকে প্রতারণা করতে প্রস্তুত, তাদের দাবি খারিজ করার জন্য বৌদ্ধিক ঔদ্ধত্যের প্রয়োজন ছিল। এর জন্য শুধুমাত্র ন্যায্যতা নয়, রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করার জন্য একটি আদর্শের প্রয়োজন, যা তাদের আরও ভাল জ্ঞানী এবং আরও স্পষ্ট প্রশাসকের পরিবর্তে পার্টি লাইন অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। আমি নিজে সফরে ছিলাম তাই আমি জানতাম যে এটি কীভাবে করা হয়েছিল, কারণ এটি পার্টি লাইন থেকে বিচ্যুত হলে বক্তাদের ছেঁটে ফেলা হবে। এটি গ্রামীণ ভারত সম্পর্কে একটি ধারণার অভাবের পরিচয় দেয়, কেননা, একজন দলিতের কাছে এর থেকে বিনোদন পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। জিম ক্রো আমেরিকা বা বর্ণবিদ্বেষী দক্ষিণ আফ্রিকায় বিচ্ছিন্ন কৃষ্ণাঙ্গরা যেমন তাদের শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চেয়ে সমাজকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখে, তেমনি জাতপাতের পরিচয়ও এদেশে উপলব্ধির পার্থক্য নির্মাণ করে। মজার ব্যাপার হল নসিটার বা কোহলি কেউই বুঝতে পারেননি যে, তারা যা পরিদর্শন করতেন সেগুলিকে পৃথক করা হত এবং সেই সময়ে আর একটিমাত্র জায়গাতেই এমনটা হত, তা হল দক্ষিণ আফ্রিকা। যদিও আমি এটি জানতাম, তবু আমি এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি শুধুমাত্র একটি ধারণা পেতে যে তাঁরা সত্য বলার জন্য প্রস্তুত কিনা। যদিওবা তাঁদের লেখায় এমন কোনো ইঙ্গিত থাকে, তবু মনে হয়, তাঁরা তেমনটা সচেতনে করেননি। আমার জন্য পরিস্থিতিটি বরং ভিন্ন ছিল, কারণ আমি যদিও জীবনচর্যার মানের ভিত্তিতে উচ্চ বর্ণের সমগোত্রীয় ছিলাম, তবু আমায় উদ্বিগ্ন হতে হয়েছিল যেহেতু আমার একটি দলিত পারিবারিক পরিচয় রয়েছে, তাই যদি আমি "ভুল" উত্তর দিয়ে থাকি তবে আমি বহিষ্কৃত হতে পারি। সেক্ষেত্রে হয়তো 'সিপিএমত্ব' কাজে আসত। এই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে থাকার সময় যত কম হবে ততই ভাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার উচ্চারণভঙ্গি আমাকে উদ্দীষ্ট গোষ্ঠীদের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এবং প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকার কারণে ভিজিট করা সমস্যাযুক্ত হয়েছিল। অবশ্য বৈধভাবে সেখানে থাকা অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের অভিজ্ঞতা খুবই ভিন্ন। ভারতের ক্ষেত্রেও, যেখানে আধিপত্যকামী জাতি "ন্যায়বিচার"-এর বাস্তবায়নে নেতাগিরি করেছে, সেখানে বাস্তবে যে কী দুর্দশা হয়েছে, তা বাইরের পর্যবেক্ষকরা হয়তো উপলব্ধিও করতে পারেননি।

আপনি যা খুঁজছেন সম্ভবত আপনি খুঁজে পাবেন। আপনি যদি মরিচঝাঁপি নিয়ে গবেষণা করেন তবে আপনি অন্যের নির্যাতন এবং হত্যার ঘটনা যেমন খুঁজে পাবেন তেমনই আপনি যদি সতর্ক না হন তবে সম্ভবত নিজের নামটিকেও হতভাগ্যদের সেই তালিকায় খুঁজে পাবেন। আমি, প্রথম বিদেশী হিসাবে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছিলাম, ফলে

[114] অতুল কোহলি, 'দ্য স্টেট অ্যান্ড পভার্টি ইন ইন্ডিয়া, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৭, পৃ- ১২৭।

একজন সহৃদয় সিপিএম ক্যাডার আমায় সতর্ক করেছিলেন যে, গবেষকই হই আর আর যাই হই, বেফাঁস কিছু করলে কেউই আমাকে তাদের শাসনের নির্যাতন থেকে বাঁচাতে পারবে না। আমার নিজের আত্মীয়রাও আমাকে সতর্ক করেছিলেন যে প্রয়োজনের সময় আমাকে রক্ষা করার মতো উপরমহলে তাদের হাত নেই এবং একজন সাংবাদিকের গল্প আমায় বলা হয়েছিল যিনি একজন সিপিএম বিধায়কের বিরুদ্ধে একটি হত্যার তদন্ত করছিলেন বলে তাকেও হত্যা করা হয়। সিপিএম কর্তৃক বেশ কিছু প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, বেশ কয়েক দশক অবধি যেগুলির একটিরও বিচার হয়নি। আমার এক ভাই আমাকে বাড়ির পাশের বস্তিতে থাকা একজন প্রাক্তন মাওবাদীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন যিনি পুলিশি নির্যাতনে প্রায় মরতে বসেছিলেন, যার প্রমাণ হিসেবে সেই অত্যাচারের ক্ষতগুলো তখনও তাঁর শরীরে দগ্‌দগ্‌ করছিল। আমাকে বলা হয়েছিল যে, আমার ওপর এরকম পুলিশি অত্যাচার হলে আমি তা সহ্য করতে পারব না। অর্থাৎ, নির্যাতন চললে আমি যেহেতু আমার উৎস প্রকাশ করতে বাধ্য, তাই 'ভুলে থাকা' এই গণহত্যা নিয়ে আমার গবেষণা করা উচিত নয়। একজন 'নিরপরাধ বিদেশী'-র কাছে সরকারী পদ্ধতি সম্পর্কে এটি একটি মর্মস্পর্শী কিন্তু নিরর্থক সতর্কবার্তা ছিল। যাইহোক, ব্যবস্থার মধ্যে থাকা আমার সূত্রগুলি ফলাফল সম্পর্কে আমার চেয়ে আরও ভাল অবহিত ছিলেন এবং যদি তারা সাহায্য করতে ইচ্ছুক হন, তবে গণহত্যার ঘটনাকে তুলে ধরার কাজটিকে অস্বীকার করা আমার পক্ষে মোটেও সহজসাধ্য হতনা। পুলিশি পদ্ধতিগুলি তাঁরা জানতেন, ফলে তাঁদের কাছে গোপনীয়তার যেকোন প্রতিশ্রুতিই ছিল সন্দেহের অধীন। আদর্শের দিক থেকে দেখতে গেলে নির্যাতনকারীরা তাদের হাতে ছিল বলেই সরকারকে সব খবর নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এমনটা মোটেও কাম্য নয়। কিন্তু বাস্তবে অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত কেউই জানতেন না কী সহ্য করতে হতে পারে। যারা সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন, বা 'ভুল পথে' চলে গেছিলেন, তাদের সঙ্গে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমার ভাই যে ভয়ঙ্কর গল্পগুলি বলত, তার মধ্যে, আমার প্রিয় গল্পটি হল সেই বিদেশী পর্যটকের যার ভিসা শেষ হয়েছে এবং বিশ বছরেরও বেশি সময় তিনি জেলে কাটিয়েছেন। যদিও সরকারি চাকরিতে কর্মরত পরিবারের বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্যরা আমাকে তথ্য সরবরাহ করছিলেন, কিন্তু আমার ভাইবোনেরা নির্যাতন এবং মৃত্যুর আশঙ্কা থাকায় এ-কাজে আমায় নিরুৎসাহিত করছিল, কারণ তাদের মনে হয়েছিল যে আমাদের পরিবারের কাছে আমাকে রক্ষা করার মতো উপরমহলের সঙ্গে যথেষ্ট সংযোগ নেই। যদিও তথ্য পাওয়ার জন্য তখন এতই ব্যস্ত ছিলাম যে এই সতর্কবাণীগুলো শোনার মতো অবকাশ সে-সময় আমার ছিলনা। মরিচঝাঁপি নিয়ে যারা পার্টি লাইনকে সমর্থন করতেন, তেমন লোকেদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমার কিছু ভুল হয়েছিল, কিন্তু দৃশ্যত কেউই আমার বিরুদ্ধে খুব বড় কিছু অভিযোগ করেননি। যদিও আমায় যেকোনো মুহূর্তে তুলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে, এরকম একটা আশঙ্কা দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাকে তাড়া ক'রে বেরিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার থাকাকালিন যেখানে ধরা পড়া এড়াতে প্রায়শই আমায় বিভিন্ন জায়গায় পালাতে হত, সেখানে কলকাতায় আমি আমার ঠাকুরদার বাড়িতে আমার কাকার সঙ্গে থাকতাম এই আশায় যে এটি পুলিশি অভিযানকে নিরস্ত করবে। আমার কাকা যেসময় মুখ্য সচিব ছিলেন তখন থেকে আমার ঘরে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের সঙ্গে একটি সরাসরি ফোন লাইন (যদিও অকেজো) ছিল। আমার নিষিদ্ধ মাওবাদী বিদ্রোহী বইপত্রগুলোকে লুকানোর কোন জায়গা না থাকায় আমি এটিকে পুলিশ ফোন লাইনের পাশের ক্যাবিনেটে তালাবদ্ধ ক'রে রেখেছিলাম কারণ আমি আমার আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করতে পারিনি যে এটি

কোথায় লুকিয়ে রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আমার একটাই আশা ছিল যে, আমাদের পরিবারের মর্যাদা পুলিশি অনুসন্ধানে বাধা দেবে। আমার গোটা শৈশব ভয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে কেটেছে, ফলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে আমি তাকেই আবার আমার মগজের দখল নিতে দিতে পারিনা। তাই আমি আমার যাবতীয় ভয়কে পিছনে ফেলে গবেষণায় মন দিই, কিন্তু দ্রুতই আমার এই বোধোদয় হয় যে নিরাপদে তদন্ত করার জন্য আমার স্থানীয় সাংস্কৃতিক জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, যা-কিনা আমার "বৈধ" গবেষণার সময় ছিল না।

আমি যখন একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সম্পাদক সুখরঞ্জন সেনগুপ্তের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম, যিনি মরিচঝাঁপিতে সাংবাদিকদের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিলেন, তখন একজন ব্যক্তি বিনা আমন্ত্রণে তাঁর বাড়িতে ঢুকে বসার ঘরে এসে বসেন এবং আমাদের কথোপকথন শুনতে থাকেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কথোপকথনটি ইংরেজিতে হচ্ছিল। ইংরেজীতেই মিঃ সেনগুপ্ত আমাকে বলেন যে, ওই ব্যক্তি একজন পুলিশ ইনফর্মার যিনি তাঁর উপর নজর রাখছেন। আমার সঙ্গে আসা আত্মীয়েরও এমনটাই সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বাংলার সঙ্গে আমার পারিবারিক যোগ থাকলেও বিদেশী লালন-পালনের কারণে এই বিষয়গুলোকে বোঝার মতো যথাযথ সূক্ষ্মতা আমার ছিলনা। আমার কাকা অবশ্য আমায় বলেছিলেন যে পুলিশ চাইলে নজরদারির জন্য এরকম খোঁচর নিয়োগ ক'রে থাকে। আমি স্পষ্টতই এই নিষিদ্ধ গবেষণা করার জন্য শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম না। গ্রামীণ গবেষণা কার্যত বাদ দিতে হয়েছিল কারণ একজন অধ্যাপক আমাকে সতর্ক করেছিলেন যে "প্রতিটি গ্রামেই কমিউনিস্টরা আছে" এবং সেখানে আমাদের কথাবার্তায় মরিচঝাঁপির কোনো উল্লেখ থাকলেই সেটি রিপোর্ট হয়ে যাবে।

যেহেতু তদন্তের সূত্রগুলি আমার নিজের পরিবারের সদস্যরা, যারা আইএএস অফিসার ছিলেন, তাদের কাছ থেকে পাওয়া, তাই আমার সবসময় মাথায় রাখতে হয়েছে কোন পরিস্থিতিতেই যেন তাদের নাম প্রকাশ না হয়ে পড়ে। উল্টোদিকে আমি পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের নাম প্রকাশ হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে আমি যাতে কোনভাবেই পুলিশের হাতে ধরা না পড়ি, তার ব্যবস্থা করতে তাঁরা বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তথ্যপাচারকারীদের প্রতি জ্যোতি বসুর পাহাড়প্রমাণ ঘৃণা এবং পুলিশ ইনফর্মারদের হত্যার প্রেক্ষিতে, এই তদন্ত আবিষ্কৃত হলে তার ফলাফল মারাত্মক হতে পারত। যেহেতু কেউই আমাকে এই ধরণের কাজ করার পরামর্শ দেয়নি তাই এমন কিছু যাতে না হয়, সেটা দেখা একান্তই আমার দায়িত্ব ছিল। সম্ভাব্য পরিণতির কথা মাথায় না রেখে কেউ এই ধরণের গবেষণা করবেন না। আমি এটি অক্সব্রিজ থেকে দেখেছি যে সুপারভাইজাররা এইজাতীয় গবেষণাকে খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলে সাধারণত আপত্তি ক'রে থাকেন। আমি যদি ধরা পড়ি বা যদি আমাকে হত্যা করা হয় তারা আমার ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাদের যাবতীয় সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারেন (মিশন ইম্পসিবল, টিভি সিরিজ)। ভারতে আমার তথ্যদাতারা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত আমার বইটিতে উৎস হিসাবে তাদের নাম দিতে অস্বীকার করেছেন, শুধু তাই নয়, আমার বইয়ের প্রস্তাবনার কোথাও তাদের নামোল্লেখ ক'রে তাদের সামান্য স্বীকৃতিটুকু দেওয়া হোক, এমনটাও চাননি। কেবলমাত্র আমার ডক্টরাল সুপারভাইজার জিওফ্রে হথর্নের কথা উল্লেখ করা গেছে, যেহেতু তিনি কেমব্রিজে নিরাপদ ছিলেন। তখনও পর্যন্ত এটা স্পষ্ট ছিল না যে, আমলাদের ক্ষমতা ছিল কিনা রাজনীতিবিদরা আমাকে নিয়ে যা করতে চান তা

করতে বাধা দেওয়ার।[115] রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত গ্যাংস্টাররা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং এক্ষেত্রে তারা হত্যা করার পথই অবলম্বন করবে এমন সম্ভাবনাই বেশি ছিল। সিপিএম পার্টির কয়েকজন নেতা, যারা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, একজন রাজ্যের মন্ত্রী এবং একজন এমপি হয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে এমন প্রমাণও ছিল যে তারা দুই ভাইকে হত্যা করে তাদের মাকে সেই রক্ত গিলে ফেলতে বাধ্য করেছিলেন, কিন্তু এ-ঘটনা প্রচার হওয়া সত্ত্বেও তাদের কখনও বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি।[116] মিডিয়া কভারেজ এক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কাজে আসেনি। এর বাইরে আরও অনেক গ্রামীণ মামলার জন্য এই প্রচারটুকুও ছিলনা। নিঃসন্দেহে আইনের ঊর্ধ্বে থাকার কিছু স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক সুবিধা ছিল, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ক্রমাগত খুন ও চাঁদাবাজি জনগণের মধ্যে নির্বাচনী সমর্থন ক্ষয় করে। মারিচঝাপির প্রতি দলের নেতৃত্ব অবিশ্বাস্যভাবে অদূরদর্শী ছিল, কিন্তু এটি একটি বৃহত্তর অক্ষমতার অংশ ছিল যা তাদেরকে কোনো সমাজতান্ত্রিক উত্তরণে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম ক'রে তুলেছিল। সত্যি বলতে, তাদের অনেক অনুসরণকারীই সংস্কারের নামে নিজেদের আখের গোছাতে বেশি আগ্রহী ছিল। এতকিছু সত্ত্বেও, বিদ্যায়তনিক মহল দিব্যি গজদন্ত মিনারে বসে "সুশাসন" সম্পর্কে তাদের তামাদি বক্তব্য প্রকাশ ক'রে যেতে থাকে।

অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস) অফিসার ও মানবাধিকার কর্মী, ইউএন বিশ্বাস, যিনি পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট-পরবর্তী সরকারে মন্ত্রী হয়েছিলেন, আমি যখন তাঁকে মরিচঝাঁপি সম্পর্কে ফোন করি, আমার এক ভাই (আইএএস অফিসার) আমাকে সতর্ক করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ফোন ট্যাপ করা হতে পারে। আইএএস অফিসার হিসেবে তিনি সে-সময় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগত সংস্কার করতে চলেছেন যা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শিশুদের একটি ভদ্রস্থ শিক্ষার বন্দোবস্ত করবে, এবং যদি ভারতের বাকি অংশে ও বিশ্বজুড়ে এর প্রতিলিপি করা গেলে বিশ্বের কোটি কোটি শিশু এর থেকে উপকৃত হবে। এই সংস্কার মোতাবেক শিক্ষকরা তাদের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বেতন পেতেন। যদি আমাকে বাঁচাতে তাঁর রাজনৈতিক পুঁজি ব্যবহার করতে হয় তবে এই সংস্কারগুলি বিপন্ন হতে পারে। শেষপর্যন্ত অবশ্য শিক্ষক ইউনিয়ন এবং দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের দ্বারা সংস্কারগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এরসঙ্গে মরিচঝাঁপির বিন্দুমাত্র সংযোগ ছিলনা। কিন্তু গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র তখনই আমার মনে প্রশ্ন উঠেছিল, আমি যা করছি, তা ঠিক হচ্ছে কিনা। আমি পরবর্তীতে এই শিক্ষা-সংস্কারটি ব্যর্থ হওয়া নিয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু একজন অ্যাকাডেমিক প্রকাশকও সেটি প্রকাশ করতে এগিয়ে না আসায় আমি সেটিকে ইন্টারনেটে সংরক্ষণ ক'রে রেখেছি।

আমাকে যখন একজন পুলিশ অফিসারের, যিনি মদ্যপ অবস্থায় বামপন্থী মহিলাদের নির্যাতন করার জন্য কুখ্যাত ছিলেন, সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, তখন আমি আবিষ্কার করি যে লোকটি মুখ্যমন্ত্রীর সবিশেষ ঘনিষ্ঠ। তাঁর অতীত এবং তার বর্তমান সংযোগের কথা মাথায় রেখে সাক্ষাৎকার ভালো না হলে আমি নির্যাতনের শিকার হতে পারি,

---

[115] দীপ হালদার আইএএস আমলাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করেছেন। দীপ হালদার, দ্য ন্যারেটিভ অফ ইলিউশন অ্যান্ড কনফ্লিক্ট, জানুয়ারি ১০, ২০২০।

[116] ডি বন্দ্যোপাধ্যায়, সেন্সাস অফ পলিটিকাল মার্ডারস্ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিউরিং সিপিআই-এম রুল, ১৯৭৭-২০০৯, মেইনস্ট্রিম, আগস্ট ১৪, ২০১০, সাঁইবাড়ি ইন্সিডেন্ট, উইকিপিডিয়া।

এই কথা ভেবে আমি তার সাক্ষাৎকার না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিলেন জ্যোতি বসু নিজেকে পুলিশ পোর্টফোলিও থেকে সরিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কেননা এটি অনিবার্যভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে ব্যক্তিগত সংযোগের অস্বস্তিকর প্রশ্নটি তুলে আনতে পারত। কিন্তু এসবই ছিল আকাশকুসুম কল্পনা। কমিউনিস্টরা কয়েক বছর আগে হাওড়ায় পুলিশ বিদ্রোহে ইন্ধন জুগিয়ে এমন কান্ড ক'রে যে তাকে নিয়ন্ত্রণে আনা শুধুমাত্র সেনাবাহিনীই পক্ষেই সম্ভব। বিদ্রোহীদের বরখাস্ত করা হয়েছিল কিন্তু কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসতেই তাদের পুনর্বহাল করা হয়।[117] পুলিশ ইউনিয়ন কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রিত ছিল, এবং প্রয়োজনে মরিচঝাঁপির মতোই তা আদালতের নির্দেশ অমান্য করতে পারত। জ্যোতি বসুর হাতে "রাষ্ট্রের জবরদস্তিমূলক যন্ত্র" নিজের কাছে রাখার উপযুক্ত কারণ ছিল।

যেহেতু আমি একজন বিদেশী লেখক বিদেশে বসবাস করছি, আমার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এক্ষেত্রে সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয়েছে। অদ্ভুতভাবে এই প্রতিশোধ এসেছে একজন পুলিশ-পন্ডিতের কাছ থেকে যিনি ভারতীয় কমিউনিজমের উপর একটি বইও লিখেছেন।[118] ২৪ পরগনা জেলা পুলিশ সুপার যিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে উচ্ছেদের নির্দেশ নিতে মুখোমুখি হয়েছিলেন, নিজের স্বীকারোক্তিতে, গণহত্যার বিষয়টি অস্বীকারে অন্যতম ভূমিকা নেন। তবে একজন প্রাক্তন উপাচার্য লেখকের বিরুদ্ধে হওয়া এই "অত্যাশ্চর্য প্ররোচনা"-র নিন্দা করেছেন, যার মাধ্যমে পুলিশ অফিসার, অমিয় কুমার সামন্ত লেখককে একজন 'অস্পৃশ্য বিদেশী' হিসাবে বাদ দিয়েছিলেন।[119] দলিতদের বিরুদ্ধে সাধারণ চলতি ধারণাগুলি, যেমন তাদের অসভ্য এবং অশুচি হিসাবে দেখা, এবং বিদেশীবিদ্বেষ অবশ্য অধিকাংশ ভারতীয়রই একটি সাধারণ দোষ।[120] এমন একটি সমালোচনায় যা বিদেশী এমনকি অনেক ভারতীয়ের কাছেও স্পষ্ট হবে না, ডঃ সামন্ত লেখককে "ভারতীয় বংশোদ্ভুত একজন কানাডিয়ান, এবং এখন বাংলাদেশে অবস্থিত বাগেরহাট, খুলনার একটি বড় জমির মালিক পরিবারের সন্তান" হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যার উদ্দেশ্য লেখকে সাধারণ দলিতদের প্রতিনিধি হিসাবে খন্ডন করা এবং জমিদার হিসাবে তাদের বিপ্রতীপ অবস্থানে রাখা। কিন্তু যে ইতিহাসকে উল্লেখ করা হয়নি, তা হল জমিদারের নায়েব জমিদখলের জন্য লেখকের প্রপিতামহকে হত্যা করেছিল এবং বড়ছেলে, তার মা ও চার ছোট ভাইকে (একজন মরণোত্তর)নিয়ে কলকাতার আপেক্ষিক নিরাপত্তায় পালিয়ে গিয়েছিল।[121] আমার পিতামহ দলিত হিসেবে ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে প্রথম হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[122] তিনি কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের মিশনারি অধ্যাপকদের দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন এবং ইন্টারভিউ কমিটির একজন

---

[117] তৎকালীন হাওড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুকুমার মল্লিক, আইসিএস, -এর সাক্ষাৎকার।

[118] অমিয় কুমার সামন্ত, লেফট এক্সট্রিমিস্ট মুভমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গলঃ অ্যান এক্সপেরিমেন্ট ইন আর্মড অ্যাগ্রারিয়ান স্ট্রাগল, ফার্মা কে এল এম, ১৯৮৪।

[119] এ কে বিশ্বাস, মেইন্সট্রিম, এপ্রিল ১৩, ২০১৩।

[120] স্ট্যালিন কে, "ইন্ডিয়া আন্টাচড্", তথ্যচিত্র, ইউটিউব।

[121] বরুণ মল্লিক, "এ সিক্রেট হিস্ট্রি অফ দ্য মল্লিক ফ্যামিলি", মিউজিয়াম অফ মেটেরিয়াল হিস্ট্রি, জুলাই ১৯, ২০২০। রস মল্লিক, "অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন অ্যান্ড এলিট ফর্মেশনঃ অ্যান আন্টাচেবল্ ফ্যামিলি হিস্ট্রি", এথণহিস্ট্রি, স্প্রিং, ১৯৯৭।

[122] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাস্ট, প্রোটেস্ট অ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়াঃ দ্য নমশূদ্রস্ অফ বেঙ্গল, ১৮৭২-১৯৪৭, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১, পৃ - ৭১।

ব্রাহ্মণ তাকে চাষবাস করতে যাওয়ার 'পরামর্শ' দিয়ে অপমান করার পরেও এই পদ পেয়েছিলেন। তিনি নিজের বেতনে পাঁচ ভাইকে ল স্কুলে পড়ান। উনিশ শতকে যে সম্পত্তি তাদের হাতছাড়া হয়েছে, তার আকার এমনকি তাঁর নিজের পরিবারের কাছেও অজানা, যদিও তাদের আসল পদবি থেকে জানা যায় যে তারা কৃষি শ্রমিক ছিলেন এবং সামাজিক কাঠামোর একেবারে নিচের সারিতে ছিল তাদের অবস্থান। পরিবারটি ১৯১২ সালে নমশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে[123] এবং বড় জেঠুরা, যারা ঔপনিবেশিক বাংলায় মন্ত্রী ছিলেন, তাদের হাত ধরে আধুনিক নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রবেশ করে। "এমনকি আম্বেদকর তাঁর নিজ রাজ্য মহারাষ্ট্র থেকে [গণপরিষদের জন্য] নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন বলে মনে করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে বাংলায় তার নমশূদ্র বন্ধুদের, প্রধানত মন্ডল এবং মল্লিকের উপর নির্ভর করেছিলেন।"[124] সর্দার প্যাটেল মল্লিককে গণপরিষদে কংগ্রেসের আসন দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কারণ এটি জমিদারদের দল ছিল। তিনি পাকিস্তানে গিয়েছিলেন কিন্তু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সম্মুখীন হলে ভারতে ফিরে আসেন।[125] এরপরে নমশূদ্ররা উভয় দেশেই নির্যাতিত সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়, ফলে, শাসকবর্গের কাছে সুইং ভোটার হিসেবেও তাদের প্রয়োজন ফুরোয়। আমার দুই কাকা ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে (ICS) একমাত্র দলিত,[126] যাদের মধ্যে একজন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব (শীর্ষ রাজ্য আমলা) ছিলেন, যে প্রসঙ্গটি ডক্টর সামন্ত যথেষ্ট নির্ভুলভাবেই পুনর্ব্যক্ত করেছেন, এই মন্তব্যের সঙ্গে যে "রস মল্লিকের বাবা অভিবাসী হয়ে অবশেষে কানাডায় বসতি স্থাপন করেন।" এইজাতীয় মন্তব্যগুলি নব্য-মধ্যবিত্ত দলিতদের তাদের জাতের একটি "ক্রিমি লেয়ার" হিসাবে প্রতিপন্ন করে এবং এই নবোত্থিত শ্রেণিকে তাদের নিজেদের জাতের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতাকে নস্যাৎ করতে চায়; এবং একইসঙ্গে উচ্চবর্ণের শাসকেরাই দলিতদের প্রয়োজন আরও ভালভাবে বোঝে, এইজাতীয় একটা ধারণাকে বিছিয়ে দিয়ে উচ্চবর্ণের এযাবৎ আধিপত্যকে কায়েম রাখতে চায়। এইজাতীয় ন্যারেটিভ জাতপাত সম্পর্কে বাংলা উদারমনস্ক, এই সাধারণ মিথ্যার হাতটিকেই আরও পোক্ত করে। ভারতের প্রথম অস্পৃশ্য মুখ্য সচিব থাকার মাধ্যমে দলিতরা কতই না মুক্তি পেয়েছে বলে দাবি করেছিল যে প্রেস, সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান যখন তাদের জাতিগত কুসংস্কারের সমালোচনা করেছিলেন, সেই একই প্রেস তাঁর নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে এবং এর বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ হয়েছিল।[127] যদিও তিনি রাজ্যের সিনিয়র আইসিএস অফিসার হিসেবে জগজীবন রামের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছিলেন, যিনি ঔপনিবেশিক সময় থেকে তার পরিবারকে চিনতেন, এবং রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে মধ্যস্থতা করেছিলেন। বামফ্রন্টের অধীনে প্রভাবশালী জাতের প্রচার অব্যাহত ছিল। প্রমাণস্বরূপ প্রাথমিক শিক্ষার মতো আপাতনিরীহ দপ্তরে মন্ত্রী হিসাবে একজন দলিতকে নিয়োগের জন্যও বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। জনসংখ্যার

---

[123] অমিয় কুমার সামন্ত, মধুময় পাল (সম্পাদিত), মরিচঝাঁপিঃ ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস, ২০০৯, জে এইচ ব্রুম্ফিল্ড, এলিট পলিটিক্স ইন এ প্লুরাল সোসাইটিঃ টুয়েন্টিথ্-সেঞ্চুরি বেঙ্গল, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬৮, পৃ - ১৫৮।

[124] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাস্ট, প্রোটেস্ট অ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়াঃ দ্য নমশূদ্রস্ অফ বেঙ্গল, ১৮৭২-১৯৪৭, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১, পৃ - ২০৪।

[125] এস কে মল্লিকের সাক্ষাৎকার।

[126] উইকিপিডিয়া, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (ব্রিটিশ ইন্ডিয়া)।

[127] এ কে বিশ্বাস, মেইনস্ট্রিম, এন্ড অফ মিস্ক্রল বাই কন্টেরিঃ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন পলিটিকাল ক্রস-রোড? জুন ২৮, ২০১৪।

২৩% হওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রিসভায় কোনও অস্পৃশ্য না থাকার জন্য তাদের সমালোচিত হতে হয়েছিল। ডক্টর সামন্ত, যিনি পুলিশ মহাপরিদর্শক (গোয়েন্দা) হিসাবে অবসর নেওয়ার পরে আইনের অধ্যাপক হয়েছিলেন, তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত বইটিতে লেখক তথ্যের জন্য কোনও জীবিত উৎস দেননি।[128] কিন্তু তাঁর পুলিশ বাহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত যে-সকল হত্যাকাণ্ড ও জনগণের ওপর নির্যাতন হয়েছিল, সেটিকে বিচার করলে এইজাতীয় মন্তব্যের কোন যৌক্তিকতা থাকেনা।[129] যেহেতু তিনি নিজে এসব অপরাধে অংশ নিয়েছিলেন, তাই তিনি আমার সূত্রগুলিকে প্রকাশ করার বিপদ সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানেতে পারেননি যে লেখকের দণ্ডকারণ্য শরণার্থী শিবিরে আত্মীয় রয়েছে। তাঁরা নিজেরা কখনো মরিচঝাঁপিতে যাননি, তবে যারা গেছিলেন, তাদের তাঁরা চিনতেন। উত্তর কানাডিয়ান ভারতীয় রিজার্ভেশনে বেড়ে ওঠার ফলে দারিদ্র্য কী জিনিস, আমি দেখেছি; কাজেই দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসরত আত্মীয়দের দেখে আমার বিচলিত হওয়ার কথা ছিলনা, কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি বিচলিত হয়েছি। ডক্টর সামন্ত যদিও উচ্চবর্ণের লেখকদের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র দলিত লেখকের ক্ষেত্রেই তাঁর পারিবারিক বর্ণের পটভূমি উন্মোচিত করেছিলেন। অমিতাভ ঘোষের সমালোচনায় তিনি লিখেছেন "মরিচঝাঁপিতে যে কোনও পুলিশি অ্যাকশন হয়নি, তা নিয়ে অমিতাভ খুব-একটা কিছু বুঝে উঠতে পারেনি", এবং তারপর বেশ কয়েক পৃষ্ঠা পরে ২৪ পরগনার পুলিশ সুপার হিসেবে উচ্ছেদে তাঁর নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনীর ভূমিকার বিবরণ দিয়েছেন। এই পরিমাণ দ্বন্দ্বকে কীভাবে লালন করা যায়, তা বোঝা কঠিন। অ্যাকাডেমিক ও মিডিয়ার বৃত্তটি উচ্চবর্ণ ও ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল বিদেশীদের একটি বৃত্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে একজন দলিত লেখকের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নটি একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।[130] পার্টি যদি লেখককে দলিত প্রশনটি নিয়ে অসম্মান করতে চায়, ডাঃ সামন্ত মরিচঝাঁপিতে তার ভূমিকার কারণে এটি করার জন্য সেরা ব্যক্তি ছিলেন না। ঘটনা হল এটি কার্যকরভাবে করার জন্য সিপিএমের মধ্যে কোন দলিত ছিলেননা। যদিও প্রমোদ দাশগুপ্ত দলিতদের একটি গোষ্ঠীকে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উন্নীত করেছিলেন, মরিচঝাঁপিতে দলীয় লাইন মেনে চলা তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুন্ন করেছিল। একবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং এর পৃষ্ঠপোষকতা হারিয়ে গেলে এদের সদস্যপদও বিপর্যস্ত হয়। সেই গোষ্ঠীর নেতা যদিও বলছেন যে আমাদের পরিবার দলিতদের কাছে "দেবতার মতো" ছিল, তবু মরিচঝাঁপির বিষয়ে পার্টি লাইন সম্পর্কে এমনকি ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় তারা ছিলেন অনড়। লেখক পূর্ববর্তী লেখায় কখনো ডঃ সামন্তের কথা উল্লেখ করেননি;

---

[128] অমিয় কুমার সামন্ত, মধুময় পাল (সম্পাদিত), মরিচঝাঁপিঃ ছিন্ন দেশ, ছিন্ন ইতিহাস, ২০০৯, জে এইচ ব্রুম্ফিল্ড, এলিট পলিটিক্স ইন এ প্লুরাল সোসাইটিঃ টুয়েন্টিথ্-সেঞ্চুরি বেঙ্গল, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৬৮, পৃ - ২৪৩।

[129] ভারতের 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' পুলিশ স্কোয়াড সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আমার বোন ড মনিকা শর্মা, মুখ্য উপদেষ্টা, ইউনিসেফ, -এর র‍্যাডিকাল ট্রান্সফর্মেশন লিডারশিপঃ স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন ফর চেঞ্জ এজেন্টস, ২০১৭, নর্থ আটলান্টিক বুকস্, বার্কলে, পৃ - ১৩০ দ্রষ্টব্য, আর 'ফিকশনাল' অ্যাকাউন্টের জন্য স্যায়ি কালাম (সুমিত মল্লিক, আইএএস, চিফ সেক্রেটারি, মহারাষ্ট্র-র ছদ্মনাম)-এর উপন্যাস "দ্য আনকাইন্ডেস্ট কাট" দ্রষতব্য। দরিদ্রদের ওপর কমিউনিস্ট সরকারের অত্যাচারের বিবরণ হিসেবে দয়াবতী রায়ের রুরাল পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়াঃ পলিটিকাল স্ট্র্যাটিফিকেশন অ্যান্ড গভর্নেন্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪, পৃ - ২২৪, ২২৯ দ্রষ্টব্য। একটি জাতীয় স্তরের পর্যালোচনা পেতে জেফ্রি জেটেলেম্যান ও স্বামীর ইয়াসিনের "হান্ড্রেডস অফ পুলিশ কিলিংস ইন ইন্ডিয়া, বাট নো মাস প্রোটেস্টস", নিউ ইয়র্ক টাইমস, আগস্ট ২০, ২০২০ দ্রষ্টব্য।

[130] অনিল চামাদিয়া, "মিনিং অফ বিয়িং এ দলিত ইন মিডিয়া", ফরোয়ার্ড প্রেস, জানুয়ারি ৭, ২০১৭।

কিন্তু পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগীয় তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ডঃ সামন্ত তাঁর দলিত পরিচয় খুঁজে পান এবং সিদ্ধান্ত নেন যে এই পরিচয়ের ভিত্তিতে – যা তিনি অন্য কারুর ক্ষেত্রে করেননি – লেখককে সমালোচনায় বিদ্ধ করবেন। বাংলার রাজ্যপালের মতে, তাঁরা একটি "অনুগত এবং সম্মানিত পরিবার"[131] ছিল, তাই ডঃ সামন্তের পুলিশ গোয়েন্দারা কোনো অপরাধ বা দুর্নীতির প্রমাণ আনতে ব্যর্থ হয়, যা তাকে আমাদের দলিত পরিচয়ের – যে পরিচয় নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং পরিবর্তন করতে পারি না – উল্লেখ করতে বাধ্য করে।

পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ায় সেই অর্থে কোন দলিত না থাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রকাশনার ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিয়ার ভাবনাচিন্তা ভারতীয় অভিজাতদের অনুরূপ হয়ে যায়। ভারতে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের "নেটিভ" হওয়ার সমস্যা হল যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় অভিজাতদের প্রতিফলিত করে, যেমনটি ঔপনিবেশিক আমলে প্রায়শই ঘটত। অল-বেঙ্গল নমশূদ্র অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনের কাছে এটি তুলে ধরেন, "এটি একাধিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ব্রিটিশ সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে এই দেশে বসবাসের কারণে, এবং জনগণের শুধুমাত্র একটি অংশের সংস্পর্শে এসে মানসিকভাবে সেই অল্প সংখ্যক লোক, যারা সামাজিক অভিজাতদের অবস্থানে রয়েছে, তাদের ধারণার বশবর্তী হয়।"[132] এই প্রভাব আজ ভারতীয় গবেষণায় অব্যাহত রয়েছে, ভারতীয় প্রবাসীরা এটিকে সমর্থন করছে। ব্রিটেনে উচ্চবর্ণের প্রবাসীরা একটি ধর্মীয় ছাড়ের জন্য লড়াই করে যাতে আইনের বাইরে বর্ণবৈষম্য চলতে পারে।[133] এটা এমন নয় যে ভারতে এর সমালোচনা নেই, তবে এটি কিছু নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা আরও বিরক্তিকর, কেননা তা বাস্তবতাকে আড়াল করে। এমনকি আমেরিকাতেও ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে এই বিকৃতিগুলি উপস্থিত ছিল যখন একজন অধ্যাপক, যিনি পরে প্রিন্সটনে একটি চেয়ার প্রফেসর হন, দাবি করেছিলেন যে বাংলায় এমনকি দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকেও "দলিতরা উচ্চবর্ণের সদস্যদের সাথে খেতে পারত", যা আমেরিকান দক্ষিণে কখনও বর্ণবৈষম্য ছিলনা বলার সমতুল্য।[134] প্রিন্সটনে আমেরিকা সম্পর্কে এমন একটি বিবৃতি কখনোই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে না, কিন্তু দলিতদের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞতা এমনই পর্যায়ের যে এই বক্তব্যকে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। সাইমন কমিশনের কাছে তাঁর সাক্ষ্যদানে, মুকুন্দবিহারী মল্লিক, যিনি পরে অবিভক্ত বাংলার ফজলুল হক সরকারের ঋণ, সহযোগিতা এবং গ্রামীণ ঋণের মন্ত্রী হয়েছিলেন, বলেছেন যে "হতাশাগ্রস্ত শ্রেণির শিশুদের স্কুল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আলাদা আসন দেওয়া হয়েছিল, এবং বাজেভাবে মারধর করা হয়েছিল... এই শিশুদের জন্য জল খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমি নিজেও আমার ছেলেবেলায় এমন অভিজ্ঞতা পেয়েছি। আমাদের

---

[131] স্যার টমাস রাদারফোর্ড, ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে গভর্নরের মন্ত্রীদের ওপরে ষাণ্মাসিক রিপোর্ট, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি (লন্ডন), ১১।

[132] মুকুন্দ বিহারী মল্লিক, ইন্ডিয়ান স্ট্যাচুটারি কমিশন [সাইমন কমিশন] : সিলেকশন্স ফ্রম মেমোরান্ডা অ্যান্ড ওরাল এভিডেন্স বাই নন-অফিশিয়ালস্ (পার্ট টু), ভলিউম ১৭, ১৯২৯, পুনঃপ্রকাশিত ১৯৮৮। দিল্লিঃ স্বাতী পাবলিকেশনস। পৃ - ৯৩-৯৪।

[133] "কাস্ট ইন গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড ইক্যুয়ালিটি লঃ এ পাবলিক কন্সাল্টেশান", গভর্নমেন্ট ইক্যুয়ালিটিজ অফিস, মার্চ ২০১৭।

[134] অতুল কোহলি, "ফ্রম এলিট অ্যাক্টিভিজম টু ডেমোক্রেটিক কনসোলিডেশনঃ দ্য রাইস অফ রিফর্ম কমিউনিজম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", ফ্রান্সিন আর ফ্র্যাঙ্কেল ও এম এস এ রাও সম্পাদিত ডমিন্যান্স অ্যান্ড স্টেট পাওয়ার ইন মডার্ন ইন্ডিয়া, ভলিউম টু, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃ - ৩৯৫।

সেই ঘরের বাইরে অপেক্ষা করতে হবে যেখানে জল রাখা হয় যতক্ষণ না কোনও বর্ণ-হিন্দু বন্ধু এসে আমাদের হাতে জল দেয়।"[135] বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে এই ধরনের তথ্য না পাওয়ার জন্য কোন্ ধরণের সামাজিক গন্ডীগুলোর মধ্যে ঘুরতে হবে, তা সহজেই অনুমেয়। অক্সফোর্ডের একজন স্নাতক ছাত্র সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়ে অধ্যাপক কোহলির কাছে একই রকম দাবি করেছিলেন। তাকে অন্য একজন ছাত্র সংশোধন করে। কিন্তু এটি দেখিয়েছিল যে কীভাবে কলকাতার জীবনযাপনে অভ্যস্ত একজনের পক্ষে শহরের বাইরের মৌলিক জীবনযাপনের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা সম্ভব। এটি মানবাধিকার সম্পর্কে অভিজাতদের অজ্ঞতা এবং উদ্বেগের অভাবকে প্রতিফলিত করে যা মিডিয়া ও সমাজে প্রতিফলিত হয়। যখন আমি গ্রামীণ ভারতে উচ্চবর্ণের সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যবহার করার জন্য পাস করি, তখন আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হত, ধরা পড়ে গেলে আমাকে মারধর করা হবে বা আরও খারাপ কিছু হবে। বর্ণবাদের অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকার তুলনায় গ্রামীণ ভারতে পরিস্থিতি আরও খারাপ, কারণ আমি সেখানে বর্ণবাদবিরোধী সংগ্রামের সময় ভ্রমণ করে দেখেছি, যদিও বর্ণবাদ অনেক বেশি প্রতিকূল প্রচার পেয়েছিল। বর্ণবৈষম্যের যুগে দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন ছিল অন্যায় আইনের উপর ভিত্তি ক'রে, কিন্তু ভারতে প্রভাবশালী জাতিরা দলিতদের জন্য আরও বিপজ্জনক। ফারাক হল এই যে বর্ণবাদী আইন রাতারাতি বিলুপ্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে ভারতীয় মনোভাব পরিবর্তন হতে কয়েক প্রজন্ম লাগবে যদি তারা আদৌ পরিবর্তন হয়।

ভারতে এবং বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই সবচেয়ে কার্যকর সমালোচনা এসেছে ভারত-বিশেষজ্ঞ অন্য একজন বিদেশী পণ্ডিতের কাছ থেকে, যিনি সিপিএমের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলিতে তিনি লিখেছেন আমি একজন মাওবাদী। বিদেশে এটি তাঁর চাকরির সম্ভাবনাকে বিপন্ন করে, অবশ্য হতে পারে এটাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। যেহেতু মাওবাদীরা সরকারের সঙ্গে গেরিলাযুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং উভয় পক্ষই একে অপরকে নির্যাতন ও মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল, এই ধরনের অভিযোগ আমার কাছে আসতে পারে। এমন একটি ব্যবস্থায় যেখানে সন্দেহভাজনদের জন্য একমাত্র সুরক্ষা তাদের সংযোগ, যদি তাদের কাছে থাকে, এই ধরনের মিথ্যা বিপজ্জনক অভিযোগ করা উচিত নয়। এটি হোক বা আমার মানবাধিকার লেখার জন্য, আমি অভিবাসনকালে ভারত সরকারের কম্পিউটারে পেয়েছিলাম, এবং তখনই মুক্তি পেয়েছি যখন আমার দেখা সবচেয়ে বড় বইটিতে দৃশ্যত কিছুই পাওয়া যায়নি, যেটি সম্ভবত আরও নিরাপদ এবং নিশ্চিত ছিল, আমাকে থার্ড ডিগ্রির হাত থেকে রেহাই দিয়েছিল। পূর্ববর্তী আগমনে আমার সাথে বিমান থেকে ঠিক S.K. এর সাথে দেখা হয়েছিল। মল্লিক আইসিএস, এবং এটি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন না। যেহেতু আমি এখন একা ছিলাম এবং প্রমাণ ছাড়াই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতাম, যা আমার সংযোগগুলিকে নিষ্পত্তি করার সর্বোত্তম উপায় ছিল, আমি ভাবিত ছিলাম যে আমি পরের বার ভাগ্যবান হব কিনা। আমার চেয়ে অনেক কম 'অপরাধওপর জন্য অনেককে নির্যাতন করা হয়েছে এবং হত্যা করা হয়েছে। একটি বিশিষ্ট দলিত পরিবার থেকে আগত যার জাত পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের ২৩% গঠন করে এবং একজন বিদেশী স্কলার হিসাবে যে কোনও আটক আমাকে স্তালিনবাদীদের জন্য একটি "আঠালো পণ্য" (ড. ঝিভাগো, ফিল্ম) হিসেবে তুলে আনতে পারে, তাই হত্যা তাদের সেরা বিকল্প বলে মনে হতে পারে। তাদের জায়গায়

[135] সাইমন কমিশন, ১৯২৯, ভলিউম ১৭, পৃ - ৯৮।

আমি এটিকে সমর্থন করতাম কারণ স্বাভাবিক সহযোগিতা এবং ভয় দেখানো আমার পক্ষে কাজ করবে না, তাই একটি হত্যা যা দলীয় রাষ্ট্রের জন্য অনুপস্থিত ছিল সবচেয়ে ভাল। তাই পরবর্তী ও শেষ সফরে আমি আমার স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আমি আমার ব্রিটিশ পাসপোর্টকে একটি আংশিক ভিন্ন নামে ব্যবহার করতে পছন্দ করতাম যা আমাকে সনাক্তকরণ এড়াতে সক্ষম করত, কিন্তু এটি আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করত যে আমি ভাল ছিলাম না এবং আমাকে সঙ্গ দিতে অস্বীকার করেছিল তাই আমি আমার কানাডিয়ান পাসপোর্ট ব্যবহার করেছি। যদি আমাকে হেফাজতে নেওয়া হয় তবে আমি আমার স্ত্রীকে বলব কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, যা আশা করি কর্মকর্তাদের ভয় দেখাবে এবং তাদের আমার সঙ্গে কিছু 'করতে' নিরস্ত করবে। যাইহোক, বাচ্চারা এতটাই বিঘ্নিত ছিল যে আমাদেরকে সারির সামনে রাখা হয়েছিল এবং ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের পথে নিয়ে যেতে এতই আগ্রহী ছিলেন যে তিনি তার কম্পিউটারটি পড়েননি। এটি একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত ছিল যে আমাদের শিশুরা অটিস্টিক ছিল, আমার ভ্রমণ এবং কর্মজীবনের সম্ভাবনার অবসান ঘটিয়েছে কারণ শিশুরা আরও হিংসাত্মক এবং কঠিন হয়ে উঠছিল, ফলে ভারতে ফিরে আসা বা অন্য কোথাও যাওয়া অসম্ভব। আমাদের মেয়ে আমাদের সাথে থাকত। আমার মায়ের সঙ্গে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে, আমার স্ত্রী আমাদের মেয়ের সঙ্গে একা থাকতে খুব ভয় পেয়েছিলেন তাই আমি তার সাথে আটকে ছিলাম, যদিও এটি শুধুমাত্র অনিবার্য প্রাতিষ্ঠানিককরণ স্থগিত করেছিল যখন আমি তার দেখাশোনা করার জন্য খুব অসুস্থ হয়ে পড়ব। সবচেয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এটিকে একটি ব্যক্তিগত শাহাদাত মিশনের অনুরূপ হিসাবে দেখা যে "এখানে কোন সুখী শেষ নেই" (দ্য আমেরিকান, টিভি সিরিজ, "স্যাক্রিফাইস ফর দ্য মাদারল্যান্ড" 01x06)। আমার দায়িত্ব এবং স্বাস্থ্যের কারণে গণহত্যার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট বিবরণ লেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না তাই আমাকে একটি ছোট বই লিখে কাজটি সারতে হয়েছিল, এবং আশা করি তরুণ প্রজন্ম ভবিষ্যতে এই দায়িত্ব নেবে। সম্ভবত হত্যাকাণ্ডের সময় প্রাপ্তবয়স্ক বেঁচে যাওয়া শেষ ব্যক্তিও আমার একই সময়ে মারা যাবে, ফলে আরও সরাসরি বিবরণ আর সম্ভব নয়। ঘটনাগুলো পুনর্গঠন করা তখন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর নির্ভর করবে। যাইহোক, এইগুলি সম্ভবত বিস্মৃত হবে যদি এগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কোন সমসাময়িক আন্দোলন না থাকে এবং এটি অনুকূল রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে যা বর্তমানে দাঁড়িয়ে হয়তো সঠিকভাবে অনুমান করা সম্ভব নয়। স্কুলের পাঠ্যসূচিতে গণহত্যার অন্তর্ভুক্তির জন্য চাপ দেওয়া যেতে পারে তবে এটি প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে কারণ এটি প্রভাবশালী অভিজাতদের অস্বস্তিতে ফেলবে।

যে লেখকদের কাউকেই নির্যাতন বা হত্যা করা হয়নি তাদের দেখে বোঝা যায় যে তাদের হয়তো সরকারের কাছ থেকে ভয় পাওয়ার কারণ খুব-একটা ছিলনা। এমনটা হলে অবশ্য বাঙালি বুদ্ধিজীবী শ্রেণির নীরবতা নেহাত কম অজুহাত হয়। কিন্তু তারা উভয়তই এটা পারেনি এবং বিশ্বাসযোগ্যতা খুইয়েছিল। ভয়, মতাদর্শ বা স্বার্থ, যাই হোক না কেন, বুদ্ধিজীবীদের তিনদশক ব্যাপী নীরবতা ছিল পাথরের মতো শীতল। এই শিক্ষাবিদদের মধ্যে কয়েকজনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ছিল, অন্যরা বিদেশী চাকরিতে ছিলেন, কিন্তু সবাই চুপচাপ থাকার ক্ষেত্রে সকলে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শেষপর্যন্ত

বিদেশীরা একাডেমিয়ায় এই গণহত্যার কথা প্রকাশ করেছিল, এটা মোটেও ‘কাবাব’ বুদ্ধিজীবীদের "প্রগতিশীলতা" সম্পর্কে ভাল বার্তা দেয়না।

জাতীয় এবং এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই নিবন্ধটির সংস্করণ পাঠানোর সময় প্রতিক্রিয়া পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রায় পূর্ণ নীরবতা হয় ভণ্ডামি নয়তো তাদের গভীর ভয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের কেউ কেউ ‘ওকালতি’ ক’রে নিজেদের খ্যাতি আংশিকভাবে তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তাদের সংযোগগুলি, যা প্রকাশনাকে সহজতর করতে পারে তা দেওয়া হয়নি। অন্তত পক্ষে এটি দলিত মানবাধিকারের প্রতি আগ্রহের অভাবকে নির্দেশ করে যা জনমত নির্মাতাদের নীরবতার মধ্যে দিয়ে চলমান নৃশংসতা ও অজ্ঞতাকে বোধগম্য ক’রে তোলে। যেখানে প্রতিটি গোষ্ঠী কেবল তাদের নিজেদের মধ্যেই হিংসায় মত্ত, সেখানে প্রভাব এবং অর্থই বিচার করে ন্যায় মিলবে কিনা।

প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের মধ্যে সামান্য কয়েকটা ব্যতিক্রম ছাড়া, সকলেই তারা যে বর্ণ-শ্রেণি থেকে এসেছেন তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু তা মেনে নিলেও এরা এমন তথ্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকে বাদ দেয় যা তাদের মতামতকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, ফলে তাদের অবস্থান শেষমেশ প্রতারণার দিকে নিয়ে যায়। জাত হল সবচেয়ে শোষণমূলক, নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা যা আজ পর্যন্ত এত বড় পরিসরে বিদ্যমান মানুষের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য পাঠ থেকে আপনি কখনই তা বুঝতে পারবেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় যে এইভাবে বাস করে, তা মিডিয়া বা জাতির অ্যাকাডেমিক উপস্থাপনা থেকে স্পষ্ট ছিল না। ঘটনার ব্যাপকতা আর রাজনৈতিক সংযোগের কথা বাদ দিলে ঘটনা হিসেবে মরিচঝাঁপি খুব-একটা ব্যাতিক্রমী কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলি ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং ভারতে ও বিদেশের কপট বুদ্ধিজীবীদের একটি মোটামুটি আদর্শ উদাহরণ। দলিতদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বড়জোর মাত্র এক-দশমাংশ নথিভুক্ত করা হয়েছে, অসম্পূর্ণ তথ্য থাকা সত্ত্বেও মরিচঝাঁপি সম্ভবত সবচেয়ে নথিভুক্ত এবং প্রচারিত নৃশংসতা ছিল। কয়েকটি অ্যাকাডেমিক জার্নাল ডকুমেন্টেশনের অভাবের জন্য এই নিবন্ধটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কিন্তু তেমনটা ধরলে দলিতদের বিরুদ্ধে সমস্ত মানবাধিকার লেখাই অ্যাকাডেমিয়ায় প্রকাশের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

কমিউনিস্টদের পতন

শেষ অবধি হত্যা-সম্পর্কে রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হলেও কোনোটাই খুব-একটা প্রভাব ফেলতে পারেনি। রিপোর্টগুলো তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন বিরোধীরা সেগুলিকে সরকারের বিরুদ্ধে জনসমাবেশ সংগঠিত করতে এবং মরিচঝাঁপিতে দলিতদের ওপরে ঘটা সরকারি অত্যাচারের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে। মরিচঝাঁপি কান্ডের ওপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র নির্বাচনী প্রচার ও টেলিভিশনে দেখানো হয়, ইন্টারনেটে এই সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো ছড়িয়ে পড়ে, এবং এর ফলস্বরূপ মরিচঝাঁপির স্মৃতি পুনরায় জনমানসে ফিরে আসে। বামপন্থা এ-সময় পাঁকে পড়লে হত্যাকান্ড সংক্রান্ত লেখাপত্র আবার মূলধারার মিডিয়ায় ফিরে আসতে থাকে। এইসব লেখার অধিকাংশই পূর্বের বিভিন্ন কাজের ভিত্তিতে নির্মিত হলেও এগুলোতে বেশকিছু ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা নতুন ক'রে যুক্ত হয়। পূর্বে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুযোগ খুব বেশি ছিলনা; তবে কমিউনিজমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এ-বিষয়ক বাধার অধিকাংশই অপসারিত হয়েছে। তবে, এখন যাঁরা হত্যার অনুপুঙ্খ বর্ণনাগুলোকে সামনে নিয়ে আসছেন, তাঁরা আগে, যখন এরজন্য দায়ী রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার চাওয়া সম্ভব ছিল, সে-সময় কেন চুপ ক'রে ছিলেন, সেটা অবশ্য খুব-একটা পরিষ্কার নয়। "বাম নেতাদের প্রতি বিশ্বাস, যারা একদা এদের বাংলায় পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাদের সেই সাহসী প্রচেষ্টা অচিরেই মরিচঝাঁপির কর্দমাক্ত প্রান্তরে হতাশা আর মৃত্যুতে পর্যবসিত হল। এক দীর্ঘ পরিকল্পিত নীরবতার পর সেই ইতিহাস তার বিষাদময় বর্ণনা সমেত সবেমাত্র আলোয় আসতে শুরু করেছে।"[136]

বহুল প্রচারিত কয়েকটি সংবাদপত্র এ-সময় বেঁচে ফেরা মানুষদের স্মৃতিরোমন্থনের ভিত্তিতে বেশকিছু রিপোর্ট তৈরি করে। অবশ্য এই রিপোর্টগুলির অধিকাংশই ছিল কাহিনীনির্ভর। দ্য হিন্দুস্তান টাইমস্ এমন একজন মহিলার সাক্ষাৎকার নেয় যিনি তাঁর নিজের প্রথম তিন সন্তানকে দন্ডকারণ্যে এবং শেষ তিন সন্তানকে মরিচঝাঁপিতে হারিয়েছেন।[137] একজন রিপোর্টার-সহ যেকোনো মানুষের পক্ষেই এইজাতীয় ক্ষতির পরিমাপ করা সাধ্যের অতীত। এই রিপোর্টগুলি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, মরিচঝাঁপিতে বিপুল পরিমাণ শিশু ক্ষুধা ও রোগভোগে মারা গিয়েছিল; অন্যদিকে গুলিতে প্রাণ দেওয়া মানুষের অধিকাংশই ছিলেন সাবালক।

এই কাহিনীগুলোকে ফিরিয়ে আনা আদতে এলিটশ্রেণির নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণ জনতাকে সংঘবদ্ধ করার চিরায়ত ছকের একটি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিউনিস্টদের ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষেত্রে ২৩% দলিত ভোট ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দলিত ভোটকে করায়ত্ত করা এলিট পার্টিগুলোর কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ইলেকশন কমিশনের কিছু সক্রিয় পদক্ষেপের আগে অবধি দেশের অন্যান্য প্রধান পার্টিগুলোর মতোই কমিউনিস্টরা

---

[136] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, "কাস্ট, প্রোটেস্ট, অ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়াঃ দ্য নমশূদ্রস অফ বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৪৭", অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১, পৃ - ২৭৪।

[137] স্নিগ্ধেন্দু ভট্টাচার্য, "ঘোস্ট অফ মরিচঝাঁপি রিটার্নস টু হান্ট", হিন্দুস্তান টাইমস্, এপ্রিল ২৫, ২০১১।

কখনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, কখনো ভীতি প্রদর্শন, কখনো বা রিগিংয়ের মাধ্যমে এই ভোটকে সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল।[138]

কমিউনিস্টরা তাদের গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্কের ওপর ভিত্তি ক'রেই চৌত্রিশ বছর ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। প্রথমেই তারা গ্রামসভাগুলি, যেগুলি ঘটনাচক্রে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান-সহ আরও নানান প্রকল্পে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে, সেগুলির ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। এরজন্য উপভোক্তাদের অধিকাংশেরই ক্ষমতাসীন পার্টির সক্রিয় অনুগামী হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যেহেতু এই গ্রামসভাগুলি মোটের ওপর চিরাচরিত এলিট গোষ্ঠীগুলিরই দখলে ছিল, তাই এলিটরা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের কিছু ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতাকে মিলিয়ে গ্রামস্তর থেকে একেবারে ক্যাবিনেট অবধি নিরবিচ্ছিন্ন এলিট-আধিপত্য তৈরি করে।[139] "১৯৮০ নাগাদ যখন তাদের রাজনৈতিক জয় হাসিল হয়, উচ্চ ও মধ্যবর্ণের আধিপত্য তখনও অটুট থাকে। বস্তুত, শেষোক্ত অংশটাই বাম সরকারের প্রধান সামাজিক ভিত্তিতে পরিণত হয়। ১৯৯০-এর শুরু থেকে সংরক্ষণ নীতি বিষয়টিতে কিছুটা পরিবর্তন আনলেও আদতে গোটা দশকজুড়েই এই পরিবর্তন ছিল মূলতঃ আনুষ্ঠানিক।"[140] কমিউনিস্ট শাসনের যখন অবক্ষয় হতে থাকে, সে-সময় দয়াবতী রায়ের গ্রামভিত্তিক গবেষণাগুলি উপরি উপরি দলিত অংশগ্রহণের তলায় বাস্তবে সমাজে উচ্চবর্ণের চিরাচরিত আধিপত্যের আসল চিত্রটিকে তুলে ধরে।[141][142] ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্যের বিশালতাকে শুধুমাত্র ঘাটতি অর্থায়নের মাধ্যমেই

---

[138] আমি যতদূর জানি, ভারতে ভোটের রিগিং নিয়ে সেই অর্থে কোন বইতে সিস্টেমিক আলোচনা হয়নি, তবে এই নিয়ে বহু কথা ছড়িয়েছিটিয়ে আছে এদিকওদিক। কলকাতার এক যৌনকর্মী একবার তার আঙ্গুলটা আমায় দেখিয়েছিলেন। ভোটের কালি মুছতে সেখানে অ্যাসিড দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের হয়ে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের নানান বুথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বিনিময় তারা পেয়েছিলেন এক বাক্স চকোলেট, আর তা করতে অস্বীকার করলে জুটেছিল পতিতালয়ের মালিকের লাঠি। যদিও এই ভোটেও শেষরক্ষা হয়না এবং ইমার্জেন্সির পর লেফট ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস তাদের দিকে ভোট রিগিং-এর আঙুল তোলে।

[139] দয়াবতী রায়, রুরাল পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়াঃ পলিটিকাল স্ট্র্যাটিফিকেশন অ্যান্ড গভর্নেন্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪।

[140]মারিও প্রেয়ার, " দ্য সোশাল কন্টেক্সট অফ পলিটিক্স ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৪৭-৯২)" এলিজাবেট্টা বাসিল ও ঈশিতা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চেঞ্জিং আইডেন্টিটি অফ রুরাল ইন্ডিয়াঃ এ সোশিও হিস্টোরিক আনালিসিস গ্রন্থে, অ্যান্থেম প্রেস, নতুন দিল্লী, ২০০৯, পৃ- ২৮।

[141] দয়াবতী রায়, রুরাল পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়াঃ পলিটিকাল স্ট্র্যাটিফিকেশন অ্যান্ড গভর্নেন্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪।

[142] সাক্ষাৎকার সমূহ, এস পি মল্লিক, ভূমিসংস্কার আধিকারিক,পঞ্চায়েত সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বামফ্রন্ট সরকারের প্রথমদিকে যখন ভূমিসংস্কারকে নিয়ে অনেক প্রত্যাশা ছিল, গ্রামসংস্কারের মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন এস পি মল্লিক। তিনি অনেক কাজ এগিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি তেমন সাহায্য করতে রাজি হয়নি। যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে তাদের কাছে গ্রাম্য অঞ্চলে কোনো সংগঠন ছিলো না, সেই ব্যর্থতা ঢাকার জন্য তারা বিত্তশালী শ্রেণীর শরণাপন্ন হয়। তাত্ত্বিক ভাবে বহু শ্রেণীর একসঙ্গে আসার কথা বললেও আদতে সুবিধে হয় ধনী গ্রামবাসীদের যারা সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়। লেখককে এস পি মল্লিক ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনে একবার নিয়ে গেছিলেন যেখানে জেলাশাসকের অপরাহ্ন

পূরণ করা সম্ভব ছিল। তথাপি কেন্দ্রীয় সরকার দেউলিয়া হতে চলা এই রাজ্যে অর্থের জোগান অব্যাহত রাখে, কেননা, তাদের নিজেদের ক্ষমতা টিঁকিয়ে রাখার জন্য কমিউনিস্টদের সমর্থন লাভ করা জরুরি ছিল। কমিউনিস্টরা জানত যে তারা নিজেরা এতটাই বড় যে কোনো রকমের আশু পতনের সম্ভাবনা তাদের নেই। ফলে যে-সকল ভোটাররা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতেন বা শাসক দলকে চাঁদা দিতেননা, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রকল্প থেকে তাঁরা বঞ্চিত হতেন, মার খেতেন এবং সময়-সময় আরও ভয়ঙ্কর কিছু তাদের জন্য অপেক্ষা করত। কমিউনিস্ট শাসনকালে ৫৫,৪০৮ টি রাজনৈতিক হত্যা ও ৭২,৬০০ টি রাজনৈতিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, শাসকদলের কৃপায় যেগুলির বিরুদ্ধে শেষ অবধি কোনো অভিযোগ দায়ের হয়নি।[143] এত পরিমাণ খুন করা গেলে অতিরিক্ত আরেকটা খুন করতে বিশেষ কিছু যায় আসেনা (ওয়ানস্ আপন আ টাইম ইন দ্য ওয়েস্ট, ফিল্ম)। সমস্যা হল, যারা মার খেতেন কিংবা খুন হতেন আর সামাজিক কাঠামোয় যারা দলিত, তাঁরা আলাদা কেউ ছিলেননা। বস্তুত এই কূটাভাষটাই অত্যাচার সম্পর্কে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির নীরবতাকে বুঝতে সাহায্য করে। ফরাসী বিপ্লবে যত লোক গিলোটিনে প্রাণ দিয়েছিলেন, তার থেকেও বেশি মানুষকে এ-সময় হত্যা করা হয়; অথচ এই ঘটনাগুলো খুব অল্পই মিডিয়ার নজরে এসেছে। যেহেতু মূলতঃ সমাজের দরিদ্র মানুষেরাই এই অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন, তাই মিডিয়া বা অ্যাকাডেমিক মহল অবধি এদের কান্নার স্বর এসে পৌঁছত না। এটা কোনো শ্রেণিসংগ্রাম ছিলনা, বরং ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে শাসকদলের হেজেমনিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জমিদখলের লড়াই। পুঁজিপতি বা সমাজের কোনো বড় মাথাকে হত্যা না করে কমিউনিস্টরা অবশ্য অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন, কেননা তারা জানতেন এরফলে মিডিয়ায় তাদের নিজেদেরই বেকায়দায় পড়তে হবে। খারাপভাবে বলতে গেলে এ ছিল 'হত্যার যুক্তিতে পরিচালিত' (গডফাদার পার্ট থ্রি, ফিল্ম) এমন এক স্ট্যালিনতন্ত্র যা একাধারে অর্থগৃধ্নু এবং ব্যক্তিপরিসরে বারংবার হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নিজের শাসন কায়েম রাখে।[144] আর ভালো বলতে, এই ব্যবস্থা রাষ্ট্র-এলিট পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উঁচু থেকে একেবারে গ্রামস্তর অবধি কিছু প্রকল্প নেওয়া হয়; অবশ্য তা প্রকৃতপক্ষে কত শতাংশ দরিদ্রের কাছে পৌঁছয়, সেই সংখ্যাটা স্পষ্ট নয়। প্রতি বছরই যেহেতু দলিত ও আদিবাসীদের জন্য ধার্য অর্থের একটা বেশ বড় পরিমাণ ব্যয় হতনা, কমিউনিস্ট পার্টি তাই সেই অব্যবহৃত টাকাকে নিজের দলীয় স্বার্থ অনুযায়ী কোন্ খাতে ব্যবহার করাটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেই অনুযায়ী কাজে লাগাত। কমিউনিস্ট-পরবর্তী যুগেও দলিত ও আদিবাসীদের জন্য ধার্য টাকা অন্যত্র ব্যবহৃত হচ্ছে।

কমিউনিস্টদের ভোট পাওয়া-না-পাওয়া নির্ভর করত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার বদলে কত পরিমাণ গ্রামীণ এলিটকে তারা নিযুক্ত করতে পারছে তার ওপর। এই ব্যবস্থা ফলতঃ নিম্নবর্গের স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সংগঠিত আন্দোলনের পরিবর্তে তাদের ওপর এলিট শ্রেণির নিয়ন্ত্রণকেই আরও মজবুত করে। 'ভ্যানগার্ড' (অগ্রগামী) পার্টি মুষ্টিমেয় একদল নেতা, যারা পার্টির মধ্যেই 'ভিন্নভাবে ভাবে' এইরকম কয়েকজন নেতার বিরোধিতার সামনে যাবতীয়

বৈঠকে সরকারি আধিকারিকরা লেখকে গণহত্যার কথাটি জানান। আজ পর্যন্ত আমি জানি না, আমি হঠাৎ করে এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম না এটি আমার কপালে ছিলো।

[143] ডি বন্দ্যোপাধ্যায়, মেইন্সট্রিম, আগস্ট ১৪, ২০১০।

[144] বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪, পৃ - ১০৩।

নীতি গ্রহণ করে, তাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকে প্রত্যাশা করে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিগুলো আরও খুল্লমখুল্লা ব্যাবসায়ী-স্বার্থের অনুকূল হয়ে উঠতে শুরু করে। বাস্তবে অবশ্য বিষয়টা শুরু থেকেই তেমনই ছিল, কেননা, পুঁজি অন্যত্র চলে যেতে পারে এমন একটি আশঙ্কা তাদের কোনোরকমের সংঘাতময় শিল্পনীতি গ্রহণে বাধা দেয়। আর এদিক থেকে দলীয় নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত মরিচঝাঁপির মতো জন আন্দোলনগুলি ছিল সরকারের বিশেষ মাথাব্যথার কারণ।

তাদের শাসনকালে মরিচঝাঁপির মতো এত বড়মাপের হত্যাকান্ড আর ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু এমন ঘটনায় কমিউনিস্টরা কী করতে পারে, মরিচঝাঁপি তার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। পুঁজিপতিদের জন্য জমি অধিগ্রহণকল্পে কৃষিমজুরদের জমি থেকে উৎখাত করতে গিয়ে ১৮ টি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে ঠিকই, কিন্তু মরিচঝাঁপির তুলনায় এটা 'ছোটমাপের' ঘটনা ছিল। সুপ্রিমকোর্ট অবশ্য পরবর্তীকালে এই জমি অধিগ্রহণকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে, কিন্তু ততদিনে বাম সরকারের পতন হয়েছে। মরিচঝাঁপির ঘটনা সে-সময় জনমানসে তার প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি, তার কারণ প্রথমতঃ, দ্বীপটিতে যাওয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, দ্বিতীয়তঃ – আরও গুরুত্বপূর্ণও বটে – সে-সময়কার মিডিয়ার অবস্থাও এর জন্য দায়ী ছিল। সে-সময় রেডিও ও টেলিভিশন ছিল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রাক্-ইন্টারনেট দিনগুলিতে সংবাদপত্রের যদিওবা কিছুটা স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু তাদের মোটের ওপর একটা নিরক্ষর সমাজে কাজ করতে হত। পরবর্তীকালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে উৎখাত ও মৃত্যুর ঘটনাগুলো যখন ঘটে, তখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিন মাধ্যম, যেমন বেসরকারি সংবাদ চ্যানেল, ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই তথ্যগুলি ছড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির প্রশ্নে বামপন্থীরা পূর্বেই তাদের মর্যাদা খুইয়ে কিছুটা পিছনের সারিতে ছিল। এমনকী সোভিয়েত ব্লকের পতন বুদ্ধিজীবীদের ধাক্কা দিলেও বামেদের ভোটে কোন ফাটল ধরাতে পারেনি, কিন্তু শেষমেশ ঘরের সমস্যাই বামেদের পতন ডেকে আনে। তিয়েনানমেং স্কোয়ারের ঘটনায় ও উত্তর কোরিয়ায় বামেদের সমর্থন স্ট্যালিন-পরবর্তী যুগে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মকে বামপন্থীদের প্রতি কিছুটা নিষ্পৃহ ক'রে তুলেছিল। তাসত্ত্বেও বামপন্থীরা কীভাবে ভেবেছিল যে তাদের অনুসৃত পদ্ধতি তাদের নির্বাচনী ভিত্তিকে আরও সুদূরপ্রসারী করবে, তা সত্যিই একটা রহস্য। এটা সম্ভবতঃ সেই বিছে আর ব্যাঙের উপকথার মতো ঘটনা। প্রতি ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের হার তাদের আরও অস্তিত্বের সংকটে ঠেলে দিয়েছে এবং জাতীয় রাজনীতিতে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা থেকে তাদের বহুদূরে এনে ফেলেছে।

পরবর্তী ঘটনাক্রম

২০১১ সালের নির্বাচনী প্রচারে বিরোধীরা "মরিচঝাঁপিকে মনে রেখো" লেখা পোস্টার লাগিয়েছিল। কিন্তু সেই বছর ক্ষমতায় এসে নতুন সরকার গণহত্যার তদন্তের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী হিসাবে রেকর্ডকৃত মরিচঝাঁপি থেকে বেঁচে আসা ১০৪০টি পরিবারকেও সহায়তা দেওয়া হয়নি।[145] একজন দলিত মন্ত্রী যিনি তদন্তের পক্ষে ছিলেন তাকে মন্ত্রিসভার সহকর্মীরা অবরুদ্ধ করেছিলেন। "তিন দশক ধরে উচ্চবর্ণের স্মৃতির ল্যান্ডস্কেপে এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা নাগরিক সমাজের গঠন এবং অন্যদের উপর সুবিধাপ্রাপ্ত ভদ্রলোক শ্রেণির [ত্রিজাতি/কাবাব] স্মৃতির সম্পূর্ণ সম্মিলিত আধিপত্য নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। পার্টিশান-পরবর্তী স্মৃতি-নির্মাণ প্রকল্পে জাত নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ সেই তিন দশকে অ-দলিত [অস্পৃশ্য] লেখায় স্থান পায়নি – বাম শাসনের শুরুর দিকে মরিচঝাঁপি গণহত্যা অনেকাংশে নজরে পড়েনি, কিন্তু ওই আমলেরই শেষের দিকে মরিচঝাঁপির ঘটনা জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির কাছে প্রচারিত হয়। তখন কি ভদ্রলোক শ্রেণি নিজেদের অপছন্দের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ঘটনাটিকে আত্মসাৎ করেছিল?"[146] সরকার ক্ষমতাচ্যুত হলে নতুন শাসন ব্যবস্থায় বিষয়টি গুরুত্বের তালিকা থেকে বাদ পড়ে। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও ব্যাখ্যা করা হয়নি, তবে নতুন সরকারের এহেন আচরণের কারণগুলি অনুমান করা যেতে পারে। পুরানো সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনার চক্রীদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে পুলিশ পুরোনো সরকারের অংশ হয়ে গণহত্যা চালিয়েছিল তারাই এখন নতুন সরকারকে সমর্থন করেছে, সেইসঙ্গে ক্যাডাররাও দল পরিবর্তন করে থাকতে পারে। প্রাথমিকভাবে হয়তো এই সমস্যাগুলকে এড়ানো যেত, ২০১৬ সালে সরকারের পুনঃনির্বাচিত হয়ে ফিরে আসা তদন্তের সম্ভাবনায় জল ঢেলে দেয়। ২০১৭-য় একটি আপিলকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে মুখ্যমন্ত্রী ভুক্তভোগী বা তাদের খুনিদের চিহ্নিত করার চিন্তা না ক'রে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অবশ্য এইজাতীয় স্মরণে ন্যায়বিচার পাওয়ার পরিবর্তে কমিউনিস্ট বিরোধীদের বিব্রত করার উদ্দেশ্যটাই বেশি প্রকাশ পায়।[147] মুখ্যমন্ত্রীর এহেন স্মারক সমবেদনার অর্থ এই যে, কাউকে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে না। সরকারি নিষ্ক্রিয়তার কারণ সমাজের প্রকৃতি থেকে অনুমান করা যায়। ক্ষুদ্র ত্রিজাতিক রাজনৈতিক অভিজাতরা মতাদর্শ এবং দলীয় অনুষঙ্গ নির্বিশেষে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, তাই যেকোনো ধরণের ন্যায়বিচারই তাদের এই সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর হবে।

---

[145] ডেপুটি সেক্রেটারি, (উদ্বাস্তু, ত্রাণ এবং পুনর্বাসন বিভাগ, পশ্চিম্বঙ্গ সরকার)-কে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের চিঠি। বিষয় - 'ইনফর্মেশন অন রিফিউজিস ওয়ান্স লিভড্ অ্যাট মরিচঝাঁপি', রেফারেন্স নং - সি/৩৯০/এল অ্যান্ড এল আর ও রেফারেন্স নং - ১০৮৬, তাং - ২৯-০৫-২০১১ ও ১৫/০৭/২০১১।

[146] ঝুমা সেন, "রিকন্সট্রাক্টিং মরিচঝাঁপি", উর্বশী বুটালিয়া সম্পাদিত পার্টিশান দ্য লং শ্যাডো গ্রন্থে, পেঙ্গুইং ভাইকিং, ২০১৫, পৃ - ১২৩-৪।

[147] "মমতা গভর্নমেন্ট টু বিল্ড মেমোরিয়াল অ্যাট মরিচঝাঁপি হোয়্যার বেঙ্গলি রিফিউজিস ওয়্যার কিলড্ ইন লেফট রুল" নিউজম্যান, জুলাই ২৬, ২০১৮।

যদিও মনুর আইনে অস্পৃশ্য জাতিকে "মানবজাতির সর্বনিম্ন" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং উপনিষদগুলি বোঝায় যে তারা পশুদের চেয়ে নিচু,[148] তবুও তারা অন্যান্য অস্পৃশ্য বর্ণের তুলনায় একটি বড় সম্পদের ভিত্তি অর্জন করেছিল।[149] "ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলার চন্ডালদের [নমঃশূদ্রদের] কাজ মৃতদেহ ফেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না।"[150] এবং অন্যান্য পুরুষের পেশাও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক আমলে তারা জঙ্গল পরিষ্কার করেছিল এবং জমি অধিগ্রহণ করেছিল যা তাদের সাধারণভাবে অন্যান্য অস্পৃশ্যদের তুলনায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল।[151] তাদের বিশাল জনসংখ্যার আকার তাদের ঔপনিবেশিক যুগের শেষের দিকে রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে এতদিনকার ত্রিজাতিক অভিজাতদের আধিপত্যকে বাদ দিয়ে মুসলিমদের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করতে সক্ষম করে। "মুসলিম ও তফশিলী জাতির এই ঐক্যই উচ্চবর্ণ অধ্যুষিত কংগ্রেস পার্টির ১৯২৭ অবধি একাধিপত্যে চিড় ধরিয়ে তাকে কার্যকরভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়।"[152] এই ইতিহাস মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুদের সরকারকে অস্বীকার করার দক্ষতা এবং মনোভাব দিয়েছে এবং সরকারি সাহায্য ছাড়াই একটি সফল উন্নয়নশীল সম্প্রদায় হিসেবে গড়ে তুলেছে। তবে এই ইতিহাস যা এখনও জীবন্ত স্মৃতিতে রয়ে গেছে, এটি ত্রিজাতির অভিজাতদের অব্যাহত শাসনের জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি ছিল যারা স্বাধীনতার পর থেকে সরকার এবং বিরোধী উভয় ক্ষেত্রেই আধিপত্য বিস্তার করেছিল। অস্পৃশ্য এবং মুসলমানদের একটি জোট যদি বারবার তাদের খালি সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেয় এবং যদি ৮% জনজাতির সমর্থন এটিতে যোগ হয়, তাহলে সংখ্যাটা আরও বাড়বে।[153] যেহেতু বর্ণহিন্দুরা বিভিন্ন পার্টি

---

[148] আমি প্রথমে দলিতরাও যে মানুষ ও এটার ব্যাপারে লিখতে চাইনি কারণ এটি সবারই জানার কথা। কিন্তু বিজ্ঞান সভায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভারতীয়দের মানুষের মাথায় হাতির মাথা বসানোর গল্প শুনে মতামত পরিবর্তন করলাম। তাকে যে হাসতে হাসতে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি এবং যে সাংবাদিক এই ঘটনার কথা লিখেছিলেন তার বৈদেশিক পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়া হয়, সেটি দেখে বুঝেছিলাম এটি নিয়ে কিছু বলবার দরকার আছে। কুসংস্কারের ফলে অনেক ভারতীয় এই ধরনের কথা ভেবে থাকেন। আমার যেহেতু ভারতে ফেরার কোনো পরিকল্পনা ছিলো না, পাসপোর্ট কেড়ে নেওয়ার কোনো ভয় আমি পাইনি। শাস্ত্র নিয়ে বিতর্কে যাওয়ার মতো আমার পড়াশোনা নেই, কিন্তু বিজ্ঞান দিয়ে বিষয়টিকে বোঝা যায়। ডিএনএ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমজাতের মধ্যে অন্তর্বিবাহ খ্রীষ্টানযুগের পূর্ব থেকে ১০০ ক্রী:পূ: নাগাদ মনুস্মৃতি লেখার সময় থেকে শুরু হয়, তার আগেও বিভিন্ন জাত ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হতো। (প্রিয়া মুরজানি ও অন্যান্য, জেনেটিক এভিডেন্স ফর রিসেন্ট পপুলেশন মিক্সচার ইন ইন্ডিয়া, আমেরিকান জার্নাল অফ হিউম্যান জেনেটিক্স, সেপ্টেম্বর ৫, ২০১৩, খন্ড ৯৩, সংখ্যা ৩, পৃ: ৪২২-৪৩৮)। মানবজাতির বৈশিষ্ট অনুযায়ী দলিতদের সঙ্গে অন্যান্য জাতের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিলো। এবং অতি উন্নত জন্তুর পক্ষেও বোধহয় মনুস্মৃতি লেখা সম্ভব ছিলো না।

[149] নীলাঞ্জনা চ্যাটার্জি, মিডনাইটস্ আনওয়ান্টেড চিল্ড্রেন, পিএইচডি ডিসার্টেশান, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, ১৯৯২, পৃ - ৬৫।

[150] শিপ্রা মুখার্জি, "ইন অপোজিশন অ্যান্ড অ্যালিগেন্স টু হিন্দুইজমঃ এক্সপ্লোরিং দ্য বেঙ্গলি মতুয়া হেজিওগ্রাফি অফ হরিচাঁদ ঠাকুর", সাউথ এশিয়াঃ জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, ২৫ এপ্রিল, ২০১৮। DOI: 10.1080/00856401.2018.1445400.

[151] শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, "কাস্ট, প্রোটেস্ট, অ্যান্ড আইডেন্টিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়াঃ দ্য নমশূদ্রস অফ বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৪৭", অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১, পৃ - ২১-২২।

[152] অভিজিৎ দাশগুপ্ত, "ইন দ্য সিটাডেল অফ ভদ্রলোক পলিটিশিয়ান্সঃ দ্য শিডিউলড্ কাস্টস্ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল", জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান স্কুল অফ পলিটিকাল ইকনমি, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ - ২৪৫।

[153] ডেনিস ওয়াকার, "মতুয়া আন্টাচেবল্ রাইটার্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গলঃ বিটুইন ইসলাম অ্যান্ড ইন্ডিয়াজ' চেঞ্জিং আপার কাস্ট-লেড সিস্তেম", ইসলামিক স্টাডিজ ২৮ঃ৪, পৃ - ৫৮৬।

লাইনে বিভক্ত ছিল, সরকার গঠনের জন্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন ছিল তা ছিল এই সংখ্যার থেকে যথেষ্ট কম। এই তিনটি দল একসঙ্গে কাজ করতে পারলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারত। যদিও দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এটি ঘটতে বাধা দেয়, তবু এটি অ্যাকাডেমিক আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে।[154]

সরকারের একটি শক্তিশালী প্রণোদনা ছিল এমন কিছু তদন্ত না করার জন্য যা অস্পৃশ্য জাতিগত আবেগকে জাগিয়ে তুলবে যা মুসলিম ও উপজাতিদের সাথে সঠিক আসন সমন্বয় তাদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে এবং এর ফলে সংখ্যালঘুরা নিজেদের জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে ৭০ বছরে নিজেদের সুবিধার জন্য একচেটিয়া ক্ষমতা দখলকারী ৬% ত্রিজাতিদের সম্পর্কে সরকারকে খুব সতর্ক থাকতে হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতি ইতিমধ্যেই এই অভিজাতদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েছে কারণ তাদের ক্ষমতা বর্ণ-শ্রেণির পিরামিডের নিচের সারিতে চলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গেও এটিকে প্রতিরোধ করা যথেষ্ট কঠিন ছিল।

নির্বাচনী রাজনীতি কোন ছোট পরিণতি ছিল না। ঔপনিবেশিক যুগের শেষের দিকে ত্রিজাতিরা তাদের ক্ষমতা হারানোর কারণে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে তারা ভারত ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যদিও এরফলে পূর্ববাংলায় তাদের উল্লেখযোগ্য সম্পত্তির ক্ষতি হয়।[155] পার্টিশানের মাধ্যমে ক্ষমতা ফিরে পেলে তা সহজে ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এমনকি পার্টিশানের পরেও তারা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার মাত্র ৬% ছিল। নিজেদের জাতের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ভিত্তি নির্মার্ণের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা, বলাবাহুল্য, অতি নগণ্য। ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ যেমন গান্ধীবাদ এবং বিশেষ করে কমিউনিজম ধর্মনিরপেক্ষতা এবং নিম্ন শ্রেণীর দারিদ্র্য বিমোচনের আড়ালে তাদের শাসনের জাতপাতের সমীকরণটিকে লুকিয়ে রাখে। শাসন করতে গেলে নানান প্রাথমিক পরিচয়কে উপেক্ষা করতে হতো। তারা দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে যে শ্রেণিগত সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিল, সেটাকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল সর্বহারা ও কৃষকের ক্ষমতায়নের বাগাড়ম্বরের মধ্যে। তাদের লুকানো শ্রেণিস্বার্থের এই দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন সেক্রেটারির কোথায় উঠে এসেছিল, যিনি কমিউনিস্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেশি উদ্যোগী ছিলেন কিন্তু তাদের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছিলেন "শহুরে মধ্যবিত্ত অভিজাতদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যবিত্ত ফেটিসিজম। তাদের 'শ্রেণিবিহীন' হওয়ার সমস্ত অতিকথনের আড়ালে তাদের শ্রেণিস্বার্থে অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে।"[156] সামাজিক বাস্তবতা যাচাই করার পরিবর্তে বাগাড়ম্বরকে বিশ্বাস করতেন এমন বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদদের কোন শেষ ছিল না। যদিও এইজাতীয় তত্ত্ব কপচানো আসল সত্যিকে খুঁজে বের করার থেকে ঢের সহজ ছিল। সোভিয়েত যুগের একেকটি বাক্যাংশ ব্যবহার করতে গিয়ে এই "উপযোগী মূর্খরা" সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সর্বগ্রাসী বাম শাসনের সঙ্গে পশ্চিমের বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতা

---

[154] প্রস্কনভ সিংহরায়, "দলিত কোশ্চেন ইন দ্য আপকামিং ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি ইলেকশনস" একনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০১৬; শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়, "কাস্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ইন বেঙ্গল", ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি, নভেম্বর ৩, ২০১২। দ্বৈপায়ন সেন, "আন আবসেন্ট-মাইন্ডেড কাস্টিজম?", উদয় চন্দ্র, গেইয়ার হেয়ারস্টাড ও কেনেথ বো নিয়েলসেন সম্পাদিত দ্য পলিটিক্স অফ কাস্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রন্থে, রাটলেজ, ২০১৭, পৃ - ১১৮-১২০।

[155] জয়া চ্যাটার্জি, বেঙ্গল ডিভাইডেড, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪।

[156] দয়াবতী রায়ের রুরাল পলিটিক্স ইন ইন্ডিয়াতে উদ্ধৃত ডি বন্দ্যোপাধ্যায়, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৪, পৃ - ১৯১।

থেকে কোন শিক্ষা নেয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে তা খুঁজে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতেও ব্যর্থ হয়েছিল। সবচেয়ে খারাপ হল, তারা তাদের মতাদর্শকে বিবেকের সামনে এমনভাবে রেখেছিল যেন এটি ছিল বিশ্বাসযোগ্যতা এবং অজ্ঞতার প্রশ্নও। মানবাধিকার লঙ্ঘন ধামাচাপা দিয়ে, দীর্ঘমেয়াদে তারা বামপন্থীদের আদৌ কোন সুবিধে করেনি, এবং অবশেষে এটি উন্মোচিত হয়ে বামদের প্রত্যাবর্তনকে আরও কঠিন করে তোলে। পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিজমের পতনের পর তারা কোন স্বীকারোক্তি বা পুনঃমূল্যায়ন করেনি যে কীভাবে তারা এই ভুল্লুলো করেছিল; আর এখন তো সকলে অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রাজ্যের শাসকদের গণহত্যার তদন্তে অনিচ্ছার প্রেক্ষিতে এটি করার একমাত্র কর্তৃত্ব বর্তায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, যেটিকে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেওয়া থেকে বাধা দিতে পারেনি। গণহত্যার আগে প্রধানমন্ত্রী দেশাই রাজ্য সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও মরিচঝাঁপির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তিন সংসদ সদস্যের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন।[157] এটি প্রমাণ করার জন্য ছিল একমাত্র সরকারী প্রতিবেদন যদিও গণহত্যার আগে এটি কী ঘটবে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করতে পারেনি। গণহত্যার পর কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় তফসিলি জাতি ও উপজাতি কমিশন তার বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছে যে পশ্চিমবঙ্গে দলিতদের বিরুদ্ধে কোনো অত্যাচার হয়নি। তবে তাদের অভ্যন্তরীণ ফাইল পড়ে প্রমাণিত হয় যে কমিশন গণহত্যা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। এমনকি এটিতে ২৩৬ জনের নাম এবং বয়সসহ একটি আংশিক তালিকা রয়েছে যারা গণহত্যার আগে অনাহার, রোগ এবং পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল, সেইসঙ্গে এই বিষয়ে সরকারী চিঠিপত্র এবং প্রেস ক্লিপিংসও রয়েছে।[158]

---

[157] সাংসদ প্রসন্নভাই মেহতা, সাংসদ লক্ষ্মীনারায়ন পান্ডে, সাংসদ মঙ্গলদেব বিশারায়, "রিপোর্ট অন মরিচঝাঁপি অ্যাফেয়ার্স", এপ্রিল ১৮, ১৯৭৯।

[158] সাক্ষাৎকার, এস কে মল্লিক, আই সি এস, সদস্য, জাতীয় তফসিলি জাতি ও উপজাতি সংস্থা। যখন আমি আমার চাচার অফিসের কফি টেবিলে বসে মরিচঝাঁপির বিভিন্ন ফাইল থেকে নোট নিতাম, আমার চারপাশে অফিসের কাজ চলতো। একদিন একজন অভিযোগ করেন যে তিনি অনেকদিন অফিসে অপেক্ষা করছেন, তখন আমার চাচা আমাকে দেখিয়ে বলতেন তিনি একজন বিদেশিকেও অপেক্ষা করাচ্ছেন তাতে ওই ভদ্রলোক একটু সান্ত্বনা পেতেন। যতদিন আমার চাচার ক্ষমতা ছিলো, তিনি দেশ থেকে আসার ও ফেরত যাওয়ার সময় আমার সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে বলতে পারিনি আমার সন্তানরা অটিস্টিক কিন্তু তিনি তার উইলে তাদের পড়াশোনার জন্য অর্থও রেখে গেছিলেন। আমাকে কেবলমাত্র দিল্লির গৃহমন্ত্রক থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো আমার অনুমতি আছে কিনা এই গবেষণা করার জন্য। আমি সরাসরি অন্য কথা বলেছিলাম এবং একটি আইপিএস অফিসারের সঙ্গে থাকার কারণে বাড়তি প্রশ্ন কেউ করেনি। আমাকে অনেক কসরত করতে হতো অনুমতি আদায় করার জন্য বা অন্য কোনো বিষয়ের অজুহাত দিতে হতো। আমাকে একটা ঝুঁকি নিতে হতো। আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তাম তখন হয়তো মানবজাতির প্রতি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ছিল একজন শিক্ষকের অতিরিক্ত পড়া দেওয়ার প্রতিবাদ করা যেটি আমি আবার ভুল করে স্বীকার ও করে নিয়েছিলাম। আমি জানতাম এর জন্য যে পরিমাণ মার্ আমায় খেতে হবে, তাও আমি করেছিলাম। ঘটনাটি ছিলো আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার খসড়া স্মৃতিকথা তেও এর উল্লেখ আমি করেছি। আসল ঘটনা ছিলো আমার এই প্রতিবাদ পত্রকে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সবার সামনে ভর্ৎসনা করেন যেকোনো স্বৈরাচারীর মতো তার দাবি ছিল তিনি যা বলবেন সেটাই ঠিক। ওই ছোট বয়সে আমি বুঝেছিলাম এই দাবি কতটা হাস্যকর। সবাই যে আমার জন্য জমায়েত হয়েছিলো এতে আমার আরো শঙ্কা বেড়েছিলো। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় স্বীকারোক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এস কে মল্লিক যখন আসামে সরকারি সংস্থাগুলির দুর্নীতির তদন্ত করে দেওয়ার জন্য গেছিলেন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। একজন পুলিশ অফিসার রাত্রে

জাতীয় রাজনীতির কত শতাংশ গণহত্যা সম্পর্কে সচেতন ছিল তা জানা নেই, তবে কেউ কেউ অবশ্যই ছিলেন। অক্সফোর্ডে একটি স্নাতক সেমিনারে, সালমান খুরশিদ, যার পিতা কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, গণহত্যা সম্পর্কে আমার উপস্থাপনায় মন্তব্য করেছিলেন। পরে তিনি কমিউনিস্টদের জোটবদ্ধ কংগ্রেস সরকারে আইনমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। গান্ধীবাদী কংগ্রেস পার্টি এবং স্ট্যালিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ২০১৬ সালের নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে আসার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নাতি এবং ক্ষমতাসীন বিজেপির সাংসদ, প্রধানমন্ত্রী দেশাইয়ের জনতা পার্টি জোট সরকারের উত্তরসূরি, বরুণ গান্ধী লিখেছেন, "দশকের পর দশকের অসহায়ত্বের পর, উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপে চলে যায়। রাজ্য সরকার এদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করেছে, অর্থনৈতিকভাবে তাদের অবরুদ্ধ করেছে এবং এলোমেলো ভিত্তিতে পুলিশ গুলি চালিয়েছে।"[159] এই দুই প্রভাবশালী শাসক দল, যদিও সরাসরি গণহত্যার সাথে জড়িত ছিল না, তবু ঘটনাটির তদন্ত করার জন্যও কিছুই করেনি। কংগ্রেস শরণার্থীদের তৈরি করেছিল এবং বিজেপির অগ্রদূত জনসংঘ জনতা সরকার উচ্ছেদের জন্য সবুজ আলো দিয়েছিল। এটি ছিল সাধারণ কারণ ভারতের কোনো শাসক দল কখনোই গ্রামীণ দলিতদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেনি; বর্ণবৈষম্যের অবসানের পর, বিশ্বের শেষ বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যা হিসেবে তারাই পড়ে থেকেছে। বিচ্ছিন্নকরণের এই চেষ্টা রাজনৈতিক আত্মহত্যা হতে পারে যা ভারতীয় রাজনীতির প্রকৃত প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। সাহিত্যে এই ভারতীয় ব্যতিক্রমীতার বহিঃপ্রকাশ খুঁজে পাওয়া চ্যালেঞ্জিং হবে কারণ আমি এটিকে খুব কমই দেখেছি। যদিও একে বাদ দিয়ে দেশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত চিত্রায়ন করা সম্ভব নয়।

এই মনোভাব সরকার এবং ক্ষমতাসীন দলগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ইংরেজিভাষী মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পাঠকদের মধ্যে জনমত নির্ণয় করার জন্য, আমি ইন্টারনেটে পছন্দ-অপছন্দ পরিমাপ করতে গণহত্যা সম্পর্কে একটি মন্তব্য রেখেছি। "শুধু মাওবাদীরা এটা করে বলে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা সরকারকে অব্যাহতি

ওনার কাছে এসে বলেন তার কাছে ধরা পড়া চোরেরা তাদের অপরাধের কথা স্বীকার করে নিয়েছে, যেটি আমার চাচা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে জিজ্ঞেস করেন জিনিসগুলি পাওয়া গেছে কিনা। পরে তার এই মন্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাইলে উনি বলেন এই স্বীকারোক্তিগুলি জোর করে মারধর করে আদায় করা হয়েছে। একজন উচ্চস্তরের সরকারি অফিসারের এতো সহজ ভাবে পুলিশি অত্যাচারের কথা বললেন দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছিলাম। আমার চাচা অবশ্য আমাকে আশ্বাস দেওয়ার জন্য বললেন বিদেশিরা তাদের ভিসার সময়সীমার অতিরিক্ত থাকলেও তাদের উপর এরম করা হয় না। এই রকম মারধোর করার সমস্যা ছিলো এগুলো থেকে যে বয়ান পাওয়া যেত তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না যেকারণে অন্য পশ্চিমের দেশগুলিতে এটি তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি এটিকে বরাবর মধ্যযুগীয় বর্বরতা হিসেবে দেখে এসেছি যেটি কয়েকটি জায়গা বাদ দিয়ে সভ্য দেশে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের আগন্তুক হিসেবে আমার ভারতকে অত্যন্ত উগ্র লেগেছিলো। আমার চাচাকে বাঙালি হওয়ার জন্য মার খেতে ও প্রাণনাশের মুখোমুখি হতে চেয়েছিলো। আমি আমার দলিত বংশপরিচয় নিয়ে জানতে পারি আমার তুতোভায়ের কাছে, যে ভেবেছিলো আমি আগে থেকে জানতাম এ ব্যাপারে। আমার বাবা আমার মা কে বলেছিলেন তিনি একজন যোদ্ধা জাতের ছিলেন। পরে বাবা আমাকে বলেছিলেন তিনি ডঃ আম্বেদকরকে একবার রেলস্টেশন থেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। ডঃ আম্বেদকর তাকে মুগ্ধ করেছিলো কিন্তু তিনি আবশ্যিক কারণে নিজের পরিবারের থেকে বিষয়টি লুকিয়ে গেছিলেন। আমিও আমার পরিবারকে জানাইনি কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষদের সেই স্বাধীনতা থাকে না।

[159] ফিরোজ বরুণ গান্ধী, "দ্য স্টেট অফ দ্য স্টেটলেস", দ্য হিন্দু, নভেম্বর ২৫, ২০১৬।

দেয় না। যেমন ধরুন মরিচঝাঁপির গণহত্যা। সহিংস প্রতিরোধের সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই, কেননা, এটি নিরস্ত্র উদ্বাস্তুদের ওপর হয়েছিল। এটি সমস্ত প্রধান ক্ষমতাসীন দলগুলিকে এই আইনে বা এর পরবর্তী নানান বিষয়ে জড়িত করেছে। শিখ বিরোধী গণহত্যার ৯টি সরকারী তদন্ত হয়েছে কিন্তু দলিত উদ্বাস্তুরা এখনও এই বিষয়ে ফিল্ম, নিবন্ধ এবং বইপত্র থাকাসত্ত্বেও একটিও সরকারি তদন্ত পায়নি।"[160] এই মন্তব্যের অপছন্দের সংখ্যা 3 থেকে 1 দ্বারা লাইকের চেয়ে বেশি। একটি উন্নত গণতন্ত্রে তদন্ত করা হবে তা বিবেচনা করে, এই দৃষ্টিভঙ্গি এই শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ করে এবং জাতিগত পুনর্মিলন অর্জন করতে হলে যে খাদ অতিক্রম করতে হবে তা প্রকাশ করে।[161] এই প্রভাবশালী শ্রেণীটি যে

---

[160] আর কে ভিজ, "মাওইস্টস ইউস অফ আইইডিস রিভিলস দ্য ট্রু নেচার অফ দেয়ার প্রজেক্টস", ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মে ১৮, ২০১৬। শিখরা দলিত জনসংখ্যার ১/৯ ভাগ কিন্তু তাদের প্রতিপত্তি বহুগুণ বেশি। তারাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মারা যাওয়ার পর নিজেদের বাঁচাতে পারেনি। দিল্লিতে বাড়ির ঠিকানা মিলিয়ে তাদেরকে মারা হয়েছিলো। এস কে মল্লিক ও তার ছেলে তাদের বাড়িতে একটি শিখ পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং সেই উন্মত্ত দাঙ্গাবাজদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রতিবেশীদের চাপে এস কে মল্লিক পরে বাধ্য হন তাদেরকে সামরিক বিমানবন্দরে ছেড়ে আসতে। আশ্চর্যজনক ভাবে দাঙ্গার জন্য অভিযুক্ত একজন কংগ্রেস সাংসদ আমার আত্মীয়দের পরিচিত ছিলেন। সাংবাদিকরা তাকে শিখদের হত্যাকারী জমায়েতের মধ্যে দেখলেও নানাবতী কমিশনের কাছে তিনি দাবি করেছিলেন হিংসা থামাতে তিনি ওখানে ছিলেন। প্রমাণের অভাবে এই নেতা ছাড়া পেয়ে যান। তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কিন্তু বিন্দুমাত্র ভাবে বাধা পায়নি, পরে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। আর একজন আত্মীয় যিনি আক্রান্তদের বাঁচাতে গেছিলেন তাকে মনোবিদের কাছে যেতে হয়েছিলো।

[161] উন্নত গণতন্ত্রে অন্যদিকে এইরকম অন্যায় অত্যাচারের তদন্ত হয় ও দোষীদের শাস্তি পেতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ কানাডাতে সরকারের অর্থে চলা ক্রিষ্টান স্কুলগুলিতে যেখানে আমিও পড়েছিলাম, শারীরিক ও যৌন অত্যাচারের মাধ্যমে আদিবাসীদের সংস্কৃতি নির্মূল করে দেওয়া হয়েছিলো। সেটির জন্য একটি কমিশন বসানো হয়েছিলো, প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় সংসদের সামনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়েছিলো ও ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিলো। আমার স্কুলের একজন বন্ধু এই অত্যাচারের ঘটনা সবার সামনে আনার জন্য অর্ডার অফ কানাডা পেয়েছিলেন। আমি আদিবাসী সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ করলেও এই বিষয়ে লিখে উঠতে পারেনি। বিভিন্ন পরিসংখ্যান দেখে বোঝা যায় বেশিরভাগ ছাত্রের ভবিষ্যৎ খুবই বিপজ্জনক, আত্মহত্যা, মাদক অপব্যবহার নানারকম বিপদ তাদের সামনে। এই সমস্ত খরচ অনেকটা আবার আসে সরকারের সংরক্ষণ পরিকল্পনা থেকে। আমি এই বিষয়ে একটি বই লিখতে চেয়েছিলাম "প্যারাডাইস ডেস্ট্রয়েড" নাম দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন দায় দায়িত্বের কারণে আর পেরে উঠিনি। সরকারের পক্ষে সবদিকে নজর রাখা সম্ভব ছিলো না তারা যতটুকু পেরেছিলো করেছিলো। তারা আদিবাসীদের উপর হওয়া অন্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে ছুটির দিনও ঘোষণা করেছিলো। মরিচঝাঁপিতে এরম কিছুই হয়নি কিন্তু সরকার এটি করতে পারতো। আমি যখন আবাসিক স্কুলে থাকতাম সেখানে স্কুল থেকে পালানোর শাস্তি ছিলো "চেয়ারে বসিয়ে পশ্চাৎদেশে চাবুক মারা। অন্য ছেলেদের এই মার খাওয়া দেখানো হতো। এই সমস্ত অত্যাচার করার সময়, ছেলেদের যিনি পরিদর্শক ছিলেন, তিনি আমাদের বর্ণবৈষম্য মূলক গালিগালাজ করতেন। তার এই অশ্রাব্য অপমান সবসময় থাকতো আমাদের বাবা মায়ের সম্বন্ধে।" (ফ্লোরেন্স ক্যাফের এবং এডওয়ার্ড গ্যাম্বলিন, ব্যাক টু দ্য রেড রোড, ক্যাটলিন প্রেস, ২০১৪ পৃ: ৫৮)। অধ্যক্ষের অফিসের সামনে বাবা মার থেকে আলাদা হওয়া ৬ বছরের বাচ্চাদের কান্না ছিলো আমার আবাসিক স্কুলের প্রথম স্মৃতি। স্কুলে শাসনের যন্ত্রনা হয়তো অনেক কমে এসেছে, কিন্তু একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছিলো ৬০% কানাডাবাসী এই বিষয়টি মনে রাখতে চায়নি। আমি কিছুদিন আগে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একজন অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করি। ওনার মতামত ছিলো আদিবাসীদের একদম শেষ করে দেওয়া উচিত। আমি চুপ করে যাই , আমার কাছে কোনো উত্তর ছিলো না কিভাবে একজন গণহত্যা সমর্থকের সঙ্গে কথা বলবো। শহরে একটি গুজব শোনা যাচ্ছিলো যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ভাড়া করা খুনের দল ভূমিহীন আদিবাসীদের খুন করে বেড়াচ্ছে। আমি এটি বিশ্বাস করতে চাইনি কিন্তু এটি যে চতুর্দিকে শোনা যাচ্ছিলো সেটি একটি জাতি বিদ্বেষের পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল। ভেবে দেখতে গেলে ক্ষমতাহীন মানুষের ব্যক্তিগত স্তরে কাজ খুব একটা কিছু বদলাতে পারে না। স্কুলের যৌন নির্যাতনের ঘটনার ক্ষেত্রে এটি কিন্তু বদল আনতে পেরেছিলো। নির্যাতিত ছাত্রটি যিনি

বৈরীমনোভাবাপন্ন ছিল তা হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতায় অন্তর্নিহিত ঈশ্বর-নির্ধারিত বৈষম্যকে প্রতিফলিত করে যা ভারতের সমস্ত প্রধান ধর্মে বিস্তৃত। এটি এইভাবে লেখা হয়নি কারণ এটি ভারতের নিজস্ব ইমেজকে অপমান করে, তবে এই সংস্কৃতি এতটাই ব্যাপক যে এটি মানব উন্নয়নের সমস্ত দিককে প্রভাবিত করে। যথেষ্ট অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সত্ত্বেও যে ভারত দারিদ্র্য বিমোচনের বিভিন্ন পদক্ষেপে চীন এবং এমনকি বাংলাদেশের থেকেও পিছিয়ে রয়েছে এটি তার একটি কারণ।[162]

কমিউনিস্টদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গণহত্যা নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আবির্ভূত হয়েছে। তুষার ভট্টাচার্যের একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি হয়েছিল[163] এবং প্রখ্যাত লেখক অমিতাভ ঘোষ মরিচঝাঁপিকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন[164]। তবে বেশিরভাগই কেবল বাংলায় পাওয়া যায়। তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ, প্রায় ঐতিহাসিক বই বাংলা থেকে অন্য কোন ভাষায় অদ্যবধি অনুদিত হয়নি। একভাষী বাঙালি অ্যাক্টিভিস্টদের লেখা এই বইগুলি অধিকাংশ পেশাদার গবেষকদের 'অকেজো' গবেষণাকে লজ্জায় ফেলে দিতে পারে। সেসময় এক অমিতাভ ঘোষ ছাড়া, ইংরেজিভাষী বাঙালী শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীরা, যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে এই ঘটনাকে প্রকাশ করতে পারতেন, অ্যাক্টিভিস্টদের তুলনায় নির্যাতন বা হত্যার মতো বিষয় থেকে ঢের বেশি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও তারা চুপ ক'রে ছিলেন। গণহত্যা জাতীয় জনসাধারণের কল্পনাকেই স্পর্শ করতে পারেনি, তায় আন্তর্জাতিক পাঠকের কথা এহ বাহ্য। মাঝে মাঝে প্রকাশিত হওয়া অ্যাকাডেমিক এবং সংবাদপত্রের নিবন্ধগুলির কোনও বাস্তব গুরুত্ব ছিলনা। যাইহোক, কমিউনিস্টদের পরাজিত করার প্রচারে এর পুনরুত্থান রাজনৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অস্বীকারকারীদের একঘরে

প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তার অত্যাচারীকে সবার সামনে আনতে পেরেছিলেন ও অর্ডার অফ কানাডা পেয়েছিলেন, আমার বাবা ও আমাকে মনে রেখেছিলেন। আমি যদিও তাকে চিনতাম না কিন্তু আমরা ছিলাম ব্যতিক্রমী প্রতিবার তো আমি খুব একটা আশ্চর্য হইনি। আমার বাবা ছিলেন প্রাদেশিক স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান অস্ত্রোপ্রচার ছাড়া বাচ্চাদের তার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ কম। আমার বাবাকে প্রায় ৫ জন ডাক্তারের কাজ করতে হতো কারণ অন্যরা টাকার জন্য নিজেদের চেম্বার খুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আমি তখন বুঝতাম না কিন্তু মারণ রোগ নিয়ে আমার মায়ের বছরের পর বছর ধরে হাসপাতালে থাকা ও আমাদেরকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব তার উপর পড়ায় তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতেন। একজন আদিবাসী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাবা এই রকম অত্যাচারের বিষয়ে শুনেছিলেন কিনা যেটি উনি জানতেন না। অত্যাচারিত হওয়া ছাত্ররা যদি আমাকে আগে জানাতো আমি হয়তো ওনার সাহায্য নিয়ে এরম অন্যায়কে থামাতে পারতাম। যখন বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়, আবাসিক স্কুলগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার বদলে ছোটো ছোটো স্থানীয় স্কুল চালু করা হয়। আমাদের ছোটবেলায় কেউ ছিলো না যার সঙ্গে কথা বলে আমরা সমাধান কিছু পাবো সবকিছু নিজেকেই করতে হতো। আর একবার আমার সামনে সুযোগ এসেছিলো বড়ো কিছু করার মরিচঝাঁপি গণহত্যা সম্বন্ধে, যে বিষয়ে আমি লেখালেখি করে প্রচার করেছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি ভারতীয় সমাজে ও সরকারে দলিতদের নিয়ে এত অবজ্ঞা থাকবে এবং আমার লেখালেখি খুব একটা কাজে দেয়নি। আমি যদি না করতাম অন্য কেউ হয়তো পরে করতো। যখন এটি শেষপর্যন্ত বেড়োয়, সরকারের পতনে এটি সাহায্য করেছিল। এটি সরাসরি আমার অবদান ছিলো না। ধীরে ধীরে অনেকে এই বিষয়ে কাজ করলেও কমিউনিস্টদের পতনের জন্য এটি মূল কারণ ছিলো না।

[162] অমর্ত্য সেন, "হোয়াই ইজ দ্য পেনাল্টি অফ ইকনমি সো হাই ইন ইন্ডিয়া?", বক্তৃতা, ব্রাউন ইউনিভার্সিটি, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ য় প্রকাশিত, ইউটিউব।

[163] তুষার ভট্টাচার্য, "মরিচঝাঁপি ১৯৭৮-৭৯ঃ টরচার্ড হিউম্যানিটি", ভিমিও, ইউটিউব।

[164] অমিতাভ ঘোষ, দ্য হাংরি টাইড, রবি দয়াল পাবলিশার, ২০০৪।

করতে যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করেছিল। যদিও একটি সরকারী তদন্ত ছাড়াই, বিশদ বিবরণ নিয়ে বিতর্ক চলতে বাধ্য, তবে কেউই এর বিশ্বাসযোগ্যতাকে অস্বীকার করতে পারবে না।

এই গণহত্যা শেষ পর্যন্ত রাজ্যের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য তিনটি জাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। সমস্যাটি তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস পার্টি দলিত উদ্বাস্তুদের অবাঙালি রাজ্যে নির্বাসন দিয়ে তৈরি করেছিল, যেখানে তারা রাজনৈতিক হুমকি হবে না। কমিউনিস্টরা শেষ পর্যন্ত একই কাজ করেছিল মুদ্রার উল্টোপিঠে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার ফল হয়েছিল আরও মারাত্মক। এটি দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের বিষয়ে কমিউনিস্ট প্রচারের শূন্যতা প্রমাণ করে। "সত্যের" অধিকারী হিসাবে তারা তাদের ক্ষমতার বাস্তব বা কল্পিত সমস্ত হুমকি দূর করতে এবং একটি ক্ষুদ্র ত্রি-বর্ণ অভিজাতদের নিজেদের জন্য ক্ষমতা বজায় রাখতে হাজার বছর আগে বর্ণপ্রথার মাধ্যমে শুরু হওয়া তাদের পূর্বপুরুষদের মতো ধর্মীয় অনুশাসন, শোষণ ও নিপীড়নের মাধ্যমে শাসন করার অধিকারী বলে মনে করেছিল। "ভারতের ঐতিহ্যবাহী বর্ণপ্রথা ছিল সবচেয়ে বদ্ধ সমাজ হিসেবে পরিচিত"[165] এবং এর মাধ্যমে অভিজাত বর্ণের বংশধররা তাদের উত্তরাধিকারের সুবিধে ভোগ করতে থাকে।

সময়টা অবশ্য ত্রি-বর্ণ অভিজাতদের পক্ষে ছিল না। নির্বাচনী রাজনীতিতে যদি "জনসংখ্যা নিয়তি হয়" তবে ৬% অনির্দিষ্টকালের জন্য শাসন করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের দলিত জনসংখ্যা আজ জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশে উন্নীত হয়েছে। মুসলমানদের অনুরূপ বৃদ্ধি হয়েছে এবং এখন তফশিলি জাতির তুলনায় তাদের সংখ্যা সামান্য বেশি। এরা দুইয়ে মিললে রাজ্যে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু তফশিলি উপজাতিরা এদের সঙ্গে যোগ দিলে এবং তাদের মধ্যে আসন সমঝোতা হলে এই জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে, যা যে কোনও সরকারের পতন ঘটাতে পারে। ২০২১ সালের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন রাজনৈতিক কৌশলবিদ স্বীকার করেছেন, “বাম এবং তৃণমূল উভয়ই বিস্তৃতভাবে উচ্চ-বর্ণের নেতৃত্বাধীন দল ছিল এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির প্রতি নির্দিষ্ট, বা যথেষ্ট, মনোযোগ দেয়নি যেগুলি উল্লেখযোগ্য ভোট ব্যাংক। নমঃশূদ্র, রাজবংশী, বাগদি, বাউরি, এরকম অনেক দল আছে।”[166] একারণে সরকার মরিচঝাঁপির তদন্ত করে জাতপাতের অনুভূতি আর বাড়াতে চাইবে না। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে প্রভাবশালী এবং অধস্তন উভয় জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক সুবিধার জন্য বর্ণের ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী জাতিগুলি নির্বাচনী ভিত্তি হিসাবে রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হওয়ার জন্য খুব ছোট। গান্ধীবাদ এবং কমিউনিজম ভোটারদের কাছে ব্রাত্য হয়ে গেছে, তাদের শাসনের পেছনে কোন সর্বজনীন ন্যায়ের আদর্শের তুলনায় নানান কূট স্ট্র্যাটেজিই যে প্রবল ছিল, তা আজ জলের মতোই পরিষ্কার। নানান সামাজিক বিভাজনের ভিত্তিতেই তারা ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হয়েছেন। ত্রি-বর্ণের বুদ্ধিজীবীরা কতিপয় ব্যতিক্রম সহ, তাদের এই ক্ষমতার অপব্যবহারকে ঢেকে রাখে এবং মানবাধিকারের প্রচারের পরিবর্তে তাদের জাতপাতের আধিপত্যেকে মেনে চলতে

---

[165] মেটা স্পেন্সার, “ফাউন্ডেশন্স অফ মডার্ন সোশিওলজি”, প্রেন্টাইস-হল, ১৯৮১, পৃ - ২৬৯।

[166] প্রশান্ত কিশোর, “দ্য বেঙ্গল ইলেকশন ইজ ক্রিটিকাল টু হোয়েদার ইন্ডিয়া উইল বিকাম এ ওয়ান-নেশন ওয়ান-পার্টি স্টেট”, দ্য টেলিগ্রাফ, কলকাতা, মে ৭, ২০২১।

পছন্দ করে। দলিত ও মানবাধিকার কর্মীরা যারা গণহত্যা নিয়ে গবেষণা ও প্রচার করেছিলেন, কমিউনিস্ট বিরোধী অভিজাতরা কমিউনিস্টদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ও তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এদের ব্যবহার করেন। এবং উদ্দেশ্যসাধনের পর তাদেরপকে ছেঁটে ফেলে দেন। কমিউনিস্টরা দলিত উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদ করার ক্ষেত্রে তাদের কংগ্রেসের পূর্বসূরিদের মতো একই নীতি অনুসরণ করেছিল, যদিও কমিউনিস্টরা, সম্ভবত তাদের স্ব-স্বীকৃত স্ট্যালিনবাদের কারণে এটি সম্পর্কে আরও বেশি নির্মম ছিল। তাই মরিচঝাঁপি ছিল দলিতদের ক্ষমতায়নের বিরুদ্ধে ছিল কমিউনিস্টদের কংগ্রেস নীতির একটি ধারাবাহিকতা।

কংগ্রেস এবং সিপিএম-এর নীতির মধ্যে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল না। "১৯৬১ সালে ডঃ রায় [পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী] যখন শিবিরের উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের নির্দেশ দেন এবং যখন তাদের মধ্যে ১০,০০০ জন যেতে অস্বীকার করেন তখন তিনি নগদ ও শুকনো খাবার দেওয়া বন্ধ করলেও এবং ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নিলেও তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেননি। তিনি তাদের ক্যাম্প থেকে বের করে দেননি। উদ্বাস্তুরা সেই শিবিরের বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করতে থাকে এবং কোনো সরকারি সাহায্য ছাড়াই নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং অবশেষে নিজেদেরকে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে একত্রিত করে। কিন্তু মার্কসবাদী সরকারের সঠিকভাবে সেই সমস্ত উদ্বাস্তুদের তাড়ানোর ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না, তারা নিজেদের করা পরিসংখ্যানগত মূল্যায়ন অনুসারে দেখে পশ্চিমবঙ্গে মোট উদ্বৃত্ত জমির পরিমাণের মধ্যে এই জনতাকে রেখে দেওয়া যায়।"[167]

যদিও কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিতভাবেই মরিচঝাপিতে সিপিএমের চেয়ে বেশি অবহেলা ও অনাহারে শরণার্থীদের হত্যা করেছিল, কংগ্রেস তাদের বড় আকারের গণহত্যার মাধ্যমে উচ্ছেদ করতে প্রস্তুত ছিল না। সম্ভবত এটি একটি গান্ধীবাদী এবং স্ট্যালিনবাদী পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। এখানেই নেতাদের ব্যক্তিত্ব সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ফারাক গড়ে দেয়। বামফ্রন্ট বিষয়টিতে তীব্রভাবে বিভক্ত থাকলেও সিপিএম নেতাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি ছিল। ডঃ রায় এদের যেমন আছে সেভাবেই রেখে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু জ্যোতি বসু তার নিজের দলের মধ্যে বিরোধিতা সত্ত্বেও তেমনটা করতে রাজি ছিলেন না। "আমি তোমাকে শুধু তাদের ভয় দেখানোর জন্য বলেছিলাম। 'মানুষ মারা গেলে আরও বেশি ভয় পায়।' তাহলে আপনি কি আমাকে বলতে পারবেন আপনার নির্বোধ হত্যাকাণ্ডের কী ভাল ছিল? (ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন ওয়েস্ট, ফিল্ম)। যখন তাদের ভয় দেখিয়েও কাজ হয়নি, তখন তাদের গণহত্যা করা হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত সিপিএম নেতাদের মধ্যে কেউই কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করেননি। কিন্তু এর পরিণতিগুলি সম্ভবত তাদের কাজকে ছাপিয়ে গেছে।

[167] প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী, দ্য মার্জিনাল ম্যানঃ দ্য রিফিউজিস অ্যান্ড দ্য লেফট পলিটিকাল সিড্রোম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, কল্যাণী, পশ্চিম্বঙ্গ, ল্যুমিয়ের বুকস, ১৯৯০, পৃ - ৪৩৪।

প্রাথমিকভাবে সিপিএম উদ্বাস্তুদের উচ্ছেদে তাদের সাফল্য নিয়ে গর্ব করেছিল, কিন্তু বেঁচে থাকা লোকদের কাছ থেকে গণহত্যার রিপোর্ট পাওয়ায়, ঘটনাটিকে উপেক্ষা করার পদ্ধতিটি পরিবর্তিত হয়। তিন চতুর্থাংশ শরণার্থী মারা গেছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, যে এখনও অনেক বেঁচে আছে। একটি ভাল কৌশল হতে পারে প্রতিটি শেষ শরণার্থীকে হত্যা করা যখন তারা তাদের দ্বীপে ঘিরে রেখেছিল তাই গল্প বলার জন্য কেউ অবশিষ্ট ছিল না। যাইহোক, পার্শ্ববর্তী গ্রাম চিৎকার শুনেছিল, সেখানে অপরাধীরা কথা বলতে পারে, এবং দ্বীপে থাকা সংখ্যার ভিত্তিতে মোট নিখোঁজ হওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন ছিল। যখন বেঁচে থাকারা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন তাদের সন্ধান করা এবং তাদের হত্যা করা সিপিএমের এখতিয়ারের বাইরের অঞ্চলে কঠিন হয়ে যেত। একটি স্বাভাবিক গণতন্ত্রে প্রতিটি শেষ প্রত্যক্ষদর্শীকে হত্যা করা তদন্ত এবং ন্যায়বিচার এড়ানোর জন্য অপরিহার্য ছিল, কিন্তু ভারতে সবাই জানত যে এটি অপ্রয়োজনীয় এবং বিপরীতমুখী ছিল, কারণ গুরুত্বপূর্ণ কেউই বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের কথা শুনবে না, তাই অপরাধীদের শাস্তির ভয় নেই। সিপিএম হয়তো ভেবে নিয়েছিল যেহেতু এটি তাদের একমাত্র সম্পূর্ণ সফল প্রোগ্রাম ছিল তাই পরিবেশবাদীদের জন্য তাদের পুনর্নির্মাণ কর্মসূচির সাফল্য প্রমাণ করার জন্য দ্বীপে সফর করেছিল। যে কেউ পরিদর্শন করেছে তার জন্য এক দশকের জেলের সাজা বজায় রাখার পরিবর্তে, ইকোট্যুরিস্টদের দ্বীপটি দেখানো যেতে পারে। মারিচঝাপির উপর একটি ইন্টারনেট অনুসন্ধান শুধুমাত্র গণহত্যার তথ্য প্রকাশ করে যেখানে একটি পুনঃউইল্ডিং প্রোগ্রামের উল্লেখ নেই। বামফ্রন্ট পুনর্নির্মাণে তাদের সাফল্যের হিসাব রাখতে বিরক্ত করেনি যার জন্য শুধুমাত্র প্রকৃতিকে তার গতিপথ গ্রহণ করতে হবে, তাই এটি খুব কমই ব্যর্থ হতে পারে। সাইটটি প্রাকৃতিকভাবে ছোট গাছের সাথে ঝোপঝাড় জমি ছিল এবং ম্যানগ্রোভ বা লম্বা বন নয় তাই পর্যটকদের কাছে দৃশ্যত অপ্রীতিকর হবে। একটি গণহত্যার স্থান হিসাবে মারিচঝাপির সংস্থান দেওয়া, এমনকি ইন্টারনেটে পুনর্বাসনের একটি প্রচেষ্টা গণহত্যার ইতিহাস দ্বারা অভিভূত হবে এবং এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। কমিউনিস্টরা কেবল চুপচাপ থাকতে বেছে নিয়েছিল এবং সাধারণত এই বিষয়ে সাক্ষাতকারও দেয়নি।

বামফ্রন্টের কর্মসূচী কমবেশি অন্যান্য রাজ্যের সাথে সমান ছিল, তাই এমন কিছু ব্যতিক্রম ছিল না যা তারা গর্ব করতে পারে যেটি বাস্তবে যাচাইযোগ্য ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রমী কর্মসূচি ছিল মরিচঝাঁপি, কারণ তারা অন্য যেকোনো রাজ্য সরকারের চেয়ে বেশি লোককে হত্যা করেছিল, কিন্তু এটি এমন কিছু ছিল না যা তারা প্রচার করতে পারে। তবুও এটি অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের মাঝারি পারফরম্যান্স ভুলে যাওয়ার পরে এটিকে সম্ভবত মনে রাখার মতো একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেছে। মানবাধিকারের অভাব ছিল কমিউনিস্ট শাসনের বৈশিষ্ট্য, তাই স্তালিনবাদী দল গণহত্যা চালাবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আরও আশ্চর্যের বিষয় ছিল এটি নিয়ে হৈচৈ না হওয়া; কেননা দলিতদের সাবঅল্টার্ন অবস্থার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

গণহত্যার অপরাধীদের বিচার করতে বামফ্রন্ট এবং ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যর্থতা, বিজেপিকে দলিতদের মধ্যে নিজেদের জনপ্রিয় ক'রে তোলার সুযোগ ক'রে দিয়েছে, যেখানে তাদের এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে।[168] উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের অধিকারের মতো অন্যান্য বিষয়গুলিও একটি ভূমিকা পালন করতে পারে। সংখ্যালঘুরা নিজেদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে সংগঠিত করতে অক্ষম, এবং তাদের স্বার্থ নিয়ে ভাবিত নয় এমন দলগুলির উপর নির্ভরশীল, যা তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক ক্ষমতার দুর্বলতা নির্দেশ করে। বিজেপি বৃহত্তর হিন্দু ধর্মসভার অংশ হিসাবে দলিত এবং উপজাতীয় লোকমূর্তি এবং ঐতিহ্যগুলিকে গ্রহণ করার একটি ইনক্লুসিভ কৌশল অনুসরণ ক'রে, নিজেকে তার বর্ণ/শ্রেণির স্বার্থের চেয়ে বৃহত্তর নির্বাচনী ভিত্তির কাছে আবেদন জানাতে সক্ষম করেছে। যাইহোক, বিজেপির দ্বারা স্থায়ী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এখন মুসলিম এবং দলিতদের মধ্যে একটি নির্বাচনী জোট যদি গড়ে তোলে, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুবাদে তারা নিজেরাই রাষ্ট্র ক্ষমতা নিতে পারে।

---

[168] সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন ডেভেলপিং সোসাইটিজ, ২০২১, "ওবিসিজ, আদিবাসীজ অ্যান্ড রাজবংশী দলিতস মুভড সিগনিফিকেন্টলি অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য বিজেপি কম্পেয়ার্ড টু ২০১৯"। অবশ্য শিরোনামটি সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে দলিতদের মধ্যে বিজেপির প্রতি সমর্থন ২০১৬-র তুলনায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্বাচনী ফলাফল মোতাবেক নমশূদ্রদের মধ্যে বিজেপির প্রতি সমর্থন ২০১৬-র ১০% থেকে ২০২১-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮%। অ-উদ্বাস্তু রাজবংশীদের ক্ষেত্রে তা ৯% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯%। দলিতরা ধর্মনিরপেক্ষ দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সমর্থন জানিয়েছে একটি হিন্দু মৌলবাদী দলকে। এই পরিবর্তনটা আমায় এটি লিখতে প্রণোদনা জোগায়।

দোষের ভাগীদারেরা

এই বিষয়ে আগ্রহী পাশ্চাত্যের একাডেমিক পত্রিকাগুলিতে এবং অন্যান্য আরো পত্র-পত্রিকাতে প্রবন্ধটি ও বইটির সংক্ষিপ্ত খসড়া পাঠানো হয়েছিলো। কিন্তু কোথাও ইতিবাচক মন্তব্য পাওয়া যায়নি। 'পাস্ট ও প্রেজেন্ট'-এর একজন সমালোচক বলেছিলেন, গণহত্যা দেখানোর অনেকরকম উপায় আছে কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা না থাকায় বর্তমান লেখাটি তার মধ্যে পড়বে না, যদিও ঠিক কীভাবে বর্ণনা করলে ঠিকভাবে দেখানো যাবে, তার কোনো সদুত্তর তিনি দেননি।[169] নিশ্চয়ই ভালোভাবে উপস্থাপন করার আরো অজস্র উপায় ছিল, কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো গণহত্যাকে সকলের দৃষ্টিগোচর করা। প্রত্যাখ্যান করে দেওয়ার কারণ যাই হোক, ফল হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের কথা আড়ালেই রয়ে গেছে, আর অন্যদিকে সমালোচকেরা হয়ে উঠেছেন ধর্ষণ ও খুনের প্রচ্ছন্ন সমর্থনদাতা। কোনো কোনো পত্রিকা দাবি করতে পারে তারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে না কিন্তু ভারতীয় পত্র-পত্রিকা গুলির ক্ষেত্রে এই যুক্তি খাটে না, তাদের এক্তিয়ারের মধ্যেই এই বিষয়টি ছিলো। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলো ইকোনোমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি, যেখানে মরিচঝাঁপি গণহত্যার উপর অণু জ্বালের একটি লেখা বেরিয়েছিলো। অধ্যাপক গোপাল গুরু যখন ভারতের কোনো অগ্রণী প্রকাশনাগুলির মধ্যে প্রথম দলিত সম্পাদকরূপে এই পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আমি ভেবেছিলাম এইবার আমার সুযোগ আসবে কিন্তু আমার তিনটি লেখারই কোনো প্রত্যুত্তর আমি পাইনি। আগে থেকে সাবধান করে দেওয়ার পর, আমি খ্যাতনামা দলিত বুদ্ধিজীবি এবং তাদের অনুগামীদের কাছে অনুরোধ করেছিলাম ওনাকে বুঝিয়ে লেখাটি প্রকাশ করানোর জন্য কিন্তু কোনো ফল হয়নি। আমি ওনাকে দেখিয়েছিলাম দলিতদের মানবাধিকার নিয়ে তাঁকে একটি অবস্থান নিতেই হবে আমার লেখাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তিনি কিন্তু তার মতামতই দিচ্ছেন এই ব্যাপারে। কিছুটা দলিতদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের উপর কাজ করেই তিনি নিজের কেরিয়ারে উন্নতি করেছেন, এবার ওনার উচিত কিছু ফিরিয়ে দেওয়া।[170] তাকে বেছে নিতে হতো তিনি শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমে বৈচিত্র্য আনা একজন প্রতীকী দলিত রয়ে যাবেন না

---

[169] কিভাবে নৃশংস ঘটনাগুলিকে দেখানো উচিত সেটিই একটি বড়ো সমস্যা। নিম্নবর্গের মানুষদের কাছে এই নির্মমতার ঘটনা সকলের সামনে তুলে ধরতে গেলে সংবাদমাধ্যমে জায়গা পাওয়া থেকে শুরু করে মুখোমুখি হতে হয় নানারকম বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নের এবং ঘটনাগুলিকে দেখানো হয় অভিজাত উচ্চবর্ণের পছন্দ অপছন্দ অনুযায়ী। কিভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করা হবে, কোথায় প্রকাশ করা হবে এই নিয়ে নানা মতামত দেখা যায়। বাংলার দলিত তথ্যমন্ত্রী পুলিনবিহারী মল্লিক বিধানসভায় বক্তব্য রেখেছিলেন, "আমরা জানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিরম ব্যবহার আমাদের সাথে করা হয়। আমরা জানি উচ্চজাতের হিন্দুরা কিভাবে আমাদেরকে দেখে। আমরা সেটি জানি এবং বছরের পর বছর ধরে বংশানুক্রমিক ভাবে সেটিই হয়ে এসেছে আমাদের অভিজ্ঞতা। এইসব নিয়ে কথা বলে আর লাভ নেই কারুর মাথার ঠিক থাকার কথা নয় যদি আমাদের - তফসিলি জাতির উপর হওয়া অত্যাচার ও অন্যায়ের কথা আমরা ভাবি। তাই আমি এই বিষয়ে আর কিছু বলছি না পাছে আমি নিজের মেজাজ হারিয়ে ফেলি।" বাংলা বিধানসভার কার্যবিবরণী, ১৬ ই অগস্ট, ১৯৩৮। এই প্রসঙ্গে বিশদে জানতে দেখুন: দ্বৈপায়ন সেন "রিপ্রেসেন্টেশন, এডুকেশন এন্ড এগ্রেরিয়ান রিফর্ম: যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এন্ড দ্য নেচার অফ সিডিউলড কাস্ট পলিটিক্স", মডার্ন এশিয়ান স্টাডিজ, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ: ১৯।

[170] গোপাল গুরু, সম্পাদক, হিউমিলিয়েশন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ২০১১।

সরাসরি দলিতদের মানবাধিকারের প্রশ্নে উঠে দাঁড়াবেন। তার পূর্বসূরির মতো, যিনি মরিচঝাঁপির উপর আগে লেখাটি প্রকাশ করেছিলেন তাকেও সাহস দেখাতে হবে এটা মনে করিয়ে দেওয়ার পরও তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করেননি। তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন তিনি কোন পক্ষে থাকবেন। অভিজাত বুদ্ধিজীবিরা যারা ওনাকে দলিত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ভালো করেই জানতেন তারা কি করছেন যখন দলিতদের সামনে তাদের ক্ল্যারেনস থমাস এর মতো একজন ব্যক্তিত্ব কে দাঁড় করিয়েছিলেন।

আগ্রহী ছিলো না অন্যান্য নামকরা দলিত প্রকাশনাগুলিও। ফরওয়ার্ড প্রেসের প্রমোদ রঞ্জন এই লেখা বার করার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। দলিতদের সমর্থন চাওয়া অন্যান্য বাম ডান সবার মতো তারাও ডঃ আম্বেদকরকে অবলম্বন করেছিলো, কিন্তু আমার পরিবারের একজন বন্ধু হিসেবে এবং আম্বেদকরের আদর্শ ও লেখাপত্র দেখে এটি কল্পনা করা শক্ত তিনি নিজে এই লেখা প্রকাশনার বিষয়ে আপত্তি করতেন।[171] ফরওয়ার্ড প্রেসের অফিসে পুলিশের হেনস্থা ও হিন্দু মৌলবাদীদের থেকে এদের হিন্দি প্রকাশককে দেওয়া খুনের শাসানি হয়তো এদেরকে প্রভাবিত করেছিলো না ছাপাতে।[172] কলকাতার দলিত মিররের সম্পাদক মনোহর বিশ্বাস যার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম আমার লেখা বা তিনটি মেলের কোনো উত্তর দেননি, অথচ তিনি আমার পরিবারের মতনই এক জাতের ও একই জেলা থেকে আসা শরণার্থী ছিলেন। যেমন মরিচঝাঁপি তথ্যচিত্রের নির্মাতা তুষার ভট্টাচার্য বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গের দলিত নেতানেত্রীরা প্রধানত বুদ্ধিজীবি! তাদের মধ্যে বেশিরভাগই সরকারি সুবিধে নিয়ে সাচ্ছল্যে থাকেন। অবসর নেওয়ার পর তারা দলিতদের নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন। মরিচঝাঁপির উপর বিভিন্ন সভা সমিতি সেমিনার ডাকা হয় যখন মরিচঝাঁপির বিভিন্ন শরণার্থীরা এই নেতাদের বাড়ির কাছের রেললাইনের ধারের শোচনীয় ঘরগুলিতে থাকেন। আসল কথা হচ্ছে, কেউই তাদের গ্রাহ্য করে না। এটি বুঝে ওঠা মোটেই কঠিন না কিভাবে এইসব দুঃস্থ মানুষদের নিজেদের সুবিধের জন্য ব্যবহার করে তারা তাদেরকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।[173] জাতীয় স্তরেও এই সংহতির অভাব পুরো মাত্রায় দেখা যায়। দলিতদের একটি সর্বভারতীয় ওয়েবসাইটে

---

[171] এখনকার দিনে সবাই ডঃ আম্বেদকরকে সংবিধানের রূপকার বলে স্মরণ করে কিন্তু তার জীবদ্দশায় এই ভূমিকা যথেষ্ট বিতর্কিত ছিলো। যখন গান্ধী দলিতদের মুক্তির জন্য ইংরেজদের মেনে নেওয়া কিছু সুযোগ সুবিধের প্রতিবাদে অনশনে বসেন, আম্বেদকর বাধ্য হয়েছিলেন তার দাবি মেনে পুনা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে, যা আজও দলিতদের উচ্চবর্ণের উপর নির্ভরশীল করে রেখেছে। আমার পরিবারের ও নমশূদ্র নেতাদের অনেকে এই প্রত্যাহারের ফল কি হতে পারে বুঝে এর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু গণহত্যার আশংকা করে আম্বেদকর এই দাবি মেনে নিয়েছিলেন। (সর্বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, দলিত ক্যামেরা, আম্বেদকর, ইউটিউব পার্ট ১ ও ২)। বিভিন্ন দলগুলির দলিত রাজনীতিকদের দেখলেই সেটি বোঝা যায়। কিন্তু প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই এমনকি সংবামাধ্যম ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এইরকম অত্যাচারিত সংখ্যালঘু দেখা যায়। দলিতদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলেন গান্ধী কিন্তু অনেককেই এর উল্টোটি বোঝানো হয়েছে। এই ঘটনাটি অনেকেই জানেন কিন্তু খুব কম মানুষই বলেছেন গান্ধী কিভাবে আম্বেদকরকে গণহত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন। মেঘনাদ দেশাই, "মোদীজ সাপোর্ট ওয়াস আক্রোস হিন্দুজ এন্ড দলিতস, বাট নট মুসলিমস", ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৪ই জুলাই, ২০১৯। জোসেফ লেলিভেল্ড, গ্রেট সোল: মহাত্মা গান্ধী এন্ড হিজ স্ট্রাগল উইথ ইন্ডিয়া, অ্যালফ্রেড এ নোপ, নিউইয়র্ক, ২০১১ পৃ: ২৩০। আশ্চর্যজনক ভাবে সরকারি অফিসে দুজনের ছবিই ঝোলানো থাকে কিন্তু বাস্তবে কারুর আদর্শই অনুসরণ কেউ করে না।

[172] প্রমোদ মহাজন, "হিন্দি এডিটর অফ ফরওয়ার্ড প্রেস রিসিভ ডেথ থ্রেটস", countercurrents.org, ৩১শে মে, ২০১৮।

[173] তুষার ভট্টাচার্য, অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি, কলকাতা, ইংরেজি খসড়ার অনুবাদ, পৃ - ১৬।

তুলে ধরা হয়েছে যখন সর্দার প্যাটেলের প্ররোচনায় আম্বেদকর বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে গণপরিষদ নির্বাচনের ভোটে হেরে যান, নমশূদ্ররা তাকে বাংলা থেকে জিতে পাঠিয়েছিলো। "ভারতের অন্যান্য প্রান্তে থাকা দলিতদের কাছে ও দলিত আন্দোলনের জন্য নমশূদ্র সমস্যা একটি বড় প্রশ্ন, যাদের বাবাসাহেব আম্বেদকরকে গণপরিষদে পাঠানোর জন্য সবচেয়ে বেশি মূল্য চোকাতে হয়েছিলো সেই নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের পাশে তারা কি দাঁড়াবে।"[174] বিষয়ের সারবস্তু হলো সংগঠিত কার্যকলাপের অভাবে দলিতরা নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে তাদের প্রভাব গড়ে তুলতে পারেনি এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা যে রাজনৈতিক দলগুলি বিন্দুমাত্র তাদের উন্নতির কথা ভাবে না তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছিলো।

কোনোরকম গণআন্দোলন ছাড়াই কিছু সমাজকর্মী মরিচঝাঁপির গণহত্যাকে সামনে আনার চেষ্টা করছিলেন। একটি তামিল দলিত সাময়িকীতে অণু জ্বালের লেখার সাথে আমার আসল প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, পরে দুটি লেখাই মরিচঝাঁপির উপর একটি বাংলা বইতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। যখন মানবাধিকার কর্মীদের 'শহুরে নকশাল' বলে দাগিয়ে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল, সংবাদমাধ্যমে তার অনেক সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু কোনো কোর্টেই এই মামলাগুলি ধোপে টিকতো না, এগুলি ছিলো ভিন্নমতপ্রকাশ আটকে দেওয়ার জন্য সরকারের পছন্দের উপায়।[175] একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে গিয়ে বারবার প্রত্যাখ্যান বুঝিয়ে দেয় এখানে বাকস্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ কি পরিণাম মারাত্মক। একজন অধ্যাপক যার সাথে আমি পত্রালাপ করেছিলাম তার বাড়িতে পুলিশ হানা দিয়ে একটি লেখার খসড়া বাজেয়াপ্ত করেছিলো।[176] সেই "এই প্রজন্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখক ও বুদ্ধিজীবী",[177] আইআইটির অধ্যাপক, প্রাক্তন কর্পোরেট সিইও এবং ডঃ আম্বেদকরের নাতনীর স্বামীকে যদি ফাঁসানো যায় তাহলে বোঝা যায় শ্রেণী বা বংশগত পরিচয় কিছুই পরিবর্তন করতে পারে না, যদি সরকার বিরোধীদেরকে মিথ্যে মামলায় জড়াতে চায়।[178] ভারতীয় রাজনীতিতে এইভাবে ভিত্তিহীন মামলায় জড়িয়ে বিরোধীদেরকে হেনস্থা করার অনেক প্রচলন আছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখন এইভাবে অন্যদের হয়রান করার উপায় ছড়িয়ে পড়েছে, বিচারব্যবস্থার বাইরে কারুর ক্ষমতা নেই এই ব্যবস্থা বন্ধ করার কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের বিরুদ্ধে যেতে রাজি নয়। লজ্জাজনক কোর্ট আদেশগুলির বিরুদ্ধে "ভারতের বোদ্ধা আইনজ্ঞদের ও উচ্চবর্গের কাপুরুষিক আচরণ"[179] বুঝিয়ে

---

[174] অনুপ কুমার, অজয় হেলা এন্ড নীলেশ কুমার, মরিচঝাঁপি এন্ড দ্য রিভেঞ্জ অফ বেঙ্গলি ভদ্রলোক, রাউন্ড টেবিল ইন্ডিয়া, ২০শে জুলাই, ২০১২।

[175] মাইকেল সফি, "প্রোটেস্টস ইন ইন্ডিয়া অ্যাজ রাইটস এক্টিভিস্টস প্লেসড আন্ডার হাউস এরেস্ট", দ্য গার্ডিয়ান, অগস্ট ২৯, ২০১৮। নিহা মসি এন্ড জোয়ানা স্লেটার, "দে ওয়ার একিউসড অফ প্লটিং টু ওভারথ্রো দ্য মোদী গভর্নমেন্ট। দ্য এভিডেন্স ওয়াস প্ল্যান্টেড এ নিউ রিপোর্ট সেস", দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২১।

[176] আনন্দ তেলটুম্বদে, "আই নিড ইওর সাপোর্ট", জানুয়ারি ১৫, ২০১৯। academia.edu অপূর্বানন্দ, "পুলিশ একশন এগেনস্ট আনন্দ তেলটুম্বদে ইজ ফারদার প্রুফ অফ মোদী গভর্নমেন্টস এরোগেন্স", দ্য ওয়্যার, ২২শে জানুয়ারি, ২০১৯।

[177] পবন ডাহাট, "পুনে কোর্ট রিজেক্টস আনন্দ তেলটুম্বদেজ বেল এপ্লিকেশন", huffingtonpost.in, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

[178] প্রিয়ংবদা গোপাল এবং সলিল ত্রিপাঠি, "হোয়াই ইস ইন্ডিয়া টার্গেটিং রাইটার্স ডিউরিং দ্য কোরোনাভাইরাস প্যান্ডেমিক?" দ্য গার্ডিয়ান, ১৬ই এপ্রিল, ২০২০।

[179] প্রতাপ ভানু মেহতা, "কোভিড লকডাউন ইজ সিন্ এজ কভার ফর জম্মু এন্ড কাশ্মীর", ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬ই মে, ২০২০।

দিয়েছে রাস্তা এবং ব্যালট বাক্স ছাড়া প্রতিবাদের কোনো উপায় আর খোলা নেই। সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্নজনের বেলের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে অন্যদিকে জেলে বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে সর্বাধিক সাজার চেয়েও অনেককে বেশি সময় কাটাতে হয়। যে সমস্ত গবেষকদের সাথে আমি কথা বলছিলাম তারা উত্তর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমায়ে নিজেকে ভারতের বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে গিয়ে সংযত হতে হয়েছিলো কারণ তাদেরকেও 'বিদেশী হস্তক্ষেপের' অজুহাতে নানা সমস্যার মধ্যে ফেলা হতে পারতো। "এই বিষয়ে গভীরে আলোচনা করা অত্যন্ত কঠিন যখন এতো দলিত ও অন্যান্য প্রগতিশীল গবেষকদের কে নানাভাবে উপদ্রব করা হচ্ছে বা জেলে পোড়া হচ্ছে এবং বিদেশী গবেষকদের নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভারতে ভিসা পাওয়ার চিন্তাও মাথায় রাখতে হয়।"[180]

দলিত প্রকাশকদের কাছেও এই লেখাটি 'অস্পৃশ্য' হয়ে গেছিলো, তারা নিজে থেকেই তাদের সম্প্রদায়ের কথা প্রকাশ করতে চায়নি। লেখিকা অরুন্ধতী রায়, যিনি অতীতে অস্পৃশ্যতা নিয়ে বহু বিতর্কিত বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন, আমার ই-মেলের কোনো উত্তর দেননি। একই ঘটনা ঘটে রামচন্দ্র গুহর সাথে। আগে আমার এক ভাই তার নিজের উপন্যাসের ভূমিকা লেখার জন্য গুহকে অনুরোধ করায় উত্তর পেয়েছিলেন তিনি উপন্যাস পড়েন না। এইবারে তার এই অজুহাতটি ছিলো না বলে হয়তো তিনি আমায়ে কোনো উত্তরই দেননি। ব্যক্তিগত অনেক সমীকরণ কাজ করে কোন সামাজিক বিষয়টি তুলে ধরা হবে সেই নিয়ে কিন্তু এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মরিচঝাঁপি যেভাবে কোনো 'খ্যাতনামা' সমর্থন পায়নি এবং সমস্ত কাজ কিছু সীমিত মানুষের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে। অস্পৃশ্যতা নিয়ে অন্যান্য কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হলেও বৃহত্তম সরকারি গণহত্যা নিয়ে কোনো আলোচনা করা যাবে না। নিজেদের স্বার্থের সুবিধেমতো বিভিন্ন ডাকসাইটে পন্ডিতরা বিষয় নির্বাচন করেন। রায় এবং গুহ দুজনেই জাতপাত বিভাজন নিয়ে কথা বলেছেন কিন্তু তাদের সমর্থন ছিলো সেই সমস্ত বিষয়ের উপর যেটির সাথে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত ছিলো। বুদ্ধিজীবী অভিজাতদের মিথ্যাচার সবার সামনে এনে দিয়েছিলো মরিচঝাঁপি যার জন্য এটিকে তাদের উপেক্ষা করতে হতো। ভবিষ্যতে যাতে তাদের আবার একই বিভ্রম না হয় তাই দলিতদের মরিচঝাঁপি সম্পর্কে জানানো উচিত। সমস্ত রাজনীতিকরা ও তাদের বুদ্ধিজীবী সমর্থকরা দলিতদের বারবার নিজেদের অভিসন্ধি অনুযায়ী ব্যবহার করেছে কিন্তু দলিতদের এদের থেকে অনেক ক্ষতি হতে পারে তাই তাদেরকে এই নেতাদের ব্যাপারে সতর্ক করা দরকার। নীতির কথা ছেড়ে দিয়ে মানবাধিকারের ব্যাপারেও বুদ্ধিজীবী বা সাধারণ মানুষের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি। পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হয়েছে ক্রিমিনাল মামলা থাকা বা থাকার কথা এমন রাজনৈতিকদের দ্বারা।

কতটা প্রকাশ করা যাবে আর কতটা যাবে না সেটি পাশ্চাত্যে ও ভারতে দুই জায়গাতেই ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়েছে। যখন গার্ডিয়ানে বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশে রাজ্য সরকারের মদতে মসজিদ ভেঙে দেওয়ার বিবরণ আসে ভারতের কোনো

[180] অমরজিৎ সিং, ডিসকাশন কমেন্টস অন আওয়েন এম লিঞ্চ রিভিউ আর্টিকল "আনটাচেবলস ইন ইন্ডিয়াজ সিভিল/আনসিভিল ডেমোক্রেসি" ইথেনাস, খন্ড . ৬৬:২, ২০০১, ৯ই জুন, ২০২১।

সংবাদমাধ্যমে সেটি নিয়ে আমি কোনো খবর পড়িনি।[181] আমি এই বিষয়ে খবর রাখেন এমন এক ভারতীয়কে যখন জিজ্ঞেশ করলাম এই ব্যাপারে, তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয় না, গার্ডিয়ান থেকেই আমি ভারতের ব্যাপারে খবর পাই।" আমি জানতে পেরেছিলাম আমার আত্মীয়রা দেশে কি হচ্ছে সেই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের থেকে বেশি খবর রাখেন, এটি তাদের ভেতরের পরিচয়ের জন্য না সাংবাদিকদের অনুৎসাহের জন্য সেটি আমি জানি না। বিদেশে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের, সহকর্মীদের ও বিভিন্ন দেশের মানুষদের ভাবাবেগে আঘাত না করার জন্য এই বিষয়ে আলোচনা হয় উল্টোদিকে ভারতে আইনবলে বা বেআইনিভাবে সমালোচকদের ভয় দেখানোচলতে থাকে। এর ফল হচ্ছে ভারতের বাস্তব এতটাই বিকৃত হয়ে যায় যে আর সেটি প্রকাশিত হয় না। দক্ষিণপন্থী হিন্দু মৌলবাদী সরকার দলিতদের বিষয়ে কমিউনিস্টদের মতো একই ভুল করেছিলো। দলের একচ্ছত্রাধিপত্য তৈরী করার জন্য তারা নির্বাচনের মাঝে দলিতদের আক্রমণ করে এটি ভেবে যে নির্বাচনের সময় এই ঘটনা ভুলে যাওয়া হবে। সব অভিযোগ জমা হয়ে তাদের পুনর্নির্বাচন কঠিন হয়ে যায়। সংখ্যালঘুদের এইভাবে ভারতকে একটি 'হিন্দু পাকিস্তান' বাড়ানোর প্রবণতা সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত।[182]

খসড়া প্রবন্ধটির প্রত্যুত্তর না দিয়ে বা কোনোরকম মন্তব্য না করে বুদ্ধিজীবীরা ও গবেষকরা সাহসিকতার থেকে সতর্কীকরণ কে বেছে নিয়েছিলেন। সবাই সাবধান হয়ে এই লেখা না ছাপানোর ব্যাপারেই উৎসাহী ছিলেন। কাউকে বিপদে না ফেলে কিভাবে এই বিষয়ে কথাবার্তা চালু করবো সেই বিষয়েও আমি ভাবছিলাম। "বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র" এর পরিণাম বোঝাই যাচ্ছিলো। দলিতরা কেন এই লেখাটি প্রকাশ করতে চাইছিলো না সেটি বুঝতে পারলেও, তথাকথিত ভারতীয় বা বিদেশী সংবাদমাধ্যমের কিন্তু কোনো চিন্তা থাকার কথা ছিলো না। গণতন্ত্রের যা মূল বৈশিষ্ট্য যে স্বাধীন সাংবাদিকতা, তারা যে কাল্পনিক পরিণতির ভয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে তা অনেককিছু বুঝিয়ে দেয় এখনকার স্বাধীন মতপ্রকাশের সঙ্কটের ব্যাপারে। সাহসী হয়ে এই বিষয়ে এগিয়ে যাওয়ার বদলে তারা আর চার পাঁচটা চাকরির মতন তাদের কাজকে ভেবে নিয়েছিলেন।[183]

---

[181] হানাহ এলিস-পিটারসন, "অফিসিয়ালস টেক পুলিশ একশন এগেনস্ট লিডার্স অফ বুলডোজড মস্ক ইন ইন্ডিয়া", দ্য গার্ডিয়ান, ২১শে মে, ২০২১।

[182] তভলিন সিং, "দ্য আইডিয়া দেয়ার ইস এ মুসলিম কন্সপিরেসি টু প্রে অন হিন্দু গার্লস এন্ড কনভার্ট দেম টু ইসলাম ইজ রিডিকুলাস", ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২০ ডিসেম্বর, ২০২০।

[183] আমার পক্ষে প্রতিটি সম্পাদক বা বোর্ডের মানবাধিকারে হস্তক্ষেপ আটকাতে তাদের ব্যর্থতার কথা সামনে আনা সম্ভব না, কিন্তু আমেরিকার একটি নামকরা এশিয়ান স্টাডিজ গ্রুপ, এসোসিয়েশন ফর এশিয়ান স্টাডিজ ছিলো ব্যতিক্রমী। জার্নাল অফ এশিয়ান স্টাডিজের সম্পাদক বিনায়ক চতুর্বেদী সাবল্টার্ন স্টাডিজ গ্রুপের প্রতি তার ভালোলাগার কথা জানিয়েছিলেন, এই গ্রুপের অনেকেরই মরিচঝাঁপি গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত মদতদাতাদের সাথে পারিবারিক বা দলগত সম্পর্ক ছিলো। আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম এই প্রবন্ধটি না গ্রহণ করতে। কিন্তু তিনি পরে কোনোরকম বাইরের পর্যবেক্ষককে না পাঠিয়ে নিজেই প্রবন্ধটি নাকচ করে দেন যাতে মান বাঁচাতে উনি পারেন। সংস্থার সভাপতি থমাস রাওয়াস্কি এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ গ্রহণ করেননি এবং অন্যান্য বোর্ড সদস্যরাও কোনো উত্তর দেননি। আগের সভাপতিদেরকেও জানানো হয়েছিলো কিন্তু কেউই এগিয়ে আসেননি। এই ঘটনার কথা

শুধুমাত্র এই সম্পাদকরাই গণহত্যার কথা লুকিয়ে যাচ্ছিলেন না কার্যত সমস্ত বুদ্ধিজীবীরাই তাই করছিলেন। বিদেশী যারা ছিলেন তাদের ভারত সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না এই জন্য হয়তো অত্যাচারিত মানুষদের প্রতি তাদের কোনো সরাসরি অনুভূতি ছিলো না। এই সম্পাদকরা যেভাবে তাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় বা এসোসিয়েশনে একচেটিয়া ক্ষমতা পেয়ে এসেছেন তা থেকে বোঝা যায় এদের উপরতলার মানুষদেরও এই ব্যাপারে একই রকম মতামত ছিলো। এইভাবে ঘটনাগুলির কথা লুকিয়ে যাওয়া শুধুমাত্র তাদের উপর নয় তারা যে সমস্ত জায়গার পদাধিকারী ছিলেন তার উপরেও খারাপ প্রভাব ফেলেছিলো। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা তাদের সমর্থন নেই এই বিষয়ের মানবাধিকার হস্তক্ষেপের ব্যাপারে কথা বলতে না শুনতে রাজি ছিলেন না। বিদেশে ভারত চর্চার দুরবস্থা বোঝা যায় ভারতের গবেষকদের মানবাধিকারের ব্যাপারে দ্বিমত দেখে। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির 'ডাইভার্সিটি' নীতির ফলে এমন এক ভারতীয় সমাজের সৃষ্টি হয়েছে যারা ভারত সম্পর্কে কোনো রকম সমালোচনা শুনতে রাজি নয়, যেটি বরং এদের মতো অর্থবল না থাকা অনেক ভারতে থাকা মানুষের মধ্যে দেখা যায়। ভারতকে নিয়ে একরকম ভাবালু অতিকথা তৈরী হয়েছে কিছু উচ্চবর্ণের ভারতীয় অভিজাতদের দ্বারা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য। ইউরোপে সেখানকার যুক্তিবাদী আন্দোলনগুলির মধ্যে থেকেও এই বিষয়ে আত্মসমালোচনা তেমন হয়নি। জার্নালগুলি যেভাবে দলিতদের প্রতি হওয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পিছু হটে এসেছে, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদের বিশ্বাসযোগ্যতা। তারাও এই গণহত্যা লোকানোর অংশীদার হয়ে উঠেছে। এই অধ্যাপকরা ছাত্র ছাত্রীদের এই বিষয়গুলি এড়িয়ে কি উল্টোপাল্টা পড়ান ভারত সম্বন্ধে সেটিও প্রশ্নযোগ্য। ভারতের সংবাদমাধ্যমের মতো পাশ্চত্যের গবেষকদের মধ্যে স্পষ্টতই এক অলিখিত সেন্সরশিপ চালু রয়েছে। এই দেশগুলিতে দলিতদের সম্বন্ধে যে ধরণের গবেষণা হয় সেগুলি একরকম উচ্চজাতের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।[184] উচ্চবর্ণদের অস্বস্তিতে ফেলবে এমন কোনো লেখাই প্রকাশিত হয় না। যখন দলিতদের এইভাবে উচ্চবর্ণ বা

অন্যান্য দলিত বুদ্ধিজীবীদের ও তাদের অনুগামীদের জানানো হয়েছিলো যদি তাদের ভবিষ্যতে এই লোকজনদের সাথে কাজ করতে হয়।

[184] একটি সম্পূর্ণ গবেষণা করা যায় এর সম্বন্ধে কিন্তু একটি বিশেষ ধরণ দেখা যায় 'দলিত স্টাডিজ'এ রামনারায়ণ এস রাওয়াত এবং কে সত্যনারায়ণ, সম্পাদক, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৬, যেখানে কিভাবে লিখলে উচ্চবর্ণের সুবিধে হবে এমন বর্ণনা করা হয়েছে। ৩০০টি লেখার মধ্যে ১০টি প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ লেখা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে সেগুলির মধ্যে অনেককিছুই হয়তো দলিত মানবাধিকার বিষয়ে লেখা হয়েছিলো। সম্পাদকরা হয়তো আমার সমালোচনা করে লিখেছিলেন দলিত লেখকদের "অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ থেকে পিএইচডি থাকে না যেটি ভারতীয় গবেষনামন্ডলে প্রচলিত। এই লোকজনদের অনেকেরই ইংরেজি প্রাথমিক ভাষা নয়, এটি তারা কলেজে শিখেছিলেন।" পৃ: ৩। সমস্যাটি হচ্ছে পরনির্ভরতা লেখায় অকৃত্রিমতা আনে না বরং উল্টোটাই সত্য। আমার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আছে যেটি অনেকের নাও থাকতে পারে ভারতে উচ্চবর্ণের প্রতি চাকরি বা অন্যান্য ব্যাপারে নির্ভরতার কারণে। মানবাধিকারের ব্যাপারে বইটিতে বিশদে গবেষণার কথা লেখা আছে কিন্তু এটি সাধারণ কোনো দলিত বিষয়ক বইতে কেউ আশা করবে না। সাম্বাইয়া গুভিমেদা ছোট দলিত জাতিদের সাথে আরো ক্ষমতাশালী বড় দলিত জাতির মধ্যে বিভাজন নিয়ে আলোচনা করেছেন যেটি দলিত আন্দোলনকে অনেক প্রভাবিত করেছে। বিজেপি ছোট ও প্রান্তিক জাতিদেরকে নিয়ে তুলনামূলকভাবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন আম্বেদকরপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা গড়ে তুলেছে। আম্বেদকরকে শুধুমাত্র প্রতীক হিসেবে নিয়ে বিজেপি তার সমস্ত আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বইটিও একরকম দলিতদের প্রতি হওয়া অত্যাচারের কথা বাদ দিয়ে শুধু অন্তর্নিহিত কলহ দেখিয়ে বিজেপির হিন্দু মৌলবাদী ভাবধারাকে সুযোগ করে দিয়েছে। আলাদা করে হয়তো লেখাগুলি নিরীহ কিন্তু একটি বইয়ের আকারে যখন সেটিকে বের করা হয়েছে, তখন শুধুমাত্র উচ্চবর্ণের চোখে দলিতদের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

জাতের প্রতি মতামত প্রকাশ করতে না দেওয়া হয় গবেষকরা তাদের নৈতিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। ধরে নেওয়া যায় তারা সরাসরি যুক্তিবাদী আন্দোলনের ধারা ভুলে দলিতদের অত্যাচারীদের সাথে হাত মিলিয়েছে।

উচ্চবর্ণের প্রচার করা ইতিহাসে তারা এতটাই মোহান্ধ আমার মনে হয় তারা জানেও না দলিতদের মতামত কি আছে এবং তাদের নিজেদের লেখালেখি, সম্পাদনা ও পড়ানোর মাধ্যমে কিভাবে তারা একটি হত্যাকান্ড লুকানোর কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশী সম্পাদকরা যাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন তারা বেশিরভাগই উচ্চবর্ণের এবং কখনোই ভারত সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হবেন না। বিদেশিদের জানার কথা না কি ধরণের অতীত নিয়ে এরা ভারত থেকে আসেন। এখানে ভারতকে ভুল ভাবে দেখালেই সাফল্য বেশি। সত্যিকারের বর্ণনা সহকর্মীদের, ভারত সরকার ও জনমানসের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী করবে, "অস্বস্তিকর সত্যি' যারা লেখা ক্রমশই সংকুচিত হবে তাদের স্থান। দলিতরা কি করবে এই বিষয়ে তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দলিতদের বিরোধিতার ফলে গবেষণার জগৎে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসছে। এমন সময় আসতেই পারে যেখানে উত্তর আমেরিকার আদিবাসীদের মতো তাদেরকেও সম্পূর্ণ অসহযোগিতার পথ নিতে হবে।

অধ্যাপকদের সাথে দেখা করা হলে তাদের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি অনেকসময় জানা সম্ভব হয় না। বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি থেকে তাদের গণহত্যাকে আড়াল করার প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানা যায়। এবং উচ্চজাতের অভিজাতদের সাথে তাদের যেরূপ সঙ্গ এটি আশা করা ভুল হবে যে তারা তাদের কেরিয়ারের এই পর্যায়ে এসে কোনো দলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে মেনে নেবেন। এস কে মল্লিক আই সি এস অধ্যাপক টি ভি সত্যমূর্তিকে সাক্ষাৎকার দেননি কিন্তু অন্য কোনো দলিতের পক্ষে এই ভাবে প্রভাবশালীদের কে প্রত্যাখ্যান করার সম্ভাবনা খুবই কম।[185] গ্রামে থাকা দলিতদের জন্য যেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ

---

[185] ইয়েল ইউনিভার্সিটির উইমেনস স্টাডিজের একজন ইমেরিটাস অধ্যাপক ইন্দরপাল গ্রেওয়ালের একটি প্রবন্ধ যখন আমি পেলাম, তখন আমি এই নিবন্ধটি পাঠিয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমার পূর্বপুরুষেরা যেহেতু আইসিএসে একমাত্র দলিত ছিলেন, তাই তিনি আমার নিবন্ধটি প্রকাশ করতে আগ্রহী হতে পারেন। উত্তরে জানতে চাওয়া হয় যে তারা কোনও স্মৃতিকথা লিখেছিল কিনা যা তিনি ও সংগ্রহ করছিলেন। অনুরোধে প্রতিদানের কোনো প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যা দৃশ্যত দলিত অস্মিতাকে আঘাত করে। আমার চাচা প্রফেসর সত্যমূর্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তিনি যে সত্যিই দরিদ্রদের প্রতি আগ্রহী সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, এবং যদি না অধ্যাপক গ্রেওয়াল তাঁর লেখায় অন্যথা প্রমাণ করতে না পারেন তবে একটি গোপন স্মৃতিকথা শেয়ার করার কোন কারণ ছিল না। ভূমিকার বিপরীতে আমি তাঁকে মানবাধিকারের উপর তার একটি নিবন্ধ পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছিলাম, যা পরিবারকে তার সাথে শেয়ার করতে রাজি করতে পারে। কোন ফেরত চিঠিপত্র আসন্ন ছিল. তার গবেষণাকে সত্যিই দরকারী কিছুতে পুনঃনির্দেশিত করা আমাকে স্মৃতিকথা শেয়ার করতে রাজি হতে পারে। অভিজাত ও অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী নারীদের হয়রানি ও চাকরিতে পদোন্নতি নিয়ে কর্মজীবনের অভিযোগ প্রকাশ না করে কেন মারিচঝাপিতে দলিত নারীদের গণধর্ষণ ও গণহত্যা নিয়ে লিখবেন না? পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্নাতক হওয়ার সাথে সাথে তিনি রাজ্যের সাথে পরিচিত হবেন এবং এখন যেহেতু বামফ্রন্ট দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে ছিল তা ভারতের বাকি অংশের মতোই নিরাপদ হবে। এমন অনেক লোক ছিল যারা এটি করতে পারত, কিন্তু সমস্ত দশক পরেও বামফ্রন্ট শাসনের অধীনে মারিচঝাপি বা রাজ্যের বাকি অংশে যে রাজনৈতিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে এখনও কোনও গবেষণা হয়নি। এটি এখনও বয়স্ক জীবিত ব্যক্তিদের সাক্ষাতকারের মাধ্যমে করা যেতে পারে তবে বার্লিনের একটি মহিলার মতো কিছুই প্রকাশ করা হয়নি: এইট উইকস ইন দ্য কঙ্কার্ড সিটি। দিল্লিতে একজন অবিবাহিত মহিলাকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যার ফলে দলিত পুরুষদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ, সিপিএম ক্যাডার এবং গুন্ডাদের দ্বারা মারিচঝাপিতে

মানে অত্যাচার এবং মৃত্যু, শোষিত হওয়া সখ্যালঘুদের আন্দোলন করার সুযোগ নেই বললেই চলে। দলিতদের মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকার না করে এই সমস্ত গবেষকদের কখনোই সাহায্য করা উচিত না। দলিতদের অধিকারের কথা উল্লেখ না করলে দলিতদের কাছে ওই গবেষণার কোনো তাৎপর্যই নেই। ৩০০ টি জমা হওয়া লেখার মধ্যে দলিত স্টাডিজ ১০জন নির্বিবাদী লেখককে আমেরিকা ঘোরার ও প্রবন্ধ প্রকাশনার সুযোগ দিয়েছিলো। যে বইটি প্রকাশিত হতো সেখানে অত্যাচারের কথা বাদ দেওয়ার জন্য তাদেরকে নিশ্চিতরূপে অনেক খাটাখাটনি করতে হয়েছিলো। একাডেমিক জগতের এটাই রীতি। দলিতদের এই ধরণের জগতে অনুপস্থিতির মানে অবশ্য এই নয় যে তাদের মতামতের অস্তিত্ব নেই। সব জায়গা থেকে এই লেখাটি বাদ দিয়ে বুদ্ধিজীবীরা বুঝিয়ে দিয়েছেন গণহত্যার কথা লুকানোর বা দলিতদের কণ্ঠ রোধ করার জন্য তারা কতদূর অবধি এগোতে প্রস্তুত। শুধুমাত্র সম্পাদকদের উপর নয় বিশ্ববিদ্যালয় ও সংগঠনগুলির উপরেও এর খারাপ প্রভাব পড়েছে। শেষ পর্যন্ত এই লেখাটি দেখিয়ে দিয়েছে তারা কোনদিকে আছে। সাবল্টার্ন সম্পর্কে আলোচনা করার সময়ে নিজের আখের গুছিয়ে দলিতদের শূন্য হাতে ফেরানো প্রচলিত পদ্ধতি হয়ে উঠেছে কিন্তু বিকল্প প্রকাশনার অভাবে কিছু সুবিধেবাদীর স্বার্থে আসল সত্যি আর সামনে আসার সুযোগ পায়নি।

মহিলাদের গণধর্ষণ ও হত্যার তদন্ত পর্যন্ত হয়নি, ফাঁসি দেওয়া দূরে থাক। তিহার কারাগারের এক মনোবিজ্ঞানীর মতে ধর্ষকরা নিজেদের স্বপক্ষে অজুহাত দেখিয়েছিল কারণ ধনীরা অর্থ দিয়ে তাদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারে, যখন তাদের সাহসের সঙ্গে এমনটা করতে হয়েছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষদের মানসিকতা নির্দেশ করে, কিন্তু একটি গভীর সামাজিক সমস্যাও। নারী আন্দোলন দলিতদের কাছে না পৌঁছালে, তাদের প্রচারাভিযানটিকে দলিতদের উপর তাদের আধিপত্য প্রয়োগ করার জন্য প্রভাবশালী জাতিদের আরেকটি প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হবে, এবং তাদের রক্ষা করার পরিবর্তে নিপীড়নের জন্য কাজ করে এমন আইন মানার কোন কারণ দেখতে পাবে না। শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ আমেরিকানদের কালো পুরুষদের হাত থেকে শ্বেতাঙ্গ নারীদের রক্ষা করার প্রয়াসের সাথে এবং বর্ণ বিশুদ্ধতার বিষয়টির সাথে উল্লেখযোগ্য সমান্তরাল রয়েছে যা এই ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত। ডিএনএ পরীক্ষা দেখায় যে ঐতিহাসিকভাবে উচ্চবর্ণের পুরুষদের দলিত মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল কিন্তু দলিত পুরুষদের উচ্চ বর্ণের মহিলাদের কাছে প্রবেশাধিকার ছিল না, যা উচ্চ বর্ণের জন্য বিশেষভাবে ঘৃণ্য করে তোলে। (অনলভা বসু, নীতা সরকার-রায়, পার্থ পি. মজুমদার, "ভারতের বিদ্যমান জনসংখ্যার ইতিহাসের জিনোমিক পুনর্গঠন পাঁচটি স্বতন্ত্র পূর্বপুরুষের উপাদান এবং একটি জটিল কাঠামো প্রকাশ করে", মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেসের কার্যধারা, ফেব্রুয়ারী ৯, ২০১৬, ১১৩ (৬) ১৫৯৪-১৫৯৯) যদিও মিডিয়া আমার জানামতে এই জাতপাতের প্রশ্নটি উত্থাপন করে না, তবে প্রধান বর্ণ এবং দলিত শিকারদের চিকিতসার ক্ষেত্রে সমতার অভাবটি খুব স্পষ্ট। দলিত নারীরা হাজার হাজার বছর ধরে ধর্ষণের শিকার হয়েছে জেনেটিক পরীক্ষার দ্বারা নির্দেশিত, কিন্তু কার্যত কেউ এটি সম্পর্কে কিছু করেনি। তুলনামূলকভাবে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নারীরা যে মুহূর্তে ধর্ষিত হয়, দলিতরা ছাড়া সবাই হৈচৈ পড়ে যায়। নারী আন্দোলন মরিচঝাঁপি সম্পর্কে কিছুই করেনি, যদিও এটি গবেষণা করা ন্যায়বিচারের জন্য একটি সহায়ক প্রচেষ্টা হতে পারে যা সাধারণত শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। দলিত মহিলাদের ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের উত্তর দেওয়ার অনেক কিছু ছিল, এবং এটি ধর্ষণ ও গণহত্যার তদন্তের দাবির মাধ্যমে এটি সংশোধন করার চেষ্টা করে নিজেকে মুক্ত করতে সাহায্য করতে পারে। তবে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দলিত মহিলাদের মতো ছিল না, এবং যদিও তারা একই দেশে বাস করত, এটি ছিল তাদের সাধারণতার পরিমাণ। এটা স্বাভাবিক যে তারা যে কোর্সটি করেছিল তা তারা গ্রহণ করেছিল কারণ ব্যক্তিগত তাদের জন্য খুব আলাদা ছিল, তাই রাজনৈতিক একটি মোড় নিয়েছিল যা কার্যকরভাবে দলিত মহিলাদের বাদ দিয়েছিল। আমি এটি লেখার পরে বিশিষ্ট মহিলা সাংবাদিক, তাভলিন সিং, একই জিনিস প্রকাশ করেছিলেন। (তাভলিন সিং, "ধর্ষণ রাজনৈতিক হয়ে উঠলে বর্ণনাটি পরিবর্তন করা এমন একটি বিষয় যা "নতুন ভারতে" আদর্শ হয়ে উঠেছে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, আগস্ট ৮, ২০২১)।

দলিত স্টাডিজ বইটির পিছনে যতটা জানা গিয়েছে ততটাই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জার্নাল অফ জেনোসাইড রিসার্চে জমা দেওয়ার ঘটনা সব থেকে ভাবিয়েছে। লেখা প্রকাশনা করার শর্তাবলী দলিতদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিদেশি ও ভারতীয় প্রকাশকদের মতামতের থেকে ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা। দলিতদের মুক্তি আটকাতে গান্ধী অনশন করেছিলেন কিন্তু তাদের বক্তব্য ছিলো "আমরা এতো বিশদ বিশ্লেষণ লিখতে পারবো না" এর ফলে আদৌ দলিতদের নাকি গণহত্যার হুমকি দেওয়া হয়নি।[186] ১৯৩০ এর দশকে গান্ধীর ক্ষমতা ও পরিচিতি ছিলো অপরিসীম তিনি মারা গেলে বা মৃত্যুর সামান্য সম্ভাবনা হলে দলিতদের গণহত্যা ছিল অবধারিত হয়তো তারা নিজেরাই নিজেদেরকে হত্যা করতো। এটি হয়তো বিশ্বের বৃহত্তম গণহত্যা হয়ে উঠতে পারতো। এরপরেও গান্ধীর স্পর্ধা ছিলো আম্বেদকরকে এটি বলে সমালোচনা করার, "এদের মতো মানুষের জন্য শেষ উপায় যেভাবেই আসুক তাই ঠিক"[187] যেখানে তিনি নিজে মিথ্যাচার করে গণহত্যার ভয় দেখিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন।

মাত্র ১৬% এর সংখ্যালঘু হওয়ায় উচ্চবর্ণের ইচ্ছের সামনে তারা ছিল অসহায়। হিংস্রতার চল এতটাই ছিলো যে গান্ধীকে নিজের অহিংস অসহযোগ প্রত্যাহার করতে হয়েছিলো। কয়েকবছর পর দেশভাগের সময় গণহত্যার সম্ভাবনা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিলো। এই ক্ষেত্রে দুই পক্ষই লড়াই করেছিলো একে অপরের সাথে কিন্তু দলিতদের কাছে সেই সুযোগ ছিলো না। দলিতদের জগতের সাথে বাকিদের ফারাক বোঝা যায় গান্ধীর অনশন থেকে এটি ছিলো একজন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর কাছে বিতর্কিত কিন্তু একজন দলিতের কাছে সম্ভবত মৃত্যর কারণ। এইভাবে যে একটি গণহত্যার উপর গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া জার্নাল এই বিষয়টি এড়িয়ে গেছে তাতে স্পষ্টতই শুধুমাত্র কিছু উচ্চবর্ণের চাপে ও গান্ধীজির অতিরঞ্জিত খ্যাতি বাঁচাতে তাদের লক্ষ্য থেকে তারা সরে এসেছে। এটি দলিতের দ্বারা বিশ্লেষিত ভারতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লুকানোর চেষ্টা।[188] গান্ধী সম্বন্ধে অনুকূল ধারণা দলিতদের মধ্যে ভারতের ইতিহাসচর্চা কে বারবার প্রভাবিত করেছে। দলিতদের অনেককেই ভুল বোঝানো হয়েছে বৃদ্ধ বয়সে অনুশোচিত গান্ধী আম্বেদকরকে আইনমন্ত্রী করে ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিত বিষয়ক ইতিহাসের অধ্যাপক এলিয়নর জেলিওট ও একই কথা বলেছেন আম্বেদকর স্মৃতি বক্তৃতায়। বর্তমানের বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়ে দিয়েছে এটি একটি অতিকথা মাত্র, গান্ধীর অনুগামীরা তার অনশনের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা আটকাতে এই কথা প্রচার করেছিলেন।[189] গান্ধীর অনশনের ঘটনা ছেড়ে দিয়ে বিতর্ক হয় সেন্ট টেরেসাকে নিয়ে। জার্নালটি তার সম্বন্ধে সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করতে রাজি ছিলো না। ইউটিউবে আমার এক সহকর্মীর থেকে পাওয়া তার সরাসরি

---

[186] ডির্ক মোজেস এন্ড শুভাশীষ রে, এডিটরস, জার্নাল অফ জেনোসাইড রিসার্চ, ইমেল ৯ই সেপ্টেম্বর ২০২০।

[187] গান্ধী কোটেড ইন জেসাস এফ ছাইরেজ-গার্জা, "বি আর আম্বেদকর, পার্টিশন এন্ড দ্য ইন্টারনেশনালাইজেশন অফ আনটাচেবিলিটি, ১৯৩৯-১৯৪৭", ২০১৯ সাউথ এশিয়া: জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ, পৃ: ২৪ ইন academia.edu খসড়া।

[188] অনুদ্ঘাটত বিভিন্ন ঐতিহাসিক সম্ভাবনা সম্পর্কে অ্যাকাডেমিক কাজের জন্য জিওফ্রে হথর্নের প্লসিবেল ওয়ার্ল্ডস্ : পসিবিলিটি অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইন হিস্ট্রি অ্যান্ড দ্য সোশাল সায়েন্সেস, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১, দ্রষ্টব্য।

[189] জেসাস এফ চাইরেজ, "বি আর আম্বেদকার, পার্টিশান অ্যান্ড দ্য ইন্টারন্যাশনালাইজেশন অফ আন্টাচেবিলিটি, ১৯৩৯-১৯৪৭", সাউথ এশিয়া: জার্নাল অফ সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ ২০১৯, ৪২:১, ৮০-৯৬, অ্যাকাডেমিয়া.এডু, পৃ - ২৫।

সাক্ষাৎকারটি প্রমান হিসেবে যথেষ্ট ছিলো না।[190] কেউই এটি নিয়ে সন্দেহ করবে না যে সেন্ট টেরেসা বিষয়টি জানতেন রাজনৈতিকভাবে সচেতন কলকাতার আর চার পাঁচজনের মতন। বামফ্রন্ট সরকারের নিষেধাজ্ঞার আগে পর্যন্ত অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মতো তিনি শরণার্থীদের ত্রাণের ব্যবস্থা করেছিলেন। বিনা প্রতিবাদে তিনি সাহায্য পাঠানো বন্ধ করে দেন। তার সামনে সুযোগ ছিলো সরকারের কাছে বা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রতিবাদ জানানোর। কিন্তু এইসব ছেড়ে তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সরকারের সাথে সখ্যতা বজায় রাখা। আমি এই গণহত্যার পিছনে তার এই ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলাম কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

জার্নালটি গণধর্ষণ ও গণহত্যার ব্যাপারে লেখা ছাপাতে রাজি ছিলো কিন্তু ভারতের দুই খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বকে সমালোচনা করতে তাদের বারণ বুঝিয়ে দিয়েছিলো এই ধরনের গবেষকদের মানসিকতা কেমন হয়। এই সমস্ত নেতাদের কোনো মতামতের গুরুত্ব ছিলো না।

এটি ছাড়াও কোনোভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যর সাথেও এর তুলনা করা না পসন্দ ছিলো। আমি দুটি দেশেই থেকেছি দক্ষিণ আফ্রিকাতে অকৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে ও ভারতে গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি অনেক সুরক্ষিত ছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আইনকানুন ছিলো বর্ণবিদ্বেষী, পুলিশ নিজেই ছিলো হিংস্র। গ্রামীণ ভারতে একজন দলিত যেকোনো সময় সম্মুখীন হতে পারে গণরোষের, উচ্চবর্ণের মদতে সেখান থেকে হতে পারে মৃত্যুও এবং পুলিশ কিন্তু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আসবে ধীরে সুস্থে।

সম্পাদকরা আবার বলেছিলেন ভারতীয় সরকারি ব্যবস্থাকে 'নৃশংস' বলা যাবে না, এই বিষয়ে মরিচঝাঁপির বেঁচে থাকা মানুষরা হয়তো অন্য মতামত দেবেন। আইএএস/আইসিএস থেকে সমাজের নিচুতলা অবধি আমার অনেক আত্মীয় আছেন কিন্তু কাউকেই মনে পড়ে না সরকারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভালো কিছু বলেছেন বলে।[191] সম্পাদকদের এই মন্তব্য দেখিয়ে দেয় গরিব ও অসহায় মানুষদের দুনিয়া থেকে তারা কতটা আলাদা। যখন লেখকদের সম্পাদকের কথা মেনে সেন্সরশিপের আশ্রয় নিতে হয় তখন অন্য জায়গায় প্রকাশনার আবেদন করাই ভালো। সম্পাদকরা আমার কিছু সোর্সের রাজনৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে আমাকে জানান যেটি আমার অজ্ঞাত ছিলো। তারা মরিচঝাঁপিকে যথার্থ ভাবেই জনমানসে তুলে ধরেছেন এবং আমার পক্ষে সম্পাদকদের কথা যাচাই করারও সুযোগ ছিলো না। আমায় অনেকে মাওবাদী ও দলিত বলে অনেকে লেখালেখি করেছেন এবং গোপনেও অনেক কথা বলা হয়েছে তাই আমি তাদের কথায় লেখকদের রাজনৈতিক পরিচয় মেনে নিতে রাজি ছিলাম না। যেহেতু গণহত্যার অনেক প্রমাণ ছিলো এই বিষয়ে বিচারের দাবি বন্ধ করার সবচেয়ে প্রচলিত উপায় ছিলো লেখকদের দুর্নাম করা, বহু দশক ধরে আমি এই পদ্ধতি দেখে আসছি।

---

[190] মরিচঝাঁপি টরচার্ড হিউম্যানিটি, ইউটিউব।

[191] ভারতীয় প্রশাসন সম্বন্ধে পারিবারিক মতামত দেখার জন্য দেখুন সুমিত মল্লিক আইএএস, মুখ্যসচিব মহারাষ্ট্র, সিডিউসিং পেন, ২০০৭, ৪২৯ পৃষ্ঠা

যারা যারাই এই বিষয়ে লেখালেখি করেছেন বা গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন নিছক তর্ক-বিতর্কে না জড়িয়ে তাদের সাহসিকতার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত।

বামফ্রন্ট সরকারের ভালো কাজগুলি সমর্থনের জন্য তারা আমাকে বলেন' সোনার বাংলা' এর কথা উল্লেখ করতে।[192] বহু বছর আগে প্রকাশিত এই বইটির লেখকদের বা সমমানসিকতার লোকেদের সাথে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলেছিলাম। তারা আমায় বলেছিলেন তখনকার শাসকদল সিপিএমের সমর্থনে তাদের বেছে দেওয়া গ্রামে তারা গেছিলেন এটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি তাদের লিখিত সমালোচনার অপেক্ষা করেছিলাম কিন্তু তারা পাঠাননি। একই গ্রামগুলিতে বারবার বিদেশী গবেষকদের পাঠানো হতো। বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অনেক সমালোচনা এসেছে কিন্তু সেটি পর্যবেক্ষণের কারণে না আদর্শগত পরিবর্তনের ফলে সেটি বলা মুশকিল। তার মানে এই নয় সাধারণ গ্রামগুলিকে নির্বাচন করা হতো না। একজন ম্যাকগিল অধ্যাপক যিনি সক্রিয় সামাজিক আন্দোলন আছে এমন একটি গ্রামে যেতে চেয়েছিলেন গিয়ে দেখেন গ্রামটিতে কোনো আন্দোলন হয়নি।[193] স্থানীয় নেতারা বড়ো বড়ো দাবি করে নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে গিয়ে এই গ্রামের কথা উল্লেখ করলে দলের সর্বোচ্চ নেতারা অধ্যাপককে পাঠানোর আগে যাচাই করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। অশান্তির আশঙ্কা এবং অন্যান্য আরো কারণে আসল কি ঘটনা ঘটেছিলো তা বাদ চলে যায়। "কিছু কিছু জেলায় নিয়মিত হিংসার ঘটনা গবেষকদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ফিল্ড ওয়ার্কের জন্য, আগে থেকে সরকারের অনুমতি ও সমর্থন পাওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এই কারণে।[194]

সবচেয়ে গুরুতর দাবি ছিলো হিন্দু ধর্মের সমালোচনাকে বাদ দেওয়া। জাতপাত ব্যবস্থা ছিলো হিন্দু ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ, হিন্দু ও অনেক দক্ষিণ ভারতীয় ক্রিশ্চান ও মুসলিম দের মধ্যেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে কিন্তু এই বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করা যাবে না। এই সম্পাদকরা যেই জগতেই বাস করুন না কেন তা কখনোই কোনো দলিতের হতে পারে না এবং দলিতদের নিজেদের ধর্মকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দেওয়া স্বৈরতান্ত্রিক। গবেষকরদের দলিতদের ধর্ম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণীয় নাই হতে পারে কিন্তু সেটি নিয়ে আলোচনার সুযোগ অবশ্যই থাকা উচিত। গবেষণা প্রকাশনাগুলিতে এগুলি বাদ দেওয়া মানে দলিতদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া। কিছু ভক্তর অসুবিধে হবে বলে দলিতদের বক্তব্য সামনে আসবে না এটি মর্মান্তিক। যখন সম্পাদকরা বিশ্বাসে আঘাত না দেওয়ার অজুহাতে যেটি পাঠকরা চাইছেন সেটিই প্রকাশ করেন বিশ্লেষণমূলক লেখার জন্ম নেয় না। হিন্দুধর্ম যে তার প্রচলিত আচারের উর্দ্ধে বহু প্রজন্ম ধরে সংস্কারকরা এটি প্রচার করে সীমিত মাত্রায় কাজে লাগাতে পেরেছেন। ভারতের গ্রামগুলিতে দলিত হয়ে গিয়ে তাদের জন্য নিষিদ্ধ জায়গাগুলিতে যাওয়ার দাবি করলে কিরম প্রতিক্রিয়া আসে সেটি

---

[192] বেন রগালি, বারবারা হ্যারিস-হোয়াইট, সুগত বোস, এডিটরস,'সোনার বাংলা', সেজ পাবলিকেশনস, ১৯৯৯।

[193] সুরজ বন্দ্যোপাধ্যায় এন্ড ডোনাল্ড ভন এসেচেন, "দ্য ইম্প্যাক্ট অফ পলিটিক্স ও রুরাল প্রোডাকশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন: এ কোম্প্যারাটিভ স্টাডি অফ রুরাল পলিসিস এন্ড দেয়ার ইমপ্লিমেন্টেশন আভার কংগ্রেস এন্ড লেফট ফ্রন্ট গভর্ণমেন্টস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল", স্যান ফ্রেন্সিসকো, ২৬ই মার্চ ১৯৮৮, ইন্টারভিউ উইথ ডোনাল্ড ভন এসচেন।

[194] মারিও প্রেয়ার, "দ্য সোশ্যাল কনটেক্সট অফ পলিটিক্স ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল (১৯৪৭-৯২)

দেখলেই বোঝা যায় হিন্দুধর্মর রীতিনীতি কিরূপ। এটি অবশ্যই অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি অনুশীলন কিন্তু শহরেও বিয়ের বিজ্ঞাপনগুলি থেকে বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীর মধ্যে কিভাবে জাতপাত বৈষম্য আছে তা ফুটে ওঠে। বেশিরভাগ উচ্চ ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্বজাতের মধ্যে বিয়ের প্রচলন যেরূপ দৃঢ় তাতে মনে হয় না এই বিভেদ খুব শীঘ্রই কাটবে।[195] বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে একটি বুদ্বুদের মধ্যে বাস করেন দলিতদের জীবনের সংগ্রামের কথা না বুঝে তারা নিজেদের অন্যকিছু বোঝাতেই পারেন।[196] একজন দলিত যিনি এই খসড়াটি পড়েছিলেন বলেছিলেন এই বুদ্ধিজীবীদের সবকিছু হচ্ছে 'উপর উপর' কিন্তু তারা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য সেটি তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে না জেনে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তারা ব্যক্তিগত ভাবে যেরকমই হোন, তারা ছিলেন ভীতু।

উচ্চবর্ণের গবেষকদের ও দলিতদের মধ্যে যে আকাশ জমিন তফাৎ দৃষ্টিভঙ্গিতে তা কোনো লেখায় দেখা যায় না কারণ এই কথা তুলে ধরলে কেউ ছাপাতে রাজি হবে না, যেগুলি বেরোয় সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এই অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা। কিছু অংশ বাদ দিয়ে আমি হয়তো লেখাটি প্রকাশ করতে দিতে পারতাম গণহত্যার কথা যাতে গুরত্ব পায় সেটি ভেবে। কিন্তু বেশিরভাগ গবেষণাপত্রগুলির গ্রাহক সংখ্যা খুব সীমিত এবং যারা কিনবেন তারা কিছু করবেন না এবং প্রতিটি সংস্করণের দাম যেখানে ২৬৫ ডলার আমি নিজে হয়তো নিজের লেখা পড়তে পারতাম না। এই খসড়া লেখাটি ইন্টারনেটে প্রকাশ করার পর অন্য কোনো মাধ্যমের থেকে আমি অনেক বেশি পাঠক পেয়েছি। আমি এখনো ভাবছি প্রকাশ না করে সময় দিয়ে একটি বই লেখার কথা, যেটি খুব একটি সহজ কাজ হবে না। প্রথমের দিকে যখন কেবলমাত্র আমি এই গণহত্যা নিয়ে কাজ করছিলাম, করা করা জড়িত ছিলো এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তথ্য জোগাড় করা। চার দশক পর যখন কিছুই করা হয়নি এবং আরো মানুষ ক্রমশ জড়িত হয়েছে, এখন উচিত এই বিষয়ের সমাধান করা। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের জন্য শুধু এই লেখা নয়, এই দলিতরা তাদের অত্যাচারীদের সম্বন্ধে কি ভাবতেন কিন্তু বলতে পারেননি সেটি বাইরে আসাও গুরুত্বপূর্ণ। দলিতরা যাদের চাকরি, পদন্নোতি বা আরো না না বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় নির্ভরশীল তাদের আমার মতো সুযোগ নেই এই কথাগুলি বলার। দলিতদের নিজেদের মতামত সামনে আসলে এই উচ্চবর্ণের অভিজাতদের আদর্শ ও জাতীয়তাবাদ ধাক্কা খাবে সেটি এদের নিজেদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমে কখনোই এরা দেখাবে না। উচ্চবর্ণদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে খুব সহজভাবে তাদের অপছন্দ হওয়া দলিতদের বক্তব্য বাদ দিয়ে

---

[195] ডায়ান কফে, পায়েল হাথি, নিধি খুরানা, অমিত থোরাট, "এক্সপ্লিসিট প্রিজুডিস", ইকোনোমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি, ৬ ই জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ: ৫০।

[196] আঁদ্রে বেটেইলের কেমব্রিজে দলিতদের নিয়ে একটি আপত্তিকর বক্তৃতামালার পর তার বন্ধু জিওফ্রে হথর্ন আমাকে আলাদা করে লিখেছিলেন যে বেটেইলে দলিতদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সংবেদনশীল নন। বক্তৃতাগুলি থেকে এটি বোঝা যায়নি এবং আমি অবাক হয়েছিলাম কিভাবে হথর্ন যিনি আমার জাত প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে কিছু জানতেন না কিভাবে এইটা ভাবলেন। কিন্তু যারা পন্ডিত মানুষ তারা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরেও মানুষের সাথে সংবেদনশীল হবেন। বেটেইলের সম্বন্ধে পর্যালোচনার জন্য দেখুন সংকরণ কৃষ্ণ, "এ পলিটিক্যাল রেসিয়াল/স্পেসিয়াল অর্ডার: গান্ধী, আম্বেদকর এন্ড দ্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য ইন্টারন্যাশন্যাল", ইন রেস্ এন্ড রেসিজম ইন ইন্টারন্যাশন্যাল রিলেশন্স, এডিটেড বাই আলেকজান্ডার এনিয়েভস, নিভি মনছন্দা এন্ড রবি সিলিয়ান, রুটলেজ, ২০১৫, পৃ: ১৫১।

দেওয়া। পাঠকদের কাছে অজানা রয়ে গেছে কিভাবে নানা রকমের রাজনীতি থেকে দলিতদের লেখাগুলি থেকে আসল বক্তব্য বাদ দেওয়া হয়েছে।

গণহত্যার উপরে ইংরেজিতে যথেষ্ট লেখালেখি আছে কিন্তু কোন ধরনের পরিস্থিতি থেকে গণহত্যাটি হয়েছিলো তার খুব সামান্যই বর্ণনা আছে কারণ এই ঘটনাটি ভারত বা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলো। গণহত্যা ও গণধর্ষণ সম্বন্ধে বলা যায় কিন্তু হিন্দুধর্ম ও অন্যান্য ভারতীয় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে প্রকাশনাগুলি কোনো সমালোচনা ছাপাতে রাজি ছিলো না। হয়তো উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিলো। আসলে এই গণহত্যা এখনকার কোনো ক্ষমতাশীলকে উদ্বিগ্ন করবে না কিন্তু হিন্দু ধর্ম বা ভারতীয় তারকাদের ক্ষেত্রে সেটি হবে না। দলিতদের অস্তিত্ব ভারতের কাছে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লজ্জার ব্যাপার। অভিজাত বুদ্ধিজীবীরা যারা এই সমস্ত ব্যাপারে বিব্রত হন ব্যাপারটি লুকিয়ে যান। লেখা জমা দেওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষকরা তাদের মতন করে লেখকদের লেখা চান, লেখকের ইচ্ছে অনিচ্ছেকে প্রাধান্য না দিয়ে। দলিতরা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবীদের তাদের জীবিকায়ে একচেটিয়া আধিপত্য বর্তমান ফলে তারা তাদের কাছে বেসুরো যেকোনো দলিত মতামতকে চুপ করিয়ে দিতে পারেন। এই বিষয়ে কোনো মাপদণ্ড না থাকার ফলে দলিতরা এই উচ্চবর্ণের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন লেখাই প্রকাশ করাতে পারেন। বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করার সুযোগ খুব কম। বোঝা যায় হিন্দু ধর্ম, নেতৃত্বের বা দেশের সমালোচনা নৃশংস ঘটনার থেকেও বেশি নিন্দনীয়।

গান্ধী বা সেন্ট টেরেজার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ধর্ম থেকে এলেও দুজনেই দলিতদের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ধারণা পোষণ করতেন। একজন কংগ্রেসের নেত্রী অনুযোগ করেছিলেন গান্ধীকে দারিদ্রে রাখতে কত খরচ হয়। এটিও বলা হয় যখন সেন্ট টেরেজাকে কলকাতার সেরা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিলো তার অনুগামীরা মিশনারিদের থেকেও খারাপ চিকিৎসা পেতেন। এইগুলি বুঝিয়ে দেয় দারিদ্র নিয়ে তাদের অদ্ভুত মতামত। গান্ধীর কাছে গোটা দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলেও দলিতদের কে তাদের অবস্থাতেই থাকতে হবে এমনকি তার জন্য যদি তাদেরকে গণহত্যার হুমকি দিতে হয়, সেটিতেও উনি প্রস্তুত। অন্য ধর্ম থেকে আসা সেন্ট টেরেসা যন্ত্রণার মাহাত্ম্যের কথা বলতেন এবং কিভাবে তা ভগবানের কাছাকাছি মানুষকে এনে দেয় সেটি লিখতেন। দুজনের দারিদ্র্য নিয়ে অদ্ভুতুড়ে মতামত ছিলো কিন্তু এতে তারা মিথ্যাচার করে নিজেদের মতামত অন্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে ছাড়েননি। গরিব ও দলিতরা তাদের পরিণতি মেনে নেবে অন্যদিকে উচ্চবর্ণরা তাদের আধিপত্য চালিয়ে যাবে খানিকটা বিজেপির মতোই ছিল তাদের চিন্তাধারা। দুজনেই দলিতদেরকে মৃত্যর দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেন্ট টেরেসা সিজার এক্ষত্রে জ্যোতি বসুকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে অন্যদিকে গান্ধী অনশন করে দলিতদের মুক্তি আটকে দলিতদের জীবনে শঙ্কা এনে দিয়েছিলেন। তাদের চিন্তাধারা অভিজাতদের সঙ্গে সহজেই মিলে গেছিলো এবং যে কারণে হয়তো তারা এদেশে এতো বড়ো তারকা হয়েছিলেন।

আমেরিকার প্রখ্যাত ভারত বিশেষজ্ঞ মাইরন উইনার জাতপাত ব্যবস্থাকে অন্যান্য দেশের থেকে ভারতের শোচনীয় শিশুশিক্ষার জন্য দায়ী করেছিলেন।[197] একই কথা বলা যায় মরিচঝাঁপি ও দলিতদের উপর হওয়া অত্যাচার সম্বন্ধে। কিন্তু গবেষকমহলে এইরকম খোলাখুলি স্বীকৃতি কমই আছে। দরিদ্রদের প্রতি বঞ্চনা কার্যত সব দেশেই আছে কিন্তু ভারতে গুরুতর অবস্থার মধ্যে আছে সংখ্যালঘুরা এবং তাদেরকে এই অবস্থা থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা নয় বিদেশী সাহায্য থেকে বা নির্বাচনী গণতন্ত্রর দায়বদ্ধতা থেকে আসে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং দারিদ্রের নির্ণায়ক বিভিন্ন পরিসংখ্যান ভারতের জন্য খুবই আশঙ্কাজনক এবং ভাবাবেগে আঘাত করার ভয়ে এর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। মরিচঝাঁপি হচ্ছে এর চরম প্রতিফলন।

যুগান্তরের একজন সাংবাদিক যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন সেটি হলো, "দন্ডকারণ্যের শরণার্থীরা ছিলেন মূলত কৃষক, জেলে, দিনমজুর, শিল্পী সমাজের নিপীড়িত জনতা। যদি কোনো জমিদার, ডাক্তার বা উকিলের পরিবারের কিছু হয় কলকাতা থেকে দিল্লি অবধি খবর চলে যায়, কিন্তু এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ভূমিহীন গরিব কৃষক ও মৎসজীবীদের জন্য আমাদের কোনো দয়ামায়া নেই। যতদিন রাষ্ট্রের ক্ষমতা উচ্চশ্রেণীর কাছে গরিব অসহায় মানুষরা অত্যাচারিত হতেই থাকবেন।"[198] যদিও অভিজাত একটি পরিবার ছিলো তাদের মধ্যে আমি কোনো কিছু গঠনমূলক করতে পারিনি এবং অন্যরাও পারেনি। এই ব্যবস্থায়ে মানবাধিকারের পথ অত্যন্ত কঠিন ন্যায় পাওয়ার জন্য। কেবলমাত্র আমরা ইতিহাস লিখে যেতে পারি ভবিষ্যতের ন্যায়ের সাফল্যের জন্য।

যখন ভারতীয় গণতন্ত্র বিপদের সম্মুখীন মনে রাখা দরকার এটি আজকের সমস্যা নয়। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি যখন সরকার চালিয়েছে তখনও দরিদ্ররা বিচার পায়নি, মরিচঝাঁপি তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এগুলির ফলে ঔপনিবেশিক আমল থেকে অপেক্ষা করা হিন্দু মৌলবাদীরা সুশাসনের আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে।

গণহত্যা সবার সামনে আনার ব্যাপারে কিছুটা দায় মতাদর্শ ও জাতীয়তাবাদের উপর বর্তালেও কাপুরুষতার ভূমিকাও অনেক আছে। সম্পাদকরা ও বোর্ড সদস্যদের নাম নেওয়া যায় যারা যথা সময়ে তাদের পদ ছেড়ে দেবেন কিন্তু তাদের জার্নালগুলিকে বহু বছর অপেক্ষা করতে হবে দলিতদের কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। জার্নালগুলিকে গণহত্যার পিছনে তাদের প্রচ্ছন্ন মদতের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আমেরিকাতে এটি অনেক জায়গায় হচ্ছে যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণহত্যা বা দাসত্বের পিছনে তাদের ভূমিকা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হচ্ছে। সম্পাদক এবং বোর্ড সদস্যরা বিশেষ সুবিধেজনক পদে আছেন। আমেরিকাতে এটিকে কখনও কখনও "শ্বেতাঙ্গ বিশেষাধিকার" হিসাবে উল্লেখ করা হয় তবে ভারতে এটিকে শাসক জাতির বিশেষাধিকার হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। নিম্নবর্ণের মানুষের সাথে তাদের মিল এটি যে তারা একই ভাষায় কথা বলেন

---

[197] মাইরন উইনার, 'দ্য চাইল্ড এন্ড দ্য স্টেট্ অফ ইন্ডিয়া', প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯১।

[198] রঞ্জিত কুমার শিকদার, "মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার", দ্য অপ্রেসড ইন্ডিয়ান ৪(৪), ১৯৮২, পৃ: ২৩।

তারা নিম্নবর্গের সাথে ভাগ করে নেওয়ার একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল একটি সাধারণ ভাষা কিন্তু তাও দুই প্রান্তের। এই দলের খুব কমজন বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। তারা যখন তাদের পেশায় ভালো অবস্থানে পৌঁছে যান তারা আংশিক সময়ের অধ্যাপকদের ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করেন যা তাদের বেতনের তারতম্য থেকে স্পষ্ট। প্রকাশনার দিক থেকে শ্বেতাঙ্গ ও উচ্চবর্ণের মিলিত প্রভাব দলিতদের উপর হওয়া যেকোনো অত্যাচারের ঘটনাকে সামনে আনা অসম্ভব করে দেবে।

খুব কম দলিতদের সুযোগ আছে গবেষকদের সম্পর্কে নিজেদের মতামত দেওয়ার বিশেষ করে তাদের নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এই প্রবন্ধটি দেখিয়ে দেয় গবেষকদের পক্ষে দলিতদের মানবাধিকারে হস্তক্ষেপের ঘটনা তুলে আনার সম্ভাবনা কতটা ক্ষীণ। গবেষকদের দায় হিসেবে এটি বর্তায় যে তারা তাদের সদিচ্ছা দেখান এবং দলিতদের যেন দেখার অধিকার থাকে তাদের উপর কি লেখা হচ্ছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সমস্ত গবেষকরাই এই বিষয়ে নিরাশ করেছেন। মেরুদন্ডহীন এই জার্নালগুলির পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুবই কম।

আমার অভিজ্ঞতায় "এটি হচ্ছে অবহেলিত ও আলাদা করে দেওয়ার ঘটনা",[199] কিন্তু আমি একা ছিলাম না। লেখক সজীব সান্যালের মতামত অনুযায়ী, "আমি অনেকবার এই ঘটনার (মরিচঝাঁপি গণহত্যার) কথা বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে তোলার চেষ্টা করেছি কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সভায় কেউ না কেউ খুব তাড়াতাড়ি আমাকে চুপ করিয়ে দিতো, তো এই নয় যে লোকেরা জানতো না যার জানার দরকার সে ঠিকই জেনে নিতো কিন্তু আমাদের স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়ার বারবার চেষ্টা হয়েছে।"[200] বিবেক দেবরায় বলেছেন, "সমস্ত বাঙালিরা শুধু বামপন্থীরা নয় কোনো না কোনো ভাবে দোষের ভাগিদার।"[201] আরও বিশদে যে সমস্ত গবেষকরা এই বিষয়ে লেখালেখি করতে পারতেন কিন্তু জানাজানি হওয়া আটকে দিয়েছেন তারাও গণধর্ষণ ও গণহত্যার জন্য দায়ী। অন্যান্য ভারতীয় গণহত্যা যেমন বিজেপি শাসিত গুজরাট বা কংগ্রেসের শিখবিরোধী দাঙ্গা থেকে মরিচঝাঁপি আলাদা কারণ সিপিএমের রাজনৈতিকদের কোনো অজুহাত ছিলো না আইনি বিপদ থেকে বাঁচার। তারা মৃতের সংখ্যা কমানোর কোনো চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। কিন্তু তারা করেনি কারণ এর কোনো পরিণতি তাদেরকে ভুগতে হতো না এবং তারা জানতো ভারত দেশটিই এমন এই ঘটনার কথা ভুলিয়ে দেওয়া হবে, ও কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ বাদ দিয়ে উচ্চবর্ণদের সমর্থনে বিচারব্যবস্থার ফাঁক দিয়ে তারা নিষ্কৃতির পেয়ে যাবে।

---

[199] বিবেক দেবরয়, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, বইয়ের আলোচনা/ ব্লাড আইল্যান্ড: অ্যান ওরাল হিস্ট্রি অফ দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার, ইউটিউব।

[200] সঞ্জীব সান্যাল, প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ মন্ত্রক,ভারত সরকার, বইয়ের আলোচনা/ব্লাড আইল্যান্ড: অ্যান ওরাল হিস্ট্রি অফ দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার, ইউ টিউব।

[201] বিবেক দেবরয়, বইয়ের আলোচনা/ ব্লাড আইল্যান্ড: অ্যান ওরাল হিস্ট্রি অফ দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার, ইউটিউব।

মাওবাদী থেকে ফ্যাসিবাদী যেকোনো রাজনৈতিক অবস্থানকে সমর্থনের জন্য গণহত্যাটিকে ব্যবহার করা যায়। আমার লেখাকে নিজেদের পছন্দমতো কাটছাঁট করে নানা রকম ব্যক্তিগত মতামত প্রচারে ব্যবহার করা হয়েছে। একবার একটি ব্লগ বেরিয়েছিলো যেখানে এই খসড়াটিকেই একটিমাত্র সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[202] আমার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সমালোচনাগুলি বাদ দিয়ে শুধু মাদার টেরেসার ভূমিকা উল্লেখ করা হয়েছিলো। তিনি মরিচঝাঁপির সঙ্গে সরাসরি জড়িত না থাকলেও রাজনৈতিকভাবে তাকে বেছে নেওয়া হয়েছিলো। এই অবরোধ সম্পর্কে চুপ থেকে "কলকাতার সেন্ট টেরেসা" সরকারের ত্রাণ সামগ্রী বন্ধ করার নীতি মেনে নিয়েছিলেন এবং দায়ী ছিলেন হাজার হাজার শিশুমৃত্যুর জন্য। তার আন্তর্জাতিক পরিচিতিকে ব্যবহার না করে ঘটনাটি আড়াল করার জন্য তার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে কিন্তু এই গণহত্যার পিছনে হিন্দুধর্মের ভূমিকা উল্লেখ না করে এটি বলা যায় না। জ্যোতি বসুর সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিলো তাকে চাপ দিয়ে তিনি সেটি হয়তো নষ্ট করতে চাননি। হাইতির মতো দেশগুলিতে তিনি যেভাবে স্বৈরাচারীদের পরামর্শ দিয়েছেন তাতে তার এই ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়।[203]

গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সাক্ষ্যাৎকার নেওয়ার সুযোগ ক্রমশ কমে আসছে কারণ বেশিরভাগই অবসর গ্রহণ করেছেন বা মারা গেছেন। শরণার্থীদের নেতারা মারা গেছেন এবং যারা বেঁচে আছেন তাদের দারিদ্রের কারণে বাঁচার সম্ভাবনা কম (দলিতদের গড় আয়ু ৪৮ যেখানে ভারতীয়দের ৬০ ও আমেরিকানদের ৮০)।[204] এই কথা মাথায় রেখে লেখক গণহত্যায় বেঁচে থাকা মানুষদের সাক্ষ্যাৎকার রেকর্ড করতে ও বাংলা বইগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য অর্থসাহায্য করেন যাতে ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে এর উপর তদন্ত করা যায়। ডঃ সামন্তর জন্য আমাকে অর্থসাহায্য করতে হয়েছিলো কারণ বইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো প্রকাশনার জন্য।[205] আমি ভেবেছিলাম লেখকের পরিচিতির জন্য

---

[202] ওয়াভারিং রানি, মরিচঝাঁপি – এ ডেসপিকেবল সাগা অফ দ্য লেফটিস্ট ব্লাডবাথ ইন সুন্দরবনস্, অজ্ঞাত।

[203] ক্রিস্টোফার হিচেন্স্, দ্য মিশনারি পজিশন: মাদার টেরেসা ইন থিওরি অ্যান্ড প্র্যাক্টিস, ভার্সো ১৯৯৫।

[204] রমেশ ভেঙ্কটরমন, "আনডুইং ইনজাস্টিস এগেন্সট দলিতস্ রিকোয়ারস্ আপার কাস্ট সাপোর্ট", ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, জানুয়ারি ৯, ২০১৯।

[205] এই বইগুলো প্রকাশ করলে আমার নাকি ডক্টর সামন্তের বয়ান বেশি বিশ্বস্ত তা নিয়ে বিতর্কের অবসান হবে না। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপারেশনাল লিডার হিসাবে ডাঃ সামন্তের কাছে এমন তথ্য আছে যা আমার পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। . আশা করি কোনো একদিন ড. সামন্ত সেসবের একটি পূর্ণ স্বীকারোক্তি দেবেন। এটি এখন আকাশকুসুম বলে মনে হচ্ছে কারণ তিনি দীপ হালদারের বইয়ের জন্য সাক্ষাতকার দিতে অস্বীকার করেছিলেন, দাবি করেছিলেন যে দুর্ঘটনাজনিত মিস ফায়ারে শুধুমাত্র একজনের মৃত্যু হয়েছিল। "[বামফ্রন্টের মন্ত্রী] গাঙ্গুলী, পঁচাত্তর, একমাত্র সিপিএম নেতা বা পুলিশ কর্মকর্তা যিনি এই বিষয়ে আমার সাথে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। অমিয় কুমার সামন্ত, পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট যিনি অপারেশন মরিচঝাঁপির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতেও অস্বীকার করেছিলেন, বলেছিলেন যে তিনি জানেন 'আপনার মতো লোকেরা আমাকে নিয়ে এবং ঘটনা সম্পর্কে কী লিখবে। আমি ঘটনার অনেক পক্ষপাতদুষ্ট, নির্লজ্জভাবে বিকৃত বর্ণনা পড়েছি।' বারবার আশ্বাস দেওয়ার পরেও আমি আদতে যা চেয়েছিলাম তা হল ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে মরিচঝাঁপিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা-বিষয়ে তাঁর বয়ান। (ব্লাড আইল্যান্ড, কিন্ডল ১৩২৩) একটি ফেসবুক বিতর্কে তাঁর বয়ানটি অন্তত একজন পাঠকের দ্বারা আরও বিশ্বাসযোগ্য পাওয়া গেছে। "#মরিচঝাঁপিতে আসলে কী ঘটেছিল? কে আমাকে বলতে পারে? আমি রস মল্লিকের বক্তব্য বা এর উইকিপিডিয়া সংস্করণ চাই না, যার বেশিরভাগই, আমি

.[অনুবাদক পাওয়া খুব কঠিন হবে না। যে সমস্ত গবেষকদের সাথে লেখকের মরিচঝাঁপির বিষয়ে কথা হয়েছে তারা কেউ অনুবাদের অনুরোধে উত্তর দেননি। অধ্যাপকরা যারা গণহত্যার উপর আমার লেখা ব্যবহার করেছেন তারাও অনুবাদক খুঁজে দেওয়ার ব্যাপারে পিছিয়ে এসেছেন। গবেষকরা যারা আমার লেখা উল্লেখ করেছেন তারা কোনো সহযোগিতা করেননি অন্যদিকে গবেষণার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন মানুষেরা টাকা নিয়ে চলে গেছেন কিন্তু কাজ করেনি। দূর থেকে এই কাজ করার ফলে ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিলো প্রজেক্টটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে যতটা করা সম্ভব হয়েছিলো আমি করেছিলাম। অমিতাভ ঘোষ যাকে আমি অক্সফোর্ডে ডক্টরেট করার সময় থেকে চিনতাম বলেছিলেন, মরিচঝাঁপি "নিয়ে কলকাতার গণমাধ্যমে ইংরেজি ও বাংলাতে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটি নিয়ে একটিমাত্র প্রামাণ্য ঐতিহাসিক কাজ আছে সেটি রস মল্লিকের।"[206] "যতদিন না রস মল্লিক এটিকে পুনরাবিষ্কার করে ঘটনাটিকে ইতিহাস থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিলো।"[207] এটিকে ইতিহাসের মধ্যে রাখার জন্য পরবর্তী প্রজন্মকেও সামিল হতে হবে। পুনরুদ্ধারের কাজ করতে গিয়ে আমি হয়তো কেরিয়ার খুইয়েছি এবং অত্যাচারিত হওয়া মানুষরাও কিছুই পায়নি। প্রচার করার জন্য শুধুমাত্র ইন্টারনেটে থাকা যথেষ্ট নয়। ঘটনাটিকে ভারতের স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এখানেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত নয় কিন্তু রাস্তার উন্নতির সাথে মরিচঝাঁপি কলকাতা থেকে হয়তো মাত্র এক ঘন্টা দূর হয়ে যাবে। দ্বীপটিতে একটি সংগ্রহশালা বানানো উচিত এবং বেঁচে থাকা মানুষদের বা তাদের বংশধরদের এখানে এনে থাকতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হোক যাতে দর্শকরা তাদের সাথে সরাসরি এই বিষয়ে কথা বলতে পারেন। যদি কুমিরমারি দ্বীপে যেখানে প্রথম হত্যাকান্ডটি চালানো হয়, না করা যায় কলকাতার দিকে এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আলাস্কার একটি সংগ্রহশালায় আমি একজন বৃদ্ধাকে দেখেছিলাম যিনি শ্রোতাদের সাথে তার যুবা বয়সের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতেন। সংগ্রহশালাটিতে সমস্ত মদতদাতাকারীর নাম ও ছবি থাকা উচিত, এছাড়া প্রচ্ছন্ন সমর্থন দেওয়া সমস্ত বুদ্ধিজীবী, জার্নাল ও প্রতিষ্ঠানগুলির নামও যোগ করা হোক এর সাথে। অজানা মৃতদের মতো নয়, এদের নাম ইন্টারনেটে সব জায়গায় পাওয়া যায়। সরকারের বিভিন্ন নেতাদের পিছনে বাহারি টাকা খরচ না করে দলিতদের দুর্দশা নিয়ে একটি সংগ্রহশালা করলে সেটি অনেক কাজে দেবে। অন্যান্য দেশে এমনকি আমেরিকাতেও যে সমস্ত আদিবাসীরা

বিশ্বাস করি, বেশিরভাগই শোনার উপর ভিত্তি করে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা হয়েছে। ...[ডাঃ. সামন্ত] বরং বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।" সৌমেন মিত্র, অক্টোবর ১০, ২০১৩। অন্যদিকে জয় কর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নেয়। "আমি এইমাত্র রস মল্লিকের এই লেখাটি পড়া শেষ করেছি – "বন সংরক্ষণে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন: পশ্চিমবঙ্গ নীতি পরিবর্তন এবং মরিচঝাঁপি গণহত্যা" – এত বছর পরে এটি সম্পর্কে পড়তে গিয়ে আমার গা রি রি করছে। আমি লজ্জিত যে এটি এমন একটি রাজ্যে ঘটতে পারে যেখানে আমার বাড়ি। ইতিহাসকে এই সত্যটি উন্মোচন করতে হবে এবং মৃতদের প্রতি এইটা আমাদের দায়।" দীপ হালদার তাঁর বইতে আমার নিবন্ধটিকে "গণহত্যার সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট কাগজগুলির মধ্যে একটি" হিসাবে বর্ণনা করেছেন তাই তিনি ঘটনা-সম্পর্কে সামন্ত বা সিপিআইএম-এর সংস্করণ গ্রহণ করেননি। (দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড: অ্যান ওরাল হিস্ট্রি অফ দ্য মারিচঝাপি ম্যাসাকার, হার্পারকলিন্স, ২০১৯, পৃ.৭।)

[206] অমিতাভ ঘোষ, দ্য হাংরি টাইড, রবি দয়াল পাবলিশার, দিল্লী,২০০৪, পৃ- ৪০২।

[207] ওমেন্দ্র কুমার সিং, ""নেশন উইদিন দ্য নেশন রিভিসিটিং দ্য ফেইলড্ রেভলিউশন অফ মরিচঝাঁপি ইন অমিতাভ ঘোষ'স দ্য হাংরি টাইড", সাউথ এশিয়ান রিভিউ, ভলিউম – ৩২, সংখ্যা – ২, ২০১১, পৃ – ২৪১।

দাসত্ব ও গণহত্যার শিকার হয়েছেন তাদের জন্য সংগ্রহশালা আছে। কানাডাতে আন্তর্জাতিক এক্সপো ৬৭ প্রদর্শনীশালায় সরকার স্বাধীনতা দিবসের শতবার্ষিকী উদযাপন করার সময় আদিবাসীদের জন্য একটি সরণি বানিয়েছিলো যেটিকে তারা সমস্ত আন্তর্জাতিক দর্শকের মাঝে সরকারকে তাদের অত্যাচারের জন্য অস্বস্তিতে ফেলেছিলো। যদিও আমি নিজে এটি দেখেছিলাম, দেওয়ালে টাঙানো ছবি ও লেখা একজন শিশু হিসেবে আমার মধ্যে অদ্ভুত ছাপ রেখে গেছিলো। আমার বাবা যিনি সেই সময়ে কানাডিয়ান সরকারের নর্দান ও ইন্ডিয়ান এফেয়ার্স বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনিও খুব পছন্দ করেছিলেন। তিনি আর্কটিকে দুরূহ স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে একটি ব্যয়সাধ্য অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি আমাকে বলছিলেন এটি খুব ফলপ্রসূ হয়নি।[208] তার মতন আমার এক অভিজ্ঞতা হয় যখন কানাডা সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সটার্নাল এফেয়ার্স এর একটি আদিবাসী সংক্রান্ত প্রোজেক্টে আমি নেতৃত্ব দি, কাজটি বিভিন্ন রকম অন্তর্কলহ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সরকারি উদাসীনতার কারণে এগোয়নি। আমি এই বহুখণ্ডের রিপোর্টের কোনো প্রকাশক পাইনি এবং বাধ্য হয়ে ইন্টারনেটে বিভিন্ন ভাগ করে লেখাগুলি পাঠিয়ে দি। পূর্ব জার্মানির স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিলো যেখানে "মেয়েরা কেঁদে ফেলতো ও ছেলেরা স্তম্ভিত হয়ে যেত।"[209] মরিচঝাঁপির জন্যও এটি দরকার। ভারতের সংবিধান জাতপাতের বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করেছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার রূপায়ণ হয়নি, সেগুলি জনসমক্ষে এনে চাপ দিয়ে রাজনৈতিকদের ও দলগুলিকে সংবিধানের লক্ষ্য পূরণের দিকে ঠেলে দেওয়া এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এটি লেখার পর গণহত্যার ৪০ বছর পূর্তিতে সাংবাদিক ও ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার কার্যনিবাহী সম্পাদক দীপ হালদার এই বিষয়ে প্রথম ইংরেজিতে একটি বই লেখেন, এখন এটি দেখার বিশ্বের বৃহত্তম প্রকাশনা সংস্থা থেকে বেরোনোর ফলে কোনো কাজ শুরু হবে কিনা না লোকজনের কাছে বিস্মৃতই থাকবে এই গণহত্যা।[210] আন্তর্জাতিক বই সংস্থার থেকে আরো ৫০ টি বইয়ের সাথে অন্যতম সেরা পরাধীনতা নিয়ে লেখা বইয়ের স্বীকৃতি পায় এটি এবং ভারতে সর্বত্র ভালো প্রশংসা কুড়োয় কিন্তু এই বিষয়ে তদন্ত বা বিচারের দাবি কেউ তোলেননি হয়তো সমালোচকরা জানতেন এটি বৃথাই একটি প্রচেষ্টা হবে। অভিযুক্তরা মারা যাওয়ার আগে তাদেরকে বিচারব্যবস্থার সামনে আনার সুযোগ একমাত্র করতে পারে এই বইটি। জনমানসে কিন্তু তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি যা দেখে মনে হয় শুধুমাত্র একটি নির্মম প্রশাসন নয় ভারতে যেকোনো অত্যাচারের প্রতি আমরা অত্যন্ত উদাসীন। আগে অবাঙালিরা দাবি করতে পারতো এই বিষয়ে বাংলা লেখালেখির কারণে তারা কিছু জানে না। সেই অজুহাতটিও এখন নেই।

---

[208] সুশীল মল্লিক, মেমরান্ডাম টু দ্য রিজিওনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট (মেডিকাল ডিপার্টমেন্ট অফ ন্যাশনাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার) এপ্রিল ১৬, ১৯৬৩, ফ্রাঙ্ক জেমস টেস্টার ও অন্যান্যদের "স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স অ্যান্ড দ্য ১৯৬২-১৯৬৩ টিউবারকুলোসিস এপিডেমিক্স্ ইন এস্কিমো পয়েন্ট, এন ডব্লিউ টি"-তে উল্লেখিত। ইনুইট স্টাডিজ, ২০১২, ভলিউম – ৩৬, সংখ্যা – ২, পৃ – ১৭৭।

[209] এভিভিবিএ-প্রদর্শিত জ্যাক বার্স্কি – (কেজিবি স্পাই), জুলাই ১০, ২০১৮, ইউ টিউব।

[210] দীপ হালদার, ব্লাড আইল্যান্ড: অ্যান ওরাল হিস্ট্রি অফ দ্য মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার, হার্পার কলিন্স, নিউ দিল্লী, মে ২০১৯।

দীপ হালদারের বাবা ছিলেন একজন সমাজকর্মী, তিনি মরিচঝাঁপির শরণার্থীদের সাহায্য করেছিলেন এবং গণহত্যার পরে একটি মরিচঝাঁপির শিশুকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, লেখকের তখন ৫ বছর বয়স। "খুবই নৃশংস বর্ণনা তিনি শুনেছিলেন যখন তিনি ছোট ছিলেন। বড়ো হয়ে ওঠার পরেও সেই কাহিনীগুলি তাকে শঙ্কিত করতো। তিনি সত্য অনুসন্ধানে বেড়িয়ে পড়েন যেটি আসলে ছিলো পৈশাচিক।"[211] ঝুমা সেনের বাবা শাক্য সেন যিনি সরকারের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মরিচঝাঁপি অবরোধের বিরুদ্ধে ইনজাংকশন এনেছিলেন মন্তব্য করেছিলেন, "যখন বিষয়টি সামনে আসে জনগণের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন কিছু পাওয়া যায়নি। শরণার্থীদের হয়ে কেউ কেউ লড়াই করছিলেন কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল নগন্য। সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিলো শুধুমাত্র বিচারব্যবস্থার না, আমাদের প্রজন্মেরও বড়ো পরাজয় হয়ে ছিলো। আমরাই মরিচঝাঁপিকে ধ্বংস হতে দিয়েছিলাম।"[212] কমিউনিস্টদের আসন সংখ্যা শূন্য হয়ে যাওয়া যেহেতু তারা আর কারুর সরাসরি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, কেউই এই ঘটনা তুলে আনতে চায়নি। একটি হিন্দুত্ববাদী কেন্দ্রীয় সরকার যেটি সরাসরি মানবাধিকারের বিরোধিতা করে সেখানে বিচার পাওয়ার সুযোগ খুবই স্বল্প। আগের

---

[211] কমিউনিস্টদের ক্ষমতা হারানোর পরে গবেষণা করা সত্ত্বেও, হালদার দেখতে পান "মরিচঝাঁপি থেকে বেঁচে ফেরা মানুষদের নিয়ে গবেষণা করা কঠিন ছিল। ৪০ বছর আগের তাদের একটি বিধ্বংসী ট্র্যাজেডির পুনর্বিবেচনা করার জন্য তাদের আমাকে পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করাও যথেষ্ট কঠিন ছিল। তারা তাদের গল্প বলার সময় ভেঙে পড়ে, কখনও কখনও শত্রুতা করে বা এমনকি তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পিছনে আমার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলে। বইটি লিখতে আমার পাঁচ বছর লেগেছে। তাদের সন্ধান করা, তাদের আমার সাথে কথা বলতে এবং বারবার ফিরে যেতে রাজি করা মানসিকভাবে নিষ্প্রভ ছিল।" নয়না অরোরা, "লেখক দীপ হালদার: ট্র্যাজেডিগুলিকে পুনরুদ্ধার করা গুরুত্বপূর্ণ" হিন্দুস্তান টাইমস, জুন ২১, ২০১৯। যদি একটি নিষ্পাপ শিশুকে লুকিয়ে রাখা গণহত্যার শীর্ষ প্রতিক্রিয়া বলে মনে হয় তবে এটি মনে রাখা উচিত যে মিনি মুন্ডা, একটি মরিচঝাঁপি থেকে নদীর ওপারে কুমিরমারীর বাসিন্দা, যিনি একটি মরিচঝাঁপিতে বেঁচে থাকা পরিবারকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তার বাড়িতে পুলিশ ভেঙে দিয়েছিল যারা তার মাথায় গুলি করে এবং পরিবারকে নিয়ে যায়। একজন অ-মরিচঝাঁপি বাসিন্দার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা সত্ত্বেও তাকে শহীদদের একজন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। (ব্লাড আইল্যান্ড, পৃ. ১৭২) তুষার ভট্টাচার্যের বিবরণ তার মৃত্যুর প্রেক্ষাপট প্রদান করে। "মরিচঝাঁপিতে বসবাসকারী শিশু এবং বৃদ্ধরা সংকটের কারণে মারা যেতে শুরু করেছে। অসহায়দের সাহায্য করার জন্য মরিয়া হয়ে, মারিছঝাপির মুষ্টিমেয় অস্থির যুবক খাবারের সন্ধানে কুমিরমারীতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। মেনি মুন্ডা, একজন আদিবাসী [উপজাতি] মহিলা, গুলিতে নিহত হন; অন্যদের সাথে তার লাশও বড় নৌকায় স্তূপ করা হয়েছিল। সে এলাকার স্থানীয় হওয়ায় পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করতে পারেনি। জনতা বিক্ষোভের মাধ্যমে পুলিশের বিরুদ্ধে তাদের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে। সমস্ত ধরণের প্রতিবাদ এবং ভিন্নমতের কণ্ঠকে শান্ত করার প্রয়াসে, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারের মাধ্যমে কুমিরমারি পঞ্চায়েতকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল যাতে তা মেনি মুন্ডার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা যায়। সেই টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত মেনি মুন্ডার পরিবারকে এক টুকরো জমি কিনেছিল" তুষার ভট্টাচার্য, অপ্রকাশিত মারিচঝাপি, ইংরেজি খসড়া অনুবাদ, পৃ. ২৮। সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত আরও তথ্য প্রদান করেন "এটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে ৩১ জানুয়ারী [১৯৭৯] পুলিশের গুলিতে ৩০ জন উদ্বাস্তু মারা গিয়েছিল। এর মধ্যে নয়টি লাশ কলাগাছিয়ার পানিতে উঠে এসেছে। বাকি ২০টি লাশ সন্দেশখালীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশের গুলিতে নিহত স্থানীয় মহিলা মেনি মুন্ডা তাঁর শিশু সন্তানকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। পুলিশের গুলিতে শিশুটিও নিহত হয়। মেনি মুন্ডার ছেলে, নয় বছর বয়সী, মহিলার মৃতদেহ বহনকারী পুলিশ লঞ্চের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একজন পুলিশ সদস্য তাকে গুলি করার পথে এলে আরেক পুলিশ সদস্য তাকে বাধা দেন। তাই সে তার জীবন রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

[212] দীপ হালদারের ব্লাড আইল্যান্ডে উদ্ধৃত শাক্য সেনের বাক্যাংশ, কিন্ডেল সংস্করণ, অবস্থান ১০৩৮।

প্রকাশনাগুলির থেকে হালদারের বইটি আলাদা করে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া পায়নি যা প্রতিপন্ন করে ভারতে মানবাধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা কতটা দুর্বল।

একটি জোট ছাড়া দলিতদের পক্ষে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত করে তোলা সম্ভব ছিলো না। বহু বছর ধরে মানুষের উদাসীনতা এই গণহত্যার প্রতি বুঝিয়ে দিয়েছে খুব তাড়াতাড়ি এর পরিবর্তন হবে না। বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ঋত্বিক বলে একটি নাটক সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে গণহত্যার উপর একটি অনুষ্ঠান করেছিলো। সিপিএমের জেলা সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য এর সমালোচনা করেছিলেন এই বলে, "নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে মরিচঝাঁপির হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবেন না। এটি অনেক পুরোনো ঘটনা। বরং পার্ক স্ট্রিট বা কাটোয়া বা কামদুনিতে ধর্ষণ নিয়ে বিচারের দাবি তুলুন।"[213] প্রথমদিকে শরণার্থী ফেরত পাঠানোর কৃতিত্ব দাবি করে সিপিএম এখন এই বিষয়কে পিছনে ফেলে এগোতে চায়। একজন পর্যটক লক্ষ্য করেছিলেন, "আমাদের লঞ্চের অপারেটর দূর থেকে আমাদের একটি নির্জন দ্বীপ দেখায় কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছিলাম সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ ফিল্ড ডিরেক্টরের ম্যাপে এই দ্বীপের কোনো উল্লেখ নেই দেখে। আমি সরকারি পথপ্রদর্শককে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বিরক্ত হন ও বলেন যখন রাজনৈতিক নানা কারণে লোকে এখানে আসে ও বেআইনি ভাবে জায়গা দখল করে তাহলে এটাই ভালো সরকার এই অঞ্চলটিকে দ্বীপ থেকে বাদ দিয়ে দিক। লোকজনদের এই দ্বীপ সম্বন্ধে জানানোর কোনো দরকার নেই।"[214] ক্ষমতা হারিয়ে তাদের সমালোচকদের চুপ করানোর উপায়েও হারিয়ে গেছে এবং একের পর এক নির্বাচনে হেরে তাদের দুরবস্থা আরও প্রকট হয়েছে।

এই বিষয় নিয়ে জনমত পাল্টানোর চেষ্টা এবারে আসবে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের প্রেমের গল্পের সিনেমা থেকে। পরিচালক বৌদ্ধায়ন মুখার্জি বলেছিলেন, "১৯৯০ এর মাঝে কলেজে পড়ার সময়ে আমি মরিচঝাঁপি সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলাম। যখন আমি এটি নিয়ে পড়াশোনা করলাম দেখলাম খুব বেশি লোক জানে না ঘটনাটি নিয়ে। সেই মুহূর্তেই ঠিক করি আমি একটি সিনেমা বানাবো।"[215]

"আমি চল্লিশ বছরের পুরোনো মরিচঝাঁপির ভূতকে জাগাতে চাই, বিশ্বের সবাই জানুক এই সম্বন্ধে।"[216] "পরিচালক জানতে চেয়েছিলেন আমি মরিচঝাঁপির কুঁড়ে ঘর গুলির মধ্যে কত দূরত্ব সেই বিষয়ে কিছু জানি কিনা। সেটি আমার জানা ছিলো না। একজন ডক্টরেটের ছাত্রের আর সিনেমানির্মাতার তথ্যানুসন্ধান আলাদা হয়। মরিচঝাঁপি গণহত্যার

---

213 অসীম প্রামানিক, "১৯৭৯ মরিচঝাঁপি কিলিংস রিভিসিটেড", দ্য স্টেটসম্যান, ২৩শে মার্চ, ২০১৪।

214 গোবিন্দ বিশ্বাস ইন এম্পায়ারস লাস্ট ক্যাজালটি: মরিচঝাঁপি,ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া, কমিউনিস্ট কিলিংস অফ পুওর অপ্রেসড কাস্ট হিন্দু পেজেন্টস, বাই এস জি দস্তিদার, ৩ অগস্ট, ২০০৯।

215 "বৌদ্ধায়নস 'মরিচঝাঁপি' টু এক্সপ্লোর লাভ এমিডস্ট পেন", টাইমস অফ ইন্ডিয়া, এন্টারটেনমেন্ট টাইমস, ১ জুলাই, ২০১৯।

216 সুমন ঘোষ এন্ড বৌদ্ধায়ন মুখার্জিস নিউ ফিল্মস অ্যাট বুসানস এশিয়ান প্রজেক্ট মার্কেট", রুটোজি নাখওয়া, অন গ্লোবাল স্ক্রিনস ম্যাগাজিন, ১৬ অগস্ট, ২০১৯। নমন রামচন্দ্রণ, "বুসান: ইন্ডিয়াস আদিল হুসেন বোর্ডস এপিএম প্রজেক্ট 'মরিচঝাঁপি'(এক্সক্লুসিভ)", ভ্যারাইটি, অক্টবর ৭, ২০১৯।

লেলিহান আগুনে এই তথ্যগুলি হারিয়ে গেছে। যদিও পরিচালক 'লাইফ অফ পাই' এর অভিনেতাকে নিয়েছিলেন এবং অন্যান্য সিনেমা বানিয়েছেন আমার সন্দেহ ছিলো তিনি ৮০০০০০ ডলার জোগাড় করতে পারবেন কিনা। কিন্তু কান চলচ্চিত্র উৎসবে একজন সহ-প্রযোজক পাওয়া গেছিলো এবং সুন্দরবনে শুটিং হবে ২০২২ থেকে।

ফটোগ্রাফার সৌম্যশঙ্কর বোস গণহত্যাকে তুলে ধরে একটি চিত্রকলা বই মরিচঝাঁপির উপর প্রকাশ করেছেন।[217] এখানে আসল ও পুনর্মুদ্রিত নানা ছবি ও অন্যান্য নানা আর্কাইভাল নথিপত্র আছে। এখানে আত্মীয়দের থেকে নিহতদের বিভিন্ন ঝাপসা ছবি দিয়ে তৈরী একটি সংগ্রহ থেকে বোঝা যায় সরকারের দুটি মৃত্যর দাবি সম্পূর্ণ অসঙ্গত।[218] তিনি কেবল দূর থেকেই দ্বীপটির ছবি তুলতে পেরেছিলেন কারণ দ্বীপে পা রাখলে যে কারুর ১০ বছর অবধি কারাদণ্ড হতে পারে। পাঁচ বছর ধরে অত্যন্ত প্রত্যন্ত এলাকায়ে তিনি বেঁচে যাওয়া মানুষদের খোঁজ করেছেন তিনি দেখেন অনেকেই মারা গেছেন।[219] বামফ্রন্ট ও অন্যান্য সরকাররা অপেক্ষা করছে সময় পার হয়ে যাওয়ার। এই ধরনের ব্যাক্তিগত উদ্যোগ কি প্রভাব ফেলে সেটি দেখার।

বুদ্ধিজীবীদের কে কাজটি ছেড়ে দিয়ে সরকার আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাটি লুকানোর চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। অন্যান্য গণতন্ত্রে সরকার নিজেদের কৃতকর্মের জন্য নিজেরাই উদ্যোগী হয় কোনো ব্যাপার গোপন করার[220], ভারত সরকার মরিচঝাঁপির ঘটনাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছিলো। বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ছিলো বিষয়টির নিস্পত্তি করার যেটি তারা করেছিলো।

এইভাবে যে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিল্ম বানানো যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় বামফ্রন্টের জমানা থেকে অনেক পরিবর্তন এসেছে, যদিও অনেকের সন্দেহ রয়ে গেছে মরিচঝাঁপিতে কাজ করার নিরাপত্তা নিয়ে। একজন আমেরিকান ডক্টরেট ডিগ্রিধারি পেশাদার অনুবাদককে অনুবাদ করতে বলায় তিনি বলেন," আপনি যে বইগুলি লিখেছেন, আপনি সুরক্ষিত আছেন কেউ আপনাকে কিছু করবে না। আমি কিন্তু এতটা সুরক্ষিত নাও থাকতে পারি। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা এবং এটির প্রকাশ হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গে যারা ক্ষমতায় আছে তারা বিভিন্ন হিংসাত্মক কাজ করছে, এই রকম লেখাপত্র এদেরকে আরো উস্কানি দেবে।"

লেখালেখির প্রভাব নিয়ে অনেক অতিরঞ্জন করা হয়েছে না হলে গণহত্যার উপর কোনো কাজ করা হয়ে যেতে পারতো। রাজনৈতিকভাবে সুবিধে হবে এই সময়ে মানবাধিকারে হস্তক্ষেপের ব্যাপারে কথা বলা কোনো বড়ো ব্যাপার না।[221]

---

[217] অ্যাশলে ওকুয়াসা, "রিপ্রেজেন্টিং মাইগ্রেশন: টু ফোটোগ্রাফার্স ক্রিয়েটিং নিউ ওয়েজ টু সি হিস্ট্রি এন্ড স্যাংচুয়ারি", দ্য রিভিলার, অগস্ট ৯, ২০১৯।

[218] সৌম্যশঙ্কর বোস, হোয়্যার দ্য বার্ডস নেভার সিং, রেড টার্টল, ক্যালকাটা, ২০২০, "ফটোজ: রিভিসিটিং ওয়েস্ট বেঙ্গলস মরিচঝাঁপি ম্যাসাকার ইন এ নিউ ফটোবুক", দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০২০।

[219] আইজিটিভি সৌম্যশঙ্কর বোস ইন্টারনেট ভিডিও।

[220] অ্যানাবেল হার্নান্দেজ, এ ম্যাসাকার ইন মেক্সিকো, ভার্সো, নিউ ইয়র্ক, ২০১৮।

[221] দীপ হালদার লেখকের দ্বিধা সম্পর্কে একটি ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। প্রথম প্রকাশক, যার কাছে তিনি পাণ্ডুলিপি নিয়ে যান, তিনি বামফ্রন্টের ভূমিকাকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন যা করা বাস্তবে অসম্ভব ছিল। "আমার অনেক বন্ধু, ছোটবেলার বন্ধু, যেসব

যদি কোনো প্রতিষ্ঠানগত বাধা থাকতো গণহত্যা ও অন্যান্য মানবাধিকার সুরক্ষিত করার, পশ্চিমবঙ্গে বা অন্যত্র বামফ্রন্টের এতো করুণ অবস্থা হতো না এবং ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতাও সংকটের মুখে পড়তো না। সীমিত স্থানীয় ক্ষমতার জন্য অনেক সময় বলা হয় সমাজতন্ত্র প্রাদেশিক স্তরে উপযোগী হয় না কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ফেডারেল ভারতীয় ব্যবস্থায় কমিউনিস্টরা অনেক ক্ষমতা পেয়েছিলো, যেটিকে তারা যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করেছিলো।

লেখক অনেক বছর অপেক্ষা করেছিলেন একটি সরকার বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে কিছু কার্যকরী উপায় গ্রহণ করার জন্য কিন্তু এটি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো ভুক্তভোগীদের জীবিতকালে সেটি দেখার সুযোগ হয়তো তারা পাবে না। এইভাবে যে একজন চাকুরী না থাকা গবেষককে বিশ্বের অন্য প্রান্ত থেকে এসে এই গণহত্যার কথা তুলে ধরতে হলো যেখানে অনেক বেশি সামর্থ্য থাকা বুদ্ধিজীবীরা আছেন, এটি ভারতে মানবাধিকার এবং ইন্ডিয়ান স্টাডিজ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দেয়। তাদের ব্যর্থতা ভারতকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে বড়ো বাধা এবং এর ফলে তারা সহযোগিতা করছে উচ্চবর্নদেরই। হিন্দুধর্মের যে মানবাধিকার বিরোধী ক্ষতিকারক প্রভাব উপমহাদেশে আছে তার ফলে নিজের জাতির বাইরে অন্য কারুর মানবিক আবেদনে মানুষ সাড়া দিতে ভুলে গেছে। এই অভিজাত সংস্কৃতির বাইরে বাঙালি দলিতদের যে লোক সংস্কৃতি আছে সেখানে মরিচঝাঁপির কথা উল্লেখ হয় যেটি মতামত ও নির্বাচনী ফলাফলকে আজও প্রভাবিত করেছে।[222]

বন্ধুদের সঙ্গে আমি স্কুল-কলেজে গিয়েছিলাম, তারা আমাকে ফেসবুকে আনফ্রেন্ড করেছে, তারা আমাকে টুইটারে আনফ্রেন্ড করেছে, বলছে তুমি এটা কীভাবে করতে পারো। আমি তখন বললাম, কিন্তু তোমরা জানো আমি দীর্ঘ ৫ বছর ধরে বইটি নিয়ে গবেষণা করছি, আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। তোমরা জানো বাংলায় এই ঘটনাটা ঘটেছে। তারা বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তা'বলে ঘটনাটাকে এভাবে উদ্‌ঘাটন করতে হবে, তারপর এমন সময়ে। মোদি সরকার ক্ষমতায় আছে, তারা এগুলো আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। এর থেকে ঢের বড় বড় ঘটনা ঘটছে। আমি বললাম নিশ্চয়ই বড় কিছু ঘটছে। কিন্তু এই গল্পগুলোও বলতে হবে। তারা বলল, হ্যাঁ এই একটি গল্পে তুমি অনেক সময় বিনিয়োগ করেছ। এটা নিঃসন্দেহে একটা মহান গল্প; কেউ দ্বিমত পোষণ করছে না। কিন্তু তাবলে তোমার বই লেখা উচিত হয়নি।" দীপ হালদার, ইন্ডিয়া'জ হিডেন হিস্ট্রি, হাউ স্টোরিটেলারস্ হ্যাভ কেপ্ট ইন্ডিয়া হিডেন ফ্রম ইন্ডিয়ান্স্, ইউটিউব।

[222] ক্যারোল এরিকা লোরিয়া, "রিলিজিয়ন, কাস্ট, অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট: দ্য মতুয়া কমিউনিটি", অক্সফোর্ড রিসার্চ এনসাইক্লোপিডিয়া, এশিয়ান হিস্ট্রি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২০, পৃ.১৩। সৌম্য শঙ্কর বোস স্থানীয় থিয়েটার দেখে মরিচঝাঁপির সম্বন্ধে জেনেছিলেন। আমি জেনেছিলাম ২৪ পরগনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে। আন্নু জালাইস তার ডক্টরাল থিসিসের জন্য গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলেছিলেন আর দীপ হালদার জানতে পেরেছিলেন তাঁর বাবা এবং লুকিয়ে থাকা উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে। গণহত্যা সম্বন্ধে জানার এত অজস্র সূত্র ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল যে গণহত্যাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। গণহত্যা সংগঠিত করার আগে সিপিএমের এটা ভাবা উচিত ছিল।

বামফ্রন্টের পতন নিয়ে যে লেখালেখি হয়েছে সেখানে মরিচঝাঁপিকে একটি কারণ হিসেবে ধরা হয়েছে কিনা আমি মনে করতে পারছি না। বিশেষজ্ঞরা এটি এড়িয়ে গেছেন এতে তারা ভুল নন কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্যদের তফাৎ সুস্পষ্ট। নামমাত্র বিচার চালানোরও ইচ্ছে নেই যার ফলে প্রতিহিংসার রাজনীতি হয়ে ওঠে প্রবল।

ভারত সম্পর্কে মরিচঝাঁপি হত্যাকান্ড অনেককিছু বলে দেয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রথম দিকের ঔপনিবেশিকযুগে ভারতীয় যে সমস্ত পন্ডিতরা বিদেশ যেতেন তারা বুঝতেন তাদের সমাজ কতো পিছিয়ে আছে ও এই জন্য সেটিকে আধুনিক করার চেষ্টা করতেন। আজকে দেশের সেই হীনমন্যতা নেই কিন্তু এসে গেছে এক রকমের অহেতুক গর্ব, যা সভ্যতার সাথে কখনো খাপ খায় না। মরিচঝাঁপির নিহতরা ছিলেন বর্তমান ভারতের অবস্থার নির্ণায়ক একই সাথে প্রতিবাদেরও। যারা এটিকে নিয়ে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো ক্ষমতা দখল করে তারা দায়ভার ঝেড়ে ফেলে। কংগ্রেস এবং এর আনুষঙ্গিক দলটি রাজ্য ও জাতীয় স্তরে ক্ষমতা দখল করে কিছুই করেনি। বিজেপি যারা কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে বিরোধী রাজ্যগুলিতে তদন্ত করছিলো তারাও বিষয়টি উপেক্ষা করে। বুদ্ধিজীবীরা কিছু ব্যতিক্রমী বাদ দিয়ে চুপচাপ থেকে যায়। এই যে লেখাটিকে ছাপাতে দেওয়া হয়নি এতে শুধুমাত্র বিজেপির কণ্ঠরোধের পরিবেশ ধরা পড়ে এমন না সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের নানা সমস্যার কথাও উঠে আসে।

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সমর্থকদের যখন মিথ্যে মামলায় জড়ানো হচ্ছে এবং তাদের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে তাদের খেয়াল হয় যে নির্বাচন জেতার জন্য ও হিন্দুত্ববাদীদের হারানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল জনসমর্থন তারা হারিয়ে ফেলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে গরিব ও নিম্নবর্ণের মানুষদের উপেক্ষা করে এসে তাদের এই পরিণতি। যাদের সমর্থন তাদের স্বাভাবিকভাবেই পাওয়ার কথা ছিলো তারা সবাই বিজেপির দিকে মুখ ঘুরিয়েছে। হয়তো এই সমর্থন চিরস্থায়ী হবে না কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষপন্থীরা তাদের পুরোনো রাস্তা থেকে সরে এসেছে এরূপ আশা করা ভুল। প্রকাশকরা মোহান্ধ হয়ে এই সমালোচনা এড়িয়ে উগ্র দেশপ্রেম ও গর্বকে ধরে ভারতকে সামাজিকভাবে একটি প্রকৃত অর্থে পিছিয়ে পড়া দেশ হিসেবে দেখতে চাইছেন না।

গণহত্যা দেখিয়ে দিয়েছিলো প্রায় ২০ কোটি দলিতরা সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা থেকে ন্যায় পেতে বঞ্চিত, এটি শুধু তাদের নয়, ভারতের গণতন্ত্রের সমস্যা। এখনকার দিনে দাঁড়িয়ে সরকারি তদন্তর সম্ভাবনা ক্ষীণ,সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ যখন রাজনৈতিক দল গণহত্যার সাথে জড়িত ছিলো।

বামফ্রন্ট বিশেষ করে সিপিএমের জন্য গণহত্যাটি অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ক্ষমতায় থাকার সময়ে তারা খুব সুন্দরকরে বিষয়টিকে আড়ালে রাখতে পেরেছিলো কিন্তু এতো বড়ো একটি হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি জনমানসে রয়েই গেছিলো। বারংবার নির্বাচনে হারার পরও এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় কোনো স্বীকৃতি তারা দেয়নি। তারা হয়তো দেখেছিলো সম্পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েও তাদের হার যখন আটকানো যাবে না এই বিষয়ে চুপ থাকাই ভালো। কিন্তু কমিউনিজমের ব্যাপারে নানা কথা উঠে আসতে লাগলো, “এটাই হচ্ছে কমিউনিজম সবার সামনে গরিব ও ক্ষুধার্ত দের নিয়ে কথা বলো যাতে ব্যক্তিগত ভাবে নিজে বিলাসে থাকতে পারে। এবং বামপন্থী ঐতিহাসিকদের উপর ভরসা করো তোমার হয়ে ইতিহাস

লিখে দেওয়ার জন্য।"[223] যেখান থেকে এই উক্তিটি তোলা হয়েছে সেটি হলো, "জ্যোতি বসু হচ্ছেন ভারতের বিস্মৃত একজন গণহত্যাকারী।" এটিকে বদলে সবচেয়ে পরিচিত গণহত্যাকারী করতে কিছু সময় লাগবে। দলিত শরণার্থীদের জন্য কিভাবে তিনি ভগবান থেকে একজন খুনি হয়ে উঠলেন সেটি ভোলার নয়। আগামী প্রজন্মের জন্য এই বিষয়ে অনেক গবেষণা ও রেকর্ড করা সাক্ষাৎকার ইন্টারনেটের দুনিয়ায় থাকবে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার হলেও একটি বিপুল তথ্যের সম্ভার থাকবে ঘটনাটি মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। কোনোভাবে এই জিনিসটিকে ভালো করে দেখানোর উপায় নেই, সিপিএমের জন্য তো নয়ই। নাম, নেতৃত্ব, নীতি অনেক কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা তারা করতে পারে, কিন্তু এই স্মৃতি ফিরে আসবে, তাদের ধ্বংস করতে এবং এখন নতুন কিছু তারা করতে পারবে না। তারা ভারতের আদি কমিউনিস্ট পার্টিতে মিশে যেতে পারে যারা জরুরি অবস্থা সমর্থন করলেও মরিচঝাঁপির সঙ্গে যুক্ত ছিলো না, কিন্তু তাদের অহংবোধ তাদেরকে এটি করতে দেবে না যেমনটি মরিচঝাঁপির সময়ে তাদেরকে পিছু হটতে দেয়নি।

ক্ষমতায় আসার পর কমিউনিজমের সঙ্গে মোহভঙ্গ বিশ্বব্যাপী। তাদের রীতিনীতির মধ্যে কোনো মডেল কাজ করেনি, কিছু অনুকূল ঘটনা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে ব্যতিক্রমী ছিলো না। বামেরা বহুদিন ধরে এক ধরণের বিভ্রম তৈরী করতে পেরেছিলো যার মূল্য তাদেরকে এখন দিতে হচ্ছে। সাবল্টার্ন বা নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে কোনো তত্ত্ব এই সত্য এড়াতে পারবে না। শ্রেণী পরিচয়কে ভেঙে ফেলতে চাইলেও বারবার তাদের গণহত্যাটির কথা চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা দেখিয়ে দেয় তাদের নিজেদের শোষক জাতের প্রতি আনুগত্য। নিজেদের তত্ত্বচর্চায় এই ভুলটি স্বীকার না করতে পারলে তারা নিম্নবর্গের মানুষদের কাছে নিজেদের সদিচ্ছা বোঝাতে পারবে না।[224] সাংবাদিক নীলাঞ্জন ঘোষ দেখিয়েছেন, "মরিচঝাঁপি গণহত্যাটি ইতিহাসে রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। ১৯৭৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে হওয়া এই গণহত্যাটি দেশের আর্কাইভে সামান্যই উল্লেখ পেয়েছে। নিজেদের রাজনৈতিক নেতাদের খুনির তকমা থেকে বাঁচানোর জন্য তদনীন্তন বামপন্থী 'সাবল্টার্ন' গবেষকরা লেখেনওনি এই ব্যাপারে। সংবাদমাধ্যমে ভাসা ভাসা খবর এলেও এতো হাজার হাজার মানুষদের গণহত্যার খবর যতটা প্রচার পাওয়ার কথা ততটা আদৌ পায়নি। পরবর্তীকালে রস মল্লিকের মতো অনেক নৃতত্ত্ববিদ মরিচঝাঁপির কথা তুলে ধরেন এবং অমিতাভ ঘোষের 'দ্য হাংরি টাইড' এর বর্ণনা থেকে জনপ্রিয় হয়।"[225]

এটি ভাবা অনুচিত হবে না যে ভবিষ্যতে সারাদেশের সামনে ঘটনাটি উঠে আসবে। তুলসা গণহত্যার শতবার্ষিকী ও কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদেরদের 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার' আন্দোলন একসাথে হওয়ায়, তুলসার ব্যাপারটি প্রচারিত হয় বহু মানুষের মধ্যে যেটি আগে হয়তো হতো না। রক্ষণশীল ওয়াশিংটন পোস্ট প্রাবন্ধিক জর্জ উইল বলেছেন, 'অতীতকে মুছে দেওয়া কখনো উচিত না'। "আমার ৮০ বছরের জীবনে আমি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান গুলি থেকে নানান সুবিধে নিয়েছি

---

[223] অভিষেক ব্যানার্জি, "জ্যোতি বসু ইজ দ্য মাস মার্ডারার ইন্ডিয়া ফরগট", ওপিইন্ডিয়া, জুলাই ৮, ২০২০।

[224] সিমোন টিসডল, "ফ্রম কিউবা টু প্যালেস্তিন, হোয়েন রেভোলুশনারিজ এন্ড আপ অ্যাস ডিক্টেটরস, দ্য পিপল পে দ্য প্রাইস।" দ্য গার্ডিয়ান, জুলাই ১৮, ২০২১।

[225] নীলাঞ্জন ঘোষ, "প্রোটেক্টেড এরিয়াজ এন্ড দ্য স্টেটলেস", ইন্ডিয়া টুডে, জুন ২৫, ২০১৯।

এবং ৮০ বছরে এসে তুলসা হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার জানলাম এটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। যেকোনো কিছু এড়িয়ে যাওয়া নয়, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড।"[226] মরিচঝাঁপি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়, উচ্চশিক্ষিত বহু মানুষের কাছে বিষয়টি অজানা রয়ে গেছে। আমেরিকা ও ভারতের মতো যে দেশগুলিতে সভ্যতার আকাঙ্খা আছে অতীতকে নিজেদের সুবিধে মতো ছাঁচে ফেলার প্রবণতা মারাত্মক। নিজেদের সমাজের অন্ধকার দিকগুলিকে আড়াল করার সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মরিচঝাঁপি।

নন্দীগ্রাম এবং সিঙ্গুরের আন্দোলনকে বামফ্রন্টের পতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে দেখা হয় কিন্তু বহু বছর ধরে ফ্রন্ট ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছিলো এবং নন্দীগ্রাম সিঙ্গুরের আন্দোলন এতে শেষ পেরেক পুঁতে দেয়। মরিচঝাঁপির ভয়াবহতার মাত্রা অনেক বেশি ছিলো কিন্তু সদ্য সরকার গড়ার ফলে বহু বছর তারা ক্ষমতায় রয়ে যায় এবং সুশাসনের কোরাসে মরিচঝাঁপি হারিয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মরিচঝাঁপিকেই বলা যায় বামফ্রন্টের স্মরণীয় চিহ্ন যেখানে তারা ক্ষমতার লোভে সমস্ত আদর্শের মানদণ্ড খুইয়েছিলো। ফিরে তাকালে মরিচঝাঁপির ঘটনা ভোটদাতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের কাছ অবশ্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হয়তো বামফ্রন্ট তাদের পদচিহ্ন ভারতের অন্যান্য প্রান্তে বাড়ালে বা প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিলে হত্যাকান্ডটির কথা ভুলিয়ে দেওয়া যেত কিন্তু সারা দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন করলেও এরা কোনো সফল নীতি আনতে পারেনি। মরিচঝাঁপি। সেই সময়ে বোঝা না গেলেও গণহত্যার ফলে ভারতে বামপন্থীদের নিয়ে সমস্ত আশা ভরসা শেষ হয়ে যায়। গণহত্যা মনে রাখার জন্য জনসংখ্যার একটি অংশের সমর্থন দরকার, যেটি মরিচঝাঁপি দলিতদের মধ্যে থেকে পাবে, কোনোভাবে বামফ্রন্ট ফিরে আসতে চাইলে তাদের বিরোধীরা এটি মনে করিয়ে দেবে। অনেকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু কিছু গোষ্ঠীর কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। যেভাবে বামফ্রন্ট সরকারের অন্যান্য দিকগুলি স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাচ্ছে, মরিচঝাঁপির কথা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে থাকবে। তখন বামেরা হয়তো কেবল দাবি করবে গণহত্যার সঙ্গে যুক্ত সবাই মারা গেছেন।

অত্যাচারীরা যেভাবে কোনো ফলাফল ছাড়া এই গণহত্যাটি করেছিলো, তার ঐতিহাসিক নানা কারণ আছে। প্রায় দুহাজার বছর আগে, জাতিগুলি নিজেদের মধ্যে বিবাহ করছিলো এই শ্রেণীবিভাগ থেকে দলিতদের বর্তমান পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ঔপনিবেশিক পাশ্চাত্য প্রভাবে অন্যান্য ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হিন্দু ধর্মে নানা পরিবর্তনের দাবি উঠে আসে, গান্ধী ছিলেন এর প্রধান উপযাজক, তার রাজনৈতিক ক্ষমতাও ছিল যথেষ্ট। তার ক্ষমতা দেখিয়ে তিনি দলিতদের গণহত্যার হুমকি দিয়ে নিজের কাজ উদ্ধার করতেন। পুনা চুক্তির ফলে দলিত আইনপ্রণেতারা শাসক জাতের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কারণ তাদের নির্বাচনী কেন্দ্রে বেশিরভাগ ভোটদাতা ছিলেন তাদের অত্যাচারী উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি। এর ফলে একদল অনুগত দলিত প্রতিনিধি উঠে আসে যারা তাদের প্রভুর নির্দেশে চলত এবং তাদের অনুমতি নিয়ে নিজেদের দলিতদের খুব সামান্য উন্নতি করতে পেরেছিলো।

---

[226] জ্যাক স্ট্যান্টন, "ডাজ কনজারভেটিজম অ্যাকচুয়ালি মিন এনিথিং এনিমোর?", পলিটিকো ম্যাগাজিন, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২১।

এই সত্যগুলি মেনে নেওয়া যায় না যে এতো হত্যার পরও দায়ী দলগুলি থেকে কোনো দলিত রাজনৈতিক পদত্যাগ করেননি। চুক্তিটি না হলে এই রকম মানুষের হাতে কখনোই ক্ষমতা যেত না যারা স্পষ্টত শাসক জাতের প্রতীকী দলিত প্রতিনিধি ছিলো। অবশ্য নির্বাচিত দলিত রাজনৈতিকরা মানবাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন না, এর দায় মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর উপর বর্তায়। চার রাজনৈতিকরা পরপর ক্ষমতায় এসে উচ্ছেদ ও হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রীরাও তাদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

বি সি রায় তাদেরকে অন্য জায়গায় পাঠানো শুরু করেছিলেন কিন্তু নেহেরু অন্য রাজ্যগুলিকে বাধ্য করেছিলেন এই কাজে সাহায্য করতে। একই ভাবে যদি মোরারজি দেশাই বিরোধীদের বাধা দেওয়ার পরিবর্তে নিজে প্রতিবাদ করতেন জ্যোতি বসুর সাহস হতো না তাদেরকে উচ্ছেদ করার। এতো মৃত্যু ও অত্যাচারের কথা ভুলে, হত্যাকারীরা ও তাদের মদতদাতারা একঙ্গে মরিচঝাঁপি থেকে দলিতদের সরিয়ে দিতে চেয়েছিলো। আজকের দিনে মানবতার বিরুদ্ধে অন্যায়ের জন্য এদেরকে বিচারের সামনে আনা যায় কিন্তু তখনকার দিনে এই বিষয়ে কিছু শোনা যায়নি। প্রধানমন্ত্রীরা যারা এতভাবে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়েছিলো তাদের অনেক সমর্থক ছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও এনারা কিছুই করেননি। অন্য অনেকেও সাধ্য থাকলেও কিছু করেননি এবং তারাও দায়ী ছিলেন এর জন্য। বহু গবেষক ও বুদ্ধিজীবীকে এই তালিকায় ফেলা যায়।

যখন শতবর্ষ আগে বাংলার পরিষদীয় সভায় প্রথম দলিত প্রবেশ করেছিলেন, বাংলার নমোশুদ্র সংস্থার সহ সভাপতি নীরোদবিহারী মল্লিক বলেছিলেন, "নিম্নবর্গের মানুষদের স্বার্থ এই উচ্চজাতের অফিসারদের কাছে মোটেও সুরক্ষিত নয়" কারণ তারা "দলিতদের উন্নতির বিরুদ্ধে।"[227]

বাংলাভাগের পর থেকে ইতিহাসে এই কথা বারবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, মরিচঝাঁপি তার সবচেয়ে ভয়াবহ উদাহরণ। জনসংখ্যার বিচারে পিছিয়ে থাকলেও তিনজাতের উচ্চবর্ণরা দেশভাগের পরেও নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখেছিলো। কোনোরকম অন্তিম পরিণতি ছাড়া আমাদের পরিবার প্রায় একশো বছর ধরে দলিতদের মানবাধিকারের দাবি তুলে যাচ্ছেন। এই সময়ের ব্যবধানে একশ্রেণীর দলিত মধ্যবিত্তর জন্ম হয়েছে কিন্তু মূল সমস্যার জায়গাগুলিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমেরিকাতে গৃহ যুদ্ধের শতবর্ষ বহুদিন পেরিয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও সবাই আইনের সামনে সাম্যের কথা মেনে নিতে রাজি নয়। আমেরিকার মতো উন্নত গণতন্ত্রে যদি এই অবস্থা হয়, ভারতের মতো দেশে যেখানে বহুদিন ধরে নানা অসম বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আছে সেখানে সমতা আনতে বহুদিনের অপেক্ষা করতে হবে। কমিউনিস্টদের থেকে কেন্দ্রে ক্ষমতাশালী বিজেপির শাসন বরং অনেক ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ এবং তারা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য আরো ক্ষতিকারক। যখন ইংরেজরা তাদের সভ্যতা শেখানোর দায়িত্ব সাঙ্গ করে দেশে ফেরত গেছিলো, কিছু পাশ্চাত্যশিক্ষিত অভিজাতরা দেশের শাসন শুরু করে ও তারা নানা সংস্কার আনতে চেয়েছিলেন

[227] দ্বৈপায়ন সেন, "দ্য ডিক্লাইন অফ দ্য কাস্ট কোয়েশ্চেন: যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এন্ড দ্য ডিফিট অফ দলিত পলিটিক্স ইন বেঙ্গল, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১৮; পৃ: ৪৫।

কিন্তু তৃণমূল স্তরে তারা যথেষ্ট পরিবর্তন আনতে পারেননি। বিজেপির যদি পতন হয় তা ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মের পরিবর্তনের চেয়ে ব্যর্থ প্রশাসন ও বহু সংখ্যালঘুকে আলাদা করে দেওয়ার জন্যই হবে।

সরকার ও সমাজের অবহেলার জন্য গণহত্যার কারণগুলি কেবল অনুমানধর্মী ও হতাহতের সংখ্যা অজানা রয়ে আছে। সিপিএমের কিছু সদস্য ও রাজ্য কমিটির অনেকে যারা এই বিষয়ে জানেন এখনো বেঁচে আছেন কিন্তু তারা কখনো আসল ঘটনার কথা স্বীকার করবেন না। মৃতের সংখ্যা বাদ দিয়ে আরো বিশদে ঘটনার কথা জানার জন্য আসল হত্যাকারীদেরকে মুখ খুলতে হবে কিন্তু সরকারি তদন্তের সামনে না পড়লে তাদের বয়ান পাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ঘটনাটি ইতিহাস থেকে মুছে যাবে না স্মরণীয় হয়ে থাকবে তা নির্ভর করবে ভারতের ভবিষ্যতের রাজনীতি ও দলিত আন্দোলনের উপর। মনে রাখা হলে এটি হয়ে থাকবে অত্যাচারী দেশের বিরুদ্ধে দলিতদের এক অতিমানবীয় বিদ্রোহ। খুব শীঘ্রই সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা মারা যাবেন এবং হয়তো এমন সময় আসবে যখন গণহত্যাটি কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেব যা জানার এখন কোনো উপায়ে নেই। দলিত নির্বাচকমন্ডলীর মধ্যে যারা এই ঘটনা লুকিয়ে ফেলার সবরকম চেষ্টা করেছিলো তাদের নাম কুখ্যাত হয়ে থাকবে। মরিচঝাঁপি যেভাবে দেখিয়েছিলো ন্যায় পাওয়ার অধিকার কিভাবে অর্থ, পরিচিতি ও জাতের উপর নির্ভরশীল এবং বুদ্ধিজীবিরা কিভাবে তাতে মদত যুগিয়ে ছিলেন, এটি ভোলার নয়। এই গণহত্যাটি দলিতদের বিরুদ্ধে অন্যান্য নানা অত্যাচারের মতো ভারতে শ্রেণী ও জাতির মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করতে দেয়নি।

পুনশ্চ: মরিচঝাঁপির উপর প্রথম তথ্যচিত্র নির্মাতা তুষার ভট্টাচার্য্য মারা যাওয়ার পর তার বন্ধুরা তার বইটি অনুবাদ করেন ও মরিচঝাঁপির জন্য তৈরী হওয়া একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেন। অন্যান্য অনুবাদ ও গণহত্যার সঙ্গে জড়িত নানান তথ্য এই ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য, যারা এটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে (https://marichjhapi.com)। যেহেতু ইংরেজিতে এই খসড়ার কোনো প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছিলো না, এটি বাংলাতে অনুবাদ করা হবে এবং হয়তো প্রকাশ করা হবে, যা বুঝিয়ে দেয় ইংরেজি বলা বুদ্ধিজীবীদের আসল রূপ ও এই ঘটনার পিছনে তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন। সুন্দরবনের যে এলাকা গুলিতে এই গণহত্যা হয়েছিলো সেখানে এই পাণ্ডুলিপি বিলি করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে তদন্তের সম্ভাবনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হচ্ছে, এই লেখাটি একটি ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল হিসেবে থেকে যাবে যার ফলে সমস্ত ক্ষমতাশালী দলগুলি, বুদ্ধিজীবীরা ও প্রকাশনাগুলি বাধ্য হবে অত্যাচারিতদের ন্যায় বিচারের দাবি জানাতে। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে এই জাতি ও শ্রেণী দ্বন্দ্বকে সবসময় সামনে রাখবে।